# মনীষীদের কোরআন গবেষণা

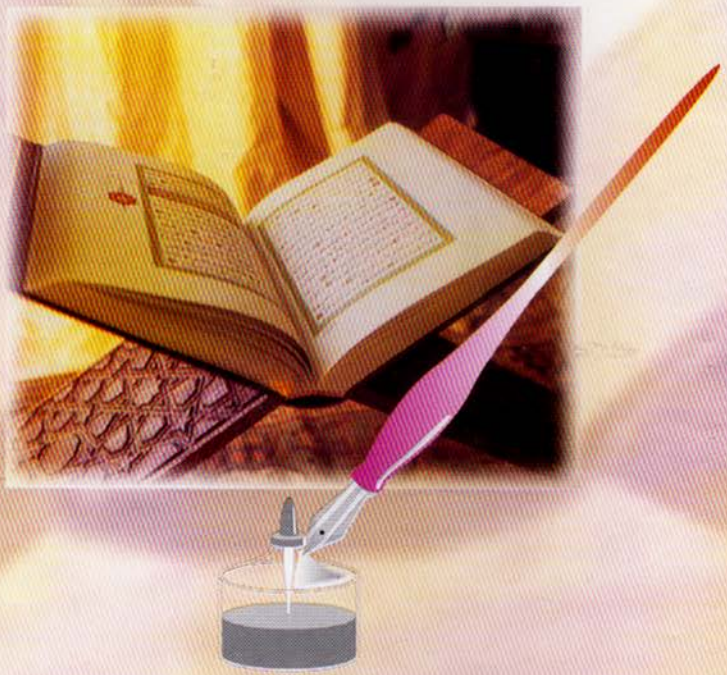

সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স

# মনীষীদের
# কোরআন গবেষণা

সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স

www.nagorikpathagar.org

# মনীষীদের কোরআন গবেষণা

সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
**প্রকাশক**
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
৬৫ হোয়াইটচ্যাপল রোড, ইউনিট ৩.২১, লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ডি ইউ, ইউকে
ফোন ঃ ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪
মোবাইলঃ ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫
**বাংলাদেশ সেন্টার**
রোড ১৬, বাড়ী ১, ব্লক জে, বারিধারা, ঢাকা, ফোন ঃ ০০৮৮০-২-৮৮১১৩৫৭
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট, বড় মগবাজার ঢাকা
**ফোন ঃ ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল ঃ ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭**
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৮৫৯-৫৫৫১৪১
**প্রথম প্রকাশ :** মার্চ ২০০৪
**চতুর্থ সংস্করণ :** যিলক্বদ ১৪৩৫, সেপ্টেম্বর ২০১৪, ভাদ্র ১৪২১
**কভার ডিজাইন ঃ** আল কোরআন একাডেমী ডিজাইন সেন্টার
**কম্পোজ ঃ** আল কোরআন কম্পিউটার
বাংলা অনুবাদের স্বত্ব ঃ প্রকাশক
**বিনিময় মূল্য :** একশত টাকা মাত্র

## Monishider Quran Gobeshona

**Editor**
Hafiz Munir Uddin Ahmed
**Published by**
Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London
65 Whitechapel Road, Unit 3.21 (3rd Floor) London E1 1DU, UK
Phone : 0044 020 7650 8770, Mob : 07539 224 925, 07956 466 955
**Bangladesh Centre**
Road 16, House 1, Block J, Baridhara, Dhaka, Phone : 00880-2-8811357
Sales Centre : 507/1 (362) Wireless Railgate, Boro Moghbazar, Dhaka
Phone : 0088-02-933 9615, Mobile : 01818 363 997
38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka
Mobile : 01859-555141
**Ist Published :** July 2007
**4th Edition :** Ju-Al-Qadah 1435, September 2014
**Price** Tk. 100. 00
E-mail: info@alquranacademypublications.co.org website: www.alquranacademypublications.co.org

www.nagorikpathagar.org

*বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম*

# যে কথাগুলো দিয়ে শুরু করতে চাই

'মনীষীদের কোরআন গবেষণা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আল্লাহ তায়ালার কেতাব হেদায়াতের এই শেষ গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ কিভাবে নিজেদের চলার পথ খুঁজে নিয়েছেন, তা জানার এক অদম্য বাসনা দুনিয়ার হাজারো কোরআন পিপাষু মানুষদের মতো আমার মনেও জাগা স্বাভাবিক।

প্রিয় নবীর সাথীরা কোরআন পড়তেন, কোরআন নিয়ে ভাবতেন, কোরআনের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতেন। সাহাবায়ে কেরামদের কোরআন গবেষণা ও পরবর্তিকালের মানুষদের কোরআন চর্চার মাঝে একটা মৌলিক তফাৎ রয়েছে। আল্লাহর নবীর সাথীরা কোরআনের কোনো আয়াতের ওপর পুরোপুরি আমল না করে পরবর্তি আয়াতের দিকে মনোনিবেশ করতেন না। তারা এ কথাটি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার এই আখেরী কেতাবটি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো কিছু নীতিবাক্যের সমষ্টি নয়। এটা হচ্ছে মানুষের জীবনের একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ। এ ব্যাবহারিক জীবনকে বাদ দিয়ে যা, তা তো হচ্ছে নিছক কিছু থিওরী। কোরআন সে দিক থেকে কোনো থিওরীর কেতাব নয়।

একটি জনগোষ্ঠীর গোটা জীবনের আদলকে বদলে দেয়ার জন্যে যে কেতাবের আগমন– তার স্বপক্ষে দু'চারটা সুন্দর বাণী ছুড়ে দিয়ে যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে চান তাদের কোরআন চর্চার সাথে— এই কেতাব যাদের জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলো সেই সাহাবায়ে কেরামদের কোরআন সাধনার সাথে এটাই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য।

যাদের চোখের সামনে এই কেতাব নাযিল হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে যাদের অনেককেই এই কেতাব সরাসরি নাম ধরে সম্বোধন করেছে, মানব জাতির সেই আলোকিত মানুষদের পদাংক অনুসরণ করে দেড় হাজার বছর ধরে দুনিয়ার আনাচে কানাচে যারা কোরআন নিয়ে ভেবেছেন, নিজেদের জীবনকে শর্তহীনভাবে সেই কেতাবের ছকে ফেলে সাজিয়েছেন– তাদের কোরআন সাধনা কোরআন গবেষণার কাহিনীগুলো তাদেরই মতো এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এর সবগুলো একত্র করা অবশ্যই একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা– যা কোনোদিনই কোনো মানবসন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। হৃদয়ে হাজার আবেগ জড়ো করেও আমরা আজ বলতে পারবো না, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে চতুর্থ শতকের শুরুতে খ্যাতনামা মোফাসসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাফসীরে তাবারী' লিখতে শুরু করেছিলেন, অষ্টম শতকে এসে আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীরের মতো মহান পন্ডিত

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি কিভাবে কোরআন গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাদের সেসব অজানা কথা আমাদের কাছে অজানাই থেকে গেলো, আমরা শুধু ততোটুকুই পেয়েছি যা কালের সুদীর্ঘ চক্র আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

'মনীষীদের কোরআন গবেষণা' পুস্তকে আমরা মাত্র কয়েকজন সেরা কোরআন গবেষকদের ছিটে ফোটা কিছু কথা একত্র করেছি। প্রয়োজনের তুলনায় এর পরিমাণ হচ্ছে গহীন সাগরের সাথে ক্ষুদ্র একটি কুয়োর তুলনা করার মতো। তবু আমাদের সান্ত্বনা যে, আমরা এ বিষয়ের ওপর বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ লেখা এক জায়গায় পরিবেশন করতে পেরেছি। এর অধিকাংশই বিভিন্ন সময়ে আমাদের গবেষণা মাসিক 'আল বাছায়ের' এ প্রকাশিত হয়েছে। এ লেখাগুলো আরবী, ইংরেজী ও উর্দু থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। যাদের অনুবাদক এখানে স্থান পেয়েছে তারা হচ্ছেন হযরত মওলানা আবদুর রহীম (র.), হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী, মওলানা এ বি এম কামাল উদ্দীন শামীম ও আমার পুত্রবধু তূল্য সাজেদা আখতার শিখা।

আরেকটি কথা না বললে মনে হয় বইটির নামের সাথে ইনসাফ করা হবে না এবং তা হচ্ছে এই বইর শেষের দিকে আমি 'কোরআন কর্মীদের দিক নির্দেশনা' শিরোনামে পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত আমার একটি লেখাও সংযোগ করেছি, আমি জানি যাদের লেখা দিয়ে এই মূল্যবান বইটি সাজানো হয়েছে তার সাথে এ লেখাটা মোটেই মানানসই নয়। এ কারণেই একই বইতে লেখাটা সংযোজনের ব্যাপারে আমার মনে প্রচুর দ্বিধা ছিলো। আসল কথা হচ্ছে, জ্ঞান তাপস এই কোরআন সাধকরা তাদের কোরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন ও সাধনার যেসব কথা তাদের প্রবন্ধে লিখেছেন এগুলোর আলোকে যদি কোনো যোগ্য কর্মীবাহিনী কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে, তাদের একটি সময়োপযোগী কর্মসূচী প্রণয়নে এ লেখাটা সামান্য কিছু হলেও পথনির্দেশনা দেবে সেই উৎসাহে উজ্জীবিত হয়েই লেখাটা বইর শেষের দিকে— তাদের জ্ঞান গরিমা নিসৃত লেখার সাথে একটু দূরত্ব বজায় রেখে আলাদাভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ লেখাটাকে কোনো অবস্থায় মূল বইর সাথে মিলিয়ে দেয়া যাবে না।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই আমাদের ভেতর বাইরের সব খবর রাখেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শ করুন।

আমীন!

**হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ**
*ডাইরেক্টর জেনারেল*
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

www.nagorikpathagar.org

# লেখা লেখক ও পৃষ্ঠা

কোরআনের পাঁচটি মূলনীতি — নয়
*শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবী*

আমার কোরআন তেলাওয়াত — পনেরো
*সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী*

কোরআন নিয়ে আমার ভাবনা — একুশ
*আল্লামা ইউসুফ আলী*

কোরআনের ছায়াতলে — একত্রিশ
*সাইয়েদ কুতুব শহীদ*

কোরআনের পরিচয় — তেতাল্লিশ
*সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী*

কোরআন এক দীর্ঘ বিপ্লবের কর্মসূচী — তেয়াত্তর
*মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী*

ইকবালের কোরআন সাধনা — সাতাত্তর
*খালেদ বযমী*

কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক — সাতাশি
*সাইয়েদ কুতুব শহীদ*

কোরআনের দাওয়াত পদ্ধতি — তিরানব্বই
*আবু সলীম মোহাম্মদ আবদুল হাই*

কোরআনের শিক্ষা গ্রহণে সমস্যা — নিরানব্বই
*নঈম সিদ্দীকী*

কোরআন আমাদের কাছে কি চায় — একশ নয়
*মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ*

কোরআনের পটভূমি — একশ উনিশ
*সৈয়দ মারুফ শাহ সিরাজী*

কোরআনে শিক্ষার প্রসার — একশ সাতাশ
*হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ*

কোরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য — একশ তেত্রিশ
*আল্লামা শামসুল হক আফগানী*

কোরআনের চরিত্র গঠন পদ্ধতি — একশ তেতাল্লিশ
*মাওলানা সামিউল হক*

কোরআন ও আধুনিক যুগের দাবী — একশ পঞ্চান্ন
*মোহাম্মদ আইয়ুব খান চুগতাই*

কোরআন কর্মীদের দিক নির্দেশনা — একশ পঁয়ষট্টি
*হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ*


www.nagorikpathagar.org

## কোরআনের জিজ্ঞাসা

আপনার ঘরে কি রীতিমতো কোরআন পড়া হয়?
আপনার ঘরে কয়জন লোক কোরআন পড়তে জানে?
আপনার ঘরে কি কখনো ছেলে-মেয়েদের কোরআনের গল্প ও ঘটনা পড়ে শোনানো হয়?
আপনার ঘরে কি কোরআনের আয়াত এবং এর বিধিনিষেধ সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা হয়?
আপনার ঘরের কারো কি কোরআনের কোনো অংশ মুখস্থ আছে?
আপনার ঘরের বয়স্ক ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেউ কি কোরআনের অর্থ বুঝে?
আপনার ঘরে কি কোরআন অধ্যয়নের কোনো বই পুস্তক আছে?
আপনার ঘরের কোথায়ও কোরআনের আয়াত ও অর্থ সম্বলিত কোনো পোষ্টার কিংবা স্টিকার লাগানো আছে?
আপনার ঘরের কেউ কি দরসে কোরআনের মাহফিলে কখনো শরীক হয়?

*প্রশ্নগুলো একান্ত আপনার জন্যে —*

www.nagorikpathagar.org

১

# কোরআনের পাঁচটি মূলনীতি

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবী

www.nagorikpathagar.org

কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে কোরআনের আয়াত এবং বিষয়বস্তুর সাথে কোনো সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণে প্রাথমিকভাবে কোরআনের পাঠককে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। 'আল-ফাওযুল কবীর' গ্রন্থে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ এ সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান করে দিয়েছেন। তিনি কোরআনের সকল বিষয়বস্তুকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। কোরআনে বর্ণিত বিষয়াবলী এ পাঁচটি শ্রেণীর যে কোনো একটির মধ্যে পড়বে।

www.nagorikpathagar.org

কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে কোরআনের আয়াত এবং বিষয়বস্তুর সাথে কোনো সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণে প্রাথমিকভাবে কোরআনের পাঠককে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। 'আল-ফাওযুল কবীর' গ্রন্থে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ এ সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান করে দিয়েছেন। তিনি কোরআনের সকল বিষয়বস্তুকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। কোরআনে বর্ণিত বিষয়াবলী এ পাঁচটি শ্রেণীর যে কোনো একটির মধ্যে অবশ্যই পড়বে। 'আল-ফাওযুল কবীর' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, আশা করা যায় এ সব মূলনীতির মাধ্যমে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে কোরআন অনুধাবনের এক নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এখানে আল ফাওযুল কবীরের প্রথম পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ পেশ করা যাচ্ছে।

**এক.**

**এলমে আহকাম**

ওয়াজেব, মোস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ, মোবাহ। কোরআনের সকল আহকাম বা বিধি-বিধান এই এলম বা মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত থাকবেই। এসব আহকাম ধারাবাহিকভাবে নয়, বরং বান্দার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে প্রয়োজন মনে করেছেন সেভাবে বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো আহকাম আগে বা কোনো কোনোটি পরে বর্ণিত হয়েছে। এলমে আহকামের বুনিয়াদী নীতি হচ্ছে, যেহেতু নবী করীম (স.) মিল্লাতে ইবরাহীমের ওপর আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তার মিল্লাতের পদ্ধতি অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজন ছিলো। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু আরবকে নবী করীম (স.)-এর হাত দিয়ে এবং অবশিষ্ট বিশ্বকে আরবদের হাত দিয়ে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করার ইচ্ছা করেছেন, তাই তিনি মোহাম্মদী শরীয়তের উপকরণ আরবদের রসম-রেওয়ায থেকে গ্রহণ করেছেন।

কালের পরিক্রমায় মিল্লাতে ইবরাহীমের বিধি বিধান ও আকীদা বিশ্বাসে যে সব বিকৃতি দেখা দিয়েছিলো, পবিত্র কোরআন সেসব বিকৃতি দূর করে তার সংস্কার সাধন করেছে। ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও এ বিকৃতির চরম রূপ প্রকটিত হয়ে উঠেছিলো। কোরআন সেসব বিকৃতি দূর করে পুনরায় আল্লাহর দেয়া রীতিনীতি সুবিন্যস্ত করেছিলো।

**দুই.**

**ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক ও মোনাফেকদের সম্পর্কে আলোচনা**

পবিত্র কোরআনে চারটি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় যথা ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক ও মোনাফেকদের সম্পর্কে বার বার আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনা দু'ভাবে করা হয়েছে। প্রথমত বাতিল আকীদা-বিশ্বাসসমূহ বর্ণনা করে তার অসারতা তুলে ধরা হয়েছে এবং এভাবে সেসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতি কোরআনের পাঠকের ঘৃণার উদ্রেক করানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত পথভ্রষ্টদের সন্দেহ উল্লেখ করে সেসব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

**ক. পৌত্তলিকদের সম্পর্কে আলোচনা**

মক্কার মোশরেক বা পৌত্তলিকেরা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসারী বলে দাবী করতো, কিন্তু তারা মিল্লাতে ইবরাহীমের আকীদা বিশ্বাস আমল আখলাক একেবারেই পরিত্যাগ করেছিলো। তবে তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো, আল্লাহ তায়ালা যে বিশ্বজগতের স্রষ্টা তাও তারা বিশ্বাস করতো। আল্লাহ তায়ালা যে নবী-রসূল প্রেরণে সক্ষম এটাও তারা বিশ্বাস করতো।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তারা শেরেক করতো। পরকালে বিশ্বাসী ছিলো না। নবী করীম (স.)-এর রেসালাতকে তারা বিশ্বাস করতো না; বরং একে তারা অসম্ভব বলে মনে করতো। তারা প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করতো। তারা নতুন নতুন রসম-রেওয়ায ও এবাদাত আবিষ্কার করতো। এ সময় পবিত্র কোরআন এসে তাদের সকল সন্দেহের ও পথভ্রষ্টতার জবাব দিয়েছে।

শেরেকের বা অংশীদারীত্বের বৈধতার পক্ষে পৌত্তলিক বা মোশরেকদের কাছে যুক্তি চাওয়া হয়েছিলো। তারা কোনো যৌক্তিকতা দেখাতে পারেনি। তবুও তারা অন্ধভাবে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করতো। তাদের বার বার বলা হয়েছে যে, তারা যাদের আল্লাহর অংশীদার মনে করে তারা তো দুরের কথা কোনো কিছুই কখনো তার অংশীদার হতে পারে না। তাই সকল নবীই এই শেরেকের বিরোধিতা করেছেন।

আল্লাহর সন্তান আছে বলে পৌত্তলিকরা যে দাবী করতো সে প্রসংগে বলা হয়েছে যে, একই প্রজাতির হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সন্তানদের পিতার সমান হওয়া প্রয়োজন, অথচ কেউই আল্লাহর সমান হতে পারে না। কাজেই কোনো সৃষ্টিই আল্লাহর সন্তান হতে পারে না।

পরকালের অস্বীকৃতি বা অবিশ্বাসের জবাবে বলা হয়েছে যে, চলমান জীবনধারার প্রতি লক্ষ্য করলেই তারা পরকালের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো।

**খ. ইহুদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের জবাব**

ইহুদীদের পথভ্রষ্টতা ছিলো ঐশী গ্রন্থ নিয়ে, তারা তাওরাতে বিভিন্নভাবে বিকৃতি সাধন করতো। তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে কোনো কোনো আয়াত গোপন করতো, আবার দরকার হলে মনগড়া কিছু কিছু বিধান তাওরাতে লিখে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিতো। আল্লাহর হুকুম মানতে চরম শৈথিল্য করতো। তারা নবী করীম (স.)-এর রেসালাতের বিরোধিতা করতো, মুসলমানদের প্রতি ঘৃণ্য অপবাদ দিতো, কৃপণতা ও লোভ-লালসা ছিলো তাদের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য বিষয়, কিন্তু তারা কোনোভাবেই তাদের পাপাচার শেষ পর্যন্ত লুকাতে পারতো না, কেননা পবিত্র কোরআন হলো পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের সত্যায়নকারী। তাই কোরআনে নবী করীম (স.)-এর রেসালাতের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কারণসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে।

**গ. নাসারাদের পথভ্রষ্টতার জবাব**

নাসারা অর্থাৎ খৃস্টানরা আল্লাহকে তিনটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত করে দিয়েছিলো। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে একই সাথে আল্লাহ, আল্লাহর পুত্র এবং মানুষ মনে করতো।

এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের জবাবে কোরআনে বলা হয়েছে যে, প্রাচীনকালে 'ইবন' শব্দ নিকটবর্তী এবং প্রিয়-এর সমার্থক ছিলো। হযরত ঈসা (আ.) অনেক সময়, আল্লাহ তায়ালার কার্যকলাপকে নিজের ওপর আরোপ করতেন। আসলে এটা ছিলো অন্যের কথা উদ্ধৃত করা বা কোনো ঘটনা বর্ণনা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি। যেমন কোনো বাদশাহর দূত বলে যে, আমরা অমুক দেশ জয় করে নিয়েছি। এর দ্বারা মূলত বাদশাহর বিজয়কেই সে বুঝায়। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর বান্দা।



www.nagorikpathagar.org

এছাড়া নাসারারা মনে করতো যে হযরত ঈসা (আ.) নিহত হয়েছেন। তাদের এ ভ্রষ্টতার জবাবও কোরআনে দেয়া হয়েছে।

**ঘ. মোনাফেকদের সম্পর্কে কোরআন**

মোনাফেকরা ছিলো দু' প্রকারের। এক শ্রেণীর মোনাফেক মুখে ঈমানের কালেমা উচ্চারণ করতো, কিন্তু কুফরীর প্রতি তাদের মনের বিশ্বাস ছিলো অত্যন্ত গভীর। তাদের সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে যে, তারা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মোনাফেকরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো কিন্তু তাদের ঈমান ছিলো খুবই দুর্বল। তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দিতো। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের প্রতি তাদের ঈমান ধরে রাখতে পারেনি। তারা অর্থ-সম্পদের প্রতি ছিলো প্রচন্ড লোভী। হিংসা, ঘৃণা ও শত্রুতায় তাদের মন ছিলো পরিপূর্ণ। তারা সারাক্ষণ তাদের বৈষয়িক উন্নতি ও লাভক্ষতির হিসেব নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। ফলে আখেরাত বা পরকাল সম্পর্কে তাদের মনে কোনো চিন্তা ছিলো না। তারা নবী করীম (স.)-এর রেসালাত সম্পর্কে নিরর্থক সন্দেহ পোষণ করতো, কিন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম থাকার কারণে প্রকাশ্যে ইসলামের সীমারেখা লংঘন করার মতো সাহস তাদের ছিলো না।

পবিত্র কোরআনে এ দুই শ্রেণীর মোনাফেকদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এদের পরিচয় স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে করে উম্মতে মোহাম্মদী তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে পারে।

পবিত্র কোরআনে এ সকল সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা দেখে এমন ধারণা করা মোটেই ঠিক নয় যে, এ ধরনের মানুষ শুধু তৎকালীন সমাজে ছিলো। এটি একটি চরম ভুল ধারণা যে এটি বিশেষ সময়ের কিছু মানুষ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে, বর্তমান সমাজে আর এ ধরনের মানুষ নেই বরং তাদের মতো জঘন্য চরিত্রের মানুষ বর্তমান সমাজেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

**তিন.**

**আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা**

পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় সম্পর্কে ঠিক ততোটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে যতোটুকু এই মানবজাতির সীমাবদ্ধ বোধশক্তিতে উপলব্ধি করা সম্ভব। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাতও করা হয়নি। তবে যতোটুকু বর্ণনা করা হয়েছে ততোটুকু অত্যন্ত সহজ সাবলীলভাবে বোধগম্য করে বর্ণিত হয়েছে। ইলমে কালাম সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান যাদের নেই অথবা বিশেষ বিদ্যার যারা অধিকারী নয়, এই বর্ণনা থেকে তাদেরও আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জানতে অসুবিধা হয় না। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে উপলব্ধি করার জন্যে বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে বুঝানো হয়েছে। আমরা যা জানি এবং আমাদের কাছে যা উপলব্ধি করা সম্ভব সেভাবেই বুঝানো হয়েছে। যেসব নেয়ামতের আলোচনা সমীচীন মনে করেছেন, সেসব নেয়ামতের উপস্থাপন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন আসমান-যমীনের সৃষ্টি, মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, মাটি



www.nagorikpathagar.org

থেকে পানির ধারা প্রবাহিতকরণ, মাটি থেকে গাছপালা উৎপন্ন এবং সেসব গাছপালা থেকে রকমারি ফুল-ফসল ফল-ফলাদি উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে।

**চার.**

**হেদায়াত ও গোমরাহী সম্পর্কে আলোচনা**

হেদায়াত ও গোমরাহী হক ও বাতিল সম্পর্কে কোরআনে নানাভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আদ, সামুদ-এর জাতির পাপাচার ও ধ্বংসপ্রাপ্তির কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং বনি ইসরাঈলের নবীদের কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। অবাস্তব বা বানোয়াট কোনো কাহিনী বর্ণিত হয়নি।

বিখ্যাত কাহিনীসমূহের মধ্যে শুধু ততোটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যতোটুকু শিক্ষামূলক। তবে কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পেশ করা হয়নি। কারণ ওভাবে বর্ণনা করলে সাধারণ মানুষ বর্ণনার মূল উদ্দেশ্যই বুঝতে ব্যর্থ হতো। অতীতের আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী শুনিয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়া বা শিহরিত করার উদ্দেশ্যে এসব কাহিনী বর্ণনা করা হয়নি বরং শ্রোতারা যেন সেসব কাহিনী শুনে শেরেকের ক্ষতি ও অপকারিতার প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করে সে উদ্দেশ্যেই এসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উপরন্তু তারা এর মাধ্যমে যেন পুণ্যবানদের পুরস্কার ও পাপীদের শাস্তি সম্পর্কেও অবহিত হতে পারে।

**পাঁচ.**

**মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা**

মানুষের মৃত্যুর ধরণ-প্রকৃতি, অসহায়তা, মৃত্যুর পর দোযখ ও বেহেশতের সামনে উপনীত হওয়া, আযাবের ফেরেশতাদের সামনে আনা সম্পর্কেও নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, দজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, শিঙ্গা ফোঁকানো, হাশরের ময়দান, প্রশ্ন ও উত্তর, মীযান, আমলনামা, ঈমানদারদের দীদারে এলাহী। আযাবের প্রকৃতি, জান্নাতের নেয়ামতসমূহের আলোচনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেসব প্রসঙ্গ আলোচনার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়গুলোকে কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।❑



www.nagorikpathagar.org

২

# আমার কোরআন তেলাওয়াত

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

www.nagorikpathagar.org

কারো মাধ্যমে নয় কোরআন তেলাওয়াতকারীকে সরাসরি কোরআনের সংস্পর্শে আসতে হবে। তাহলে এমনিতেই দেহ-মনের শিরা-উপশিরায় কোরআনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। আল্লামা ইকবাল যথার্থই লিখেছেন, 'তোমার বিবেকের ওপর যতোক্ষণ পর্যন্ত কোরআন নাযিল হবে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত ইমাম রাযী বা কাশশাফ প্রণেতা যামাখশারীও মনের কোনো গিঁঠ খুলতে সক্ষম হবেন না।'

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম পরিবারসমূহে যেভাবে কোরআন তেলাওয়াত শেখানোর নিয়ম রয়েছে, সেই নিয়মেই শৈশবে আমি কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেছি। কিন্তু গুরুজনদের তাকিদ সত্ত্বেও ছোট বেলায় নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করতে পারিনি। আরবী ভাষা শিক্ষার সময়ে ধীরে ধীরে কোরআন বুঝতে শিখেছি। আমার শিক্ষক শেখ খলীল ইবনে মোহাম্মদ-এর পবিত্র কোরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিলো। সেসময় তিনি প্রায়ই আমাদের মাসজিদে ফজরের নামাযে ইমামতি করতেন। কোরআন পাঠের সময় তিনি আবেগে অধীর হয়ে পড়তেন। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসতো, দুচোখ হতো অশ্রুসজল। ফজরের নামাযের ফরযের দু'রাকাতে তিনি কোরআনের ত্রিশতম পারার বড় একটি সূরা শুরু করতেন; কিন্তু তিনি এতোই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন যে সূরাটি শেষ করতে পারতেন না। মোকতাদী শ্রোতাদের মনে আফসোস জেগে থাকতো যে, তাঁর সুললিত কণ্ঠে আরো বেশী বেশী কোরআন পাঠ শোনা সম্ভব হলো না।

যথার্থ অর্থে কোরআন শিক্ষা আমি তার কাছেই শুরু করেছিলাম। শেখ খলীলের দ্বীনী আকীদা ছিলো অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং জোরালো। নিজের ছাত্রদেরও তিনি অনুরূপ আকীদার অধিকারী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তার কাছে কোরআন শেখার সুযোগ পাওয়ায় আমি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। সূরা ঝুমার ছিলো খলীল সাহেবের প্রিয় সূরা। এছাড়া সূরা মোমেন এবং সূরা শূরাও তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। কয়েকটি সূরার বিশেষ কয়েকটি রুকু তার বিশেষ পছন্দ ছিলো। যেমন সূরা আলে এমরানের শেষ রুকু। এ রুকু সম্পর্কে হাদীসে রয়েছে যে, নবী করীম (স.) শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্যে জাগ্রত হওয়ার পর নামাযের আগে এই রুকুর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন। সূরা ফোরকানের শেষ রুকুও খলীল সাহেব অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করতেন। তার কণ্ঠ নিঃসৃত কোরআনের আয়াত এখনো যেন আমার কানে ভেসে আসছে। কোরআনের প্রতি খলীল সাহেবের গভীর অনুরাগ দেখেই আমি কোরআনকে গভীরভাবে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম।

আমাদের পরিবারে সে সময় কোরআনের অনেক আয়াতের তাফসীর হতো। কোরআন তেলাওয়াতের প্রাক্কালেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটি একটি জীবন্ত গ্রন্থ এবং এতে জীবন্ত মানুষদের কাহিনীই লিখিত রয়েছে। এ পবিত্র গ্রন্থের দর্পণে সব মানুষ আপন প্রতিবিম্ব দেখতে পায় এবং নিজেকে খুঁজে দেখতে পারে। সেই কৈশোরেই আমি স্পষ্ট বুঝতে শুরু করেছিলাম যে, এ বিস্ময়কর গ্রন্থে জাতি, বংশ ও ব্যক্তির যে পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার মধ্যেই তাদের উত্থান-পতনের উপকরণও বিদ্যমান রয়েছে। এ উপলব্ধির পর কোরআনের প্রতি আমার আগ্রহ ও আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। স্পষ্ট মনে পড়ে, সে সময় আমি সূরা মায়েদা, সূরা আনয়াম, সূরা আ'রাফ বিশেষ মনোযোগের সাথে পাঠ করতাম।

লেখাপড়া শেখার সময়ে সৌভাগ্যক্রমে এর প্রতিটি বিষয়ে আলাদাভাবে শিক্ষা লাভ করেছি।

সম্মিলিত পাঠক্রমের মাধ্যমে পাঠাভ্যাসের সুযোগ আমার হয়নি। এটা শুধু কাকতালীয় ব্যাপারই নয় বরং এটা ছিলো আমার প্রতি আল্লাহর গায়েবী সাহায্য।



www.nagorikpathagar.org

তিন বছর যাবত আমি আরবী সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছি। এসময়ে আল বালাগাত, হামাসাহ সহ বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করেছি। এতে করে বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ ও কোরআন অনুধাবনে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। আমি যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করছিলাম যে, আল্লাহর কালাম এতো মহান, এতো অর্থপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময় যে, সমগ্র বিশ্ব একযোগে অস্বীকার করলেও এ বাণীর কোনো ক্ষতি হবে না বা এর প্রভাব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না।

আমার মনে হয়, আমাদের আরবী মাদ্রাসাসমূহে আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্য যেভাবে শিক্ষা দেয়া হয় এর দ্বারা ঈপ্সিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় না। আরবী ভাষার প্রতি দক্ষতা ও মমত্ববোধ সৃষ্টির জন্যে বহুদিন আগে লিখিত এ সকল গ্রন্থ কিছুতেই যথেষ্ট নয়।

শেখ খলীলের কাছে মযবুত ভিত্তির শিক্ষা লাভের পর সৌভাগ্যক্রমে আমি আল্লামা তকিউদ্দীন হেলালী মারাকেশীর কাছে শিক্ষা লাভ করি। আরবী সাহিত্য, ফেকাহ শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভের পর দু'বছর দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামায় হাদীস শিক্ষা করি। এ সময়ে আমার প্রিয় শিক্ষক ছিলেন মাওলানা হায়দার হাসান খান। সে সময় তাফসীরে বায়যাবীর কিছু অংশও তার কাছে পড়েছি। তারপর লাহোরে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর পদ্ধতি অনুযায়ী তার স্নেহভাজন ছাত্র মাওলানা আহমদ আলীর কাছে তাফসীর শাস্ত্রে বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করি। এসময়ে কোরআন সম্পর্কে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম। মাওলানা আহমদ আলীর তাকওয়া ও তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাকে সেসময় অভিভূত করে রেখেছিলো।

লাহোর থেকে কোলকাতায় গিয়ে আমি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার তাফসীর এবং মাওলানা হামিদ উদ্দীন ফারাহীর গ্রন্থাবলী এবং প্রাচীনকালের বিভিন্ন তাফসীর অধ্যয়ন করি। এ সময় তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বাগাবী, আল্লামা যামাখশারীর 'তাফসীরে কাশ্‌শাফ', 'মাদারেক' প্রভৃতি ছত্রে ছত্রে পাঠ করেছি। তাফসীর সম্পর্কে পাঠ করার সময় আমি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, একটি বিষয়ে একটি মাত্র গ্রন্থ কারো জানার আগ্রহ তথা জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারে না।

আল্লামা আলুসির 'তাফসীরে রুহুল মায়ানি' পাঠ করে অনেক নতুন কথা জানার সুযোগ হয়েছে। 'তাফসীরে কবির' সম্পর্কে একটা দুর্নাম রয়েছে যে, 'ফীহে কুল্লু শাইইন ইল্লাত তাফসীর' অর্থাৎ এতে তাফসীর ব্যতীত সকল কিছুই রয়েছে। কিন্তু এ তাফসীর পড়ে বাড়তি অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাবলীতে সেসব তথ্য পাওয়া যায় না। এছাড়া আবু হাব্বানের 'তাফসীরে বাহরুল মুহিত' আল্লামা রশীদ রেজার আল 'আল মানার', 'এরাবুল কোরআন' আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর 'তাফসীরে মাজেদী' পাঠ করে জ্ঞানের নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছি। তাফসীরে মাজেদীর টীকা ভাষ্য টিপ্পনি ইংরেজী ভাষায় লেখা। শিক্ষার্থী ছাত্রদের জন্যে এ গ্রন্থ বিশেষ উপাদেয়। 'তাফসীরে তিবির' স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। ইতিহাস, সাহিত্য, ইসলাম পূর্ব আরবের আকিদা-বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থা কোরআনের বিধি-বিধানের পটভূমি জানার জন্যে এ তাফসীর আরবী সাহিত্যে এক অনবদ্য সংযোজন বলে মনে হয়েছে।

প্রসঙ্গত হযরত শাহ্ আবদুল কাদের দেহলবী (র.)-এর 'তাফসীরে কাদেরী'র কথা না বললেই নয়। বহু সংখ্যক তাফসীর পাঠ করে যারা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন



www.nagorikpathagar.org

তারাই 'তাফসীরে কাদেরী'র সত্যিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। উর্দু ভাষায় রচিত এই তাফসীরে সুপ্রযোজ্য শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। শাহ আবদুল কাদেরের অনুবাদে শব্দের যথার্থ স্পিরিট ফুটে উটেছে। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সূরা শোয়ারার একটি আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, 'কালু বেইযযাতে ফেরআওনা ইন্না লানাহনুল গালেবুন'। আরবী ভাষায় 'ইযযত' শব্দ শুধু 'গালবা' এবং 'শরফ' শব্দের সমার্থকই নয় বরং 'গালবা' এবং 'শরফ' উভয় শব্দ মিলেও ইযযত শব্দের সত্যিকার অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। আল্লামা যামাখশারীর মতো গবেষক তাফসীরকারও এ শব্দের সঠিক অর্থ চয়নে সক্ষম হননি। কিন্তু শাহ আবদুল কাদেরের অনুবাদে কোরআনের আয়াতের সত্যিকার স্পিরিট প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'আওর বোলে ক্যহ ফেরাউন কে ইকবাল ছে হামহি গালেব রাহে।' অর্থাৎ তারা বললো যে, ফেরাউনের সৌভাগ্যের কারণেই আমরা বিজয়ী হবো। প্রকৃতপক্ষে এটাই আয়াতের আসল অর্থ। শাহ আবদুল কাদেরের পরবর্তী কালের তাফসীরকারকদের অনেকেই তাকে অনুসরণ করেছেন। তার তরজমা ও তাফসীরে এ ধরনের সুপ্রযোজ্য দুর্লভ শব্দাবলীর ব্যবহার নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের শিক্ষক মাওলানা হায়দার হাসান খান বলতেন সাহারানপুরের মাযাহেরুল উলুম নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদ মাযহার নানুতুঈ (র.) ছাত্রদেরকে সকল তাফসীর পড়ানোর পর শাহ আবদুল কাদের (র.)-এর তরজমা পড়াতেন।

জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আমি এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, কোরআন অনুধাবনের সত্যিকার দরজা খুলে যাওয়ার পর অধ্যায়নকারীর মনে হবে যে তিনি স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথা বলছেন। কোরআন অধিক পরিমাণ তেলাওয়াত করেই সেই ইপ্সিত স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব হতে পারে। এছাড়া বেশী বেশী নফল নামায পড়তে হবে এবং কোরআনের স্বাদ যারা পেয়েছেন তাদের সান্নিধ্যে অধিক সময় অতিবাহিত করতে হবে।

কারো মাধ্যমে নয় কোরআন তেলাওয়াতকারীকে সরাসরি কোরআনের সংস্পর্শে আসতে হবে এবং আল্লাহর কাশফের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। তাহলে দেহ-মনের শিরা-উপশিরায় কোরআনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। আল্লামা ইকবাল যথার্থই লিখেছেন,

তেরে যমির পে জব তক
না হো নুযুলে কেতাব
গেরাহ্ কেশা হায় না রাযী
না ছাহেবে কাশশাফ।
অর্থাৎ তোমার বিবেকের ওপর যতোক্ষণ
পর্যন্ত কোরআন নাযিল হবে না
ততোক্ষণ পর্যন্ত ইমাম রাযী বা
কাশশাফ প্রণেতা যামাখশারীও
মনের কোনো গিঁঠ খুলতে সক্ষম হবেন না।❑



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

৩

# কোরআন নিয়ে আমার ভাবনা

আল্লামা ইউসুফ আলী

www.nagorikpathagar.org

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমাকে আরবী শিক্ষা দেন, কিন্তু আমার হৃদয়ের গভীরে তার কাছ থেকে আরও বেশী কিছু গ্রহণ করার তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিলো। হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত এই অনুভূতিই আমাকে বলে দিয়েছিলো যে, কোরআন পাঠের মোহাচ্ছন্ন দুর্লভ মুহূর্তগুলোতে হৃদয়ে প্রতিফলিত অনবদ্য বাণীর তুলনায় পৃথিবীর সকল বিশ্বাস, সবচেয়ে সুন্দর ভাষা ও সাহিত্যগুলো নিতান্তই তুচ্ছ।

www.nagorikpathagar.org

আমি এখানে কোনো দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করতে চাই না। আমি কেবলমাত্র সংক্ষেপে আমার পরিকল্পনা ও তার ইতিহাস, এ কাজের ক্ষেত্র ও নকশা এবং এ কাজের জন্যে আমি যেসব বিষয়াবলী অবলম্বন করেছি তার ব্যাখ্যাটুকু পেশ করতে চাই। বইগুলো হলো, 'Commentaries on the Quran' 'Translations of the Quran' এবং 'Useful works of Reference' সেখানে একইভাবে আমি আরবী শব্দ ও নামের অনুবাদে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছি, শব্দ-সংক্ষেপে ব্যবহারে এবং কোরআনের প্রধান ভাগসমূহে যে ধারা অনুসরণ করেছি তারও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, এতোগুলো ইংরেজী অনুবাদ বাজারে থাকতে নতুন করে আবার কোরআনের ইংরেজী অনুবাদের কী প্রয়োজন? যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন তাদের আমি বলবো, তারা যেন আমার অনুবাদের টীকায় আমি যে সব বিষয় লিপিবদ্ধ করেছি সেগুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করেন। বিশেষ করে আমি তাদের প্রথম খন্ডের একটি নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ নির্বাচনের অনুরোধ করবো; যেমন, ২য় খন্ডের ২য় পারার ৭৪, ১০২ ও ১৬৪নং আয়াতটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এবার তাদের পছন্দ অনুযায়ী পূর্বের যে কোনো অনুবাদের সাথে এটিকে তুলনা করতে বলবো। তাদের বিচারে কোরআনের অর্থ বুঝতে, এর সৌন্দর্য বর্ণনায় এবং এর প্রকৃত মহত্ত্ব অনুধাবনে আমি যদি তাদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করে থাকি তাহলে আমি আমার এ সামান্য প্রচেষ্টা সফল বলে মনে করবো।

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী ও শিশুর পবিত্র ও অবশ্য কর্তব্য হলো তাদের সাধ্যানুযায়ী কোরআন পাঠ করা ও তার অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা। আমাদের মধ্যে কেউ যদি কোরআন পাঠ করে, কোরআনের ওপর সামান্য জ্ঞান অর্জন করেন বা তা বুঝতে সক্ষম হন, সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং ভেতর বাহির উভয় জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে থাকেন তবে তাদের দায়িত্ব হবে তাদের সাধ্যানুযায়ী অপরকেও তা শিক্ষা দেয়া। তাদের আরও কর্তব্য হবে আধ্যাত্মিক জগতের সাথে যোগাযোগের ফলে তারা যে অব্যক্ত আনন্দ ও নির্মল প্রশান্তি লাভ করেন তাতে অন্যদেরও শামিল করা। কোরআন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ সুতরাং শুধু জিহ্বা, কণ্ঠ ও চোখ দিয়েই নয় বরং আমাদের বুদ্ধিমত্তা থেকে উৎসারিত অর্থাৎ হৃদয় ও বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ সর্বাধিক সত্য ও বিশুদ্ধ উজ্জ্বল আলোয় তা অধ্যয়ন করতে হবে। এটা সেই লুকায়িত শক্তি যার মাধ্যমে আমি কোরআনকে আমার পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছি।

চার কি পাঁচ বছর বয়সে আমি প্রথম কোরআনের আরবী শব্দগুলো পড়তে শিখেছিলাম এবং এর ছন্দ, সুর ও অর্থের মহিমায় অভিভূত হয়েছিলাম। সেই সময়ে কোরআন 'খতম' অনুষ্ঠানের এক ম্লান স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে। একে বলা হলো 'খতম'। এটা আমার মধ্যে সত্যিকারের এক আধ্যাত্মিক চেতনার সৃষ্টি করেছিলো, যা আজীবন চলতে থাকবে। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমাকে আরবী শিক্ষা দেন, কিন্তু আমার হৃদয়ের গভীরে তার কাছ থেকে আরও বেশী কিছু গ্রহণ করার তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিলো, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত এই অনুভূতিই আমাকে বলে দিয়েছিলো যে, কোরআন পাঠের



www.nagorikpathagar.org

মোহাচ্ছন্ন দুর্লভ মুহূর্তগুলোতে হৃদয়ে প্রতিফলিত অনবদ্য বাণীর তুলনায় পৃথিবীর সকল বিশ্বাস, সবচেয়ে সুন্দর ভাষা ও সাহিত্যগুলো নিতান্তই তুচ্ছ। কোরআনে যেমন রয়েছে সাদামাটা মানুষের জন্যে সাধারণ দিক নির্দেশনা, এই ব্যস্ততম পৃথিবীতে তাদের জন্যে এটাই যথেষ্ট। যে বয়সে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক শান্তি বা মানসিক শান্তি নিয়ে কথা বলা চরমমাত্রায় রীতি বিরুদ্ধ; যে বয়সে এ ধরনের গভীর ও উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা মানুষকে উপহাস, করুণা ও অবজ্ঞার পাত্র করে তোলে সে বয়সে স্রষ্টার কাছে নিজের দোষত্রুটির জন্যে ক্ষমা কবুল করা খুবই উত্তম।

আমি পশ্চিমা দেশসমূহ ভ্রমণ করেছি এবং এই পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রাচ্যের ওপর কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেছি, কিন্তু আমি কখনোই আমার প্রাচ্যের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িনি। আমার সকল সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সারাজীবন আমি একটি সত্যের ওপর খুব বেশী নির্ভর করতে শিখেছি, তা হলো কোরআনের সেই বাণী যা জিহ্বার মাধ্যমে মরণশীল মানুষের ওপর নাযিল হয়েছিলো। আমার মতে কোরআনের চমৎকার আরবী শব্দাবলীর মাঝেই লুকায়িত আছে এই বাণীর প্রতিরূপ, যা আমি নিজের প্রয়োজনেই অনুবাদের চেষ্টা করেছি এবং আমার অভিজ্ঞতার আলোকে তা বার বার প্রয়োগ করেছি। বহু মুসলমানের কাছে কোরআনের অবদান গর্ব ও অধিকারের বিষয়। আমি অনুভব করলাম আমার এ ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্থাৎ কোরআনের প্রতি আমার আনুগত্য কোরআনকে ইংরেজীতে সঠিকরূপে উপস্থাপিত করতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ। চল্লিশ বছরের অধিক সময় ধরে আমি আমার মনের মধ্যে এই স্বপ্নকে লালন করে আসছি। এ জন্যে আমি বিভিন্ন বই ও অন্যান্য সামগ্রী জোগাড় করেছি। আমি এ কাজের জন্যে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি; ঘুরে বেরিয়েছি, টীকা সংগ্রহ করেছি। মানব সমাজ ও তাদের চিন্তা-চেতনাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি।

মাঝে মাঝে আমার কাছে মূল কোরআনকে বুঝা, এর মহত্ত্ব, সৌন্দর্য, কাব্যিকরূপ ও জাঁকজমক পূর্ণ রচনা এবং প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় এর মধুর ও যুক্তিসংগত ব্যবহারিক প্রয়োগ- এই দুইটি কাজ এক সাথে করা নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়েছে। তখন আমি নিজেকে সাহসের অভাবের জন্যে দোষারোপ করেছি, সেই আধ্যাত্মিক সাহস যার বলে মানুষ তার প্রিয় বস্তুর জন্যে সব কিছু করতে পারে। অবশেষে আকস্মিক ঘটে যাওয়া আমার দেখা দু'টো ঘটনা আমাকে সুস্থির করলো। একজন মানুষের জীবন হলো তার ভেতরে ঘটে যাওয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল, যা তার চারপাশের দেহ জগতের চেয়েও অনেক বেশী ধ্বংসাত্মক। এমনি অন্তর্দ্বন্দ্বে, এক ব্যক্তিগত দুঃখের তিক্ততা প্রায়ই আমার যুক্তিকে নড়বড়ে করে দিতো, আর তখন গোটা জীবনটাকেই অর্থহীন মনে হতো। কিন্তু আমার বহু কাঙ্খিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণের ফলে এতে নতুন এক আশার সঞ্চার হলো। আয়তনে বড় না হলেও কান্নাকাটি করে দোয়া করার ফলে আমার পাণ্ডুলিপিও গভীরতা ও আন্তরিকতার সাথে এগুতে লাগলো। আমি একে গুপ্তধনের ন্যায় পাহারা দিতাম। বিস্ময়ের ব্যাপার, আমি হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দেশে ঘুরে ঘুরে আমার এই লেখার



www.nagorikpathagar.org

কথা মানুষদের জানালাম। লাহোর শহরের কিছু তরুণ-তরুণী আমাকে খুবই শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলো। তাদের কাছে আমি বিষয়টি উল্লেখ করলাম। বিষয়টির প্রতি তাদের প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাকে অবিভূত করে দিলো। তারা বিষয়টির দায়িত্ব আমার কাছ থেকে নিয়ে নিজেদের কাঁধে তুলে নিলো এবং অতিসত্বর তা প্রকাশ করতে চাইলো। আমি সব দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলাম; কিন্তু কোনো একটি 'পারা'ও তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ শেষ করিনি। কি এক যাদু বলে একজন প্রকাশক, একজন কাতেব (আরবী পাঠ্য লেখক। ক্যালিগ্রাফার), এ ধরনের পাঠ্য লেখার জন্যে একজন ব্লক খোদাই শিল্পী ও একজন মুদ্রকের খোঁজ পাওয়া গেলো, যাদের প্রত্যেকেই পরিকল্পনাটি সামনে এগিয়ে নিতে ভীষণ আগ্রহী। তারুণ্যের শক্তি ও দৃঢ় সংকল্পের জন্যে এর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, 'অন্যরা যেখানে ভীত, হঠকারী, তারুণ্য সেখানে নির্ভীক'।

আমার সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকারা! আপনাদের কাছে আমি যা উপস্থাপন করতে চাই তা হলো কোরআনের আরবী পাঠের পাশাপাশি এর ইংরেজী ব্যাখ্যা। ইংরেজীতে হয়তো এর একটি শব্দের সম্পূর্ণ বিকল্প কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমি আরবী পড়ে যতোটুকু বুঝতে পেরেছি তা পরিপূর্ণভাবে মূল কোরআনের ছন্দ, সুর ও মহিমান্বিত ধ্বনি যতোটুকু সম্ভব ইংরেজী অনুবাদেও প্রতিফলিত হওয়া উচিত। হতে পারে তা ম্লান প্রতিবিম্ব, কিন্তু-এ রূপ সৌন্দর্য ও শক্তির যতোটুকু আমার কলম দ্বারা নির্দেশিত হতে পারে তা এর সেবায় নিয়োজিত থাকবে। আমার মতো একজন নগণ্য মানুষের পক্ষে যতোটুকু সম্ভব আমি অবশ্যই আপনাদের আনুষংগিক সব ধরনের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে চেষ্টা করবো। ছন্দবদ্ধ গদ্য বা মুক্ত পংক্তি (যাই বলুন), আমি আমার ধারাবাহিক বিবরণীতে আপনাদের জন্যে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করেছি। স্বাভাবিকভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেই আমি সরাসরি মূল সূরাতে চলে এসেছি। যেখানে সূরা ছোটো সেখানে মূল পাঠে যাওয়ার আগে আমি আপনাদের জন্যে দুই বা তিন অনুচ্ছেদে ধারাবাহিক কিছু বিবরণী পেশ করেছি। যেখানে সূরা দীর্ঘ সেখানে আমি মাঝে মাঝে বিষয়বস্তুটির বিবরণ সংক্ষিপ্ত ও সঠিক অনুচ্ছেদের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে, সূরায় উল্লেখিত স্বতন্ত্র পংক্তিমালাকে নির্দেশ করা হয়েছে। ধারাবাহিক বিবরণীর অনুচ্ছেদসমূহকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখার জন্যে ক্রমিক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ধারাবাহিক ছন্দবদ্ধ বিবরণীটি নিজ থেকে পড়া সম্ভব। তবে বইটি নিজ থেকে পড়তে যাওয়ার পূর্বে পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের বিস্তারিত সূচীপত্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করতে হবে।

ইংরেজীতে পাঠ্য বিষয়টি আরো বেশী স্বতন্ত্র, দীপ্তিময় ও মূল ভাবের সারাংশ রূপে তুলে ধরার জন্যে ধারাবাহিক বিবরণী থেকে বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে। একে আরবী পাঠের পাশাপাশি কলামে আরো ভিন্নরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি সূরা ও সূরার পংক্তিমালাকে পৃথক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সংখ্যাগুলো প্রতি পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হয়েছে। পংক্তিমালাকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিতকরণের এই পদ্ধতির সাথে পূর্ববর্তী অনুবাদসমূহের কোনো মিল নেই। ইউরোপীয় সম্পাদক মন্ডলী ও অনুবাদকরা তাদের গণণা পদ্ধতিকে প্রাচ্যের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি থেকে অনেকখানি বিচ্যুত করে



www.nagorikpathagar.org

ফেলেছে। এর ফলে উদ্ধৃতি দিতে ও সত্যতা যাচাই করতে অনেক সময় দ্বিধার সৃষ্টি হয়। বিরাম চিহ্ন ও পংক্তিমালার ক্রমিক সংখ্যার কারণে মাঝে মাঝে ভিন্নতা দেখা দেয়। যদিও এটা কোনো অপরিহার্য বিষয় নয়, তবে উদ্ধৃতিতে এটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। অন্তত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিতকরণের একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি মূলত মিশরীয় রাজার আমলে প্রকাশিত মিশরীয় সংস্করণ পদ্ধতিটিই অনুসরণ করেছি। এ পদ্ধতিটি সম্ভবত মিশর ও আরবী ভাষাভাষী দেশগুলোতে এবং যারা মিশরকে সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র মনে করে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আমি আনন্দিত যে, লাহোরের 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' দ্বারা স্বল্প সময়ে প্রকাশিত অনুবাদটিতেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। আমি ভারতীয় অন্যান্য প্রকাশকদেরও এই সুন্দর পদ্ধতিটি গ্রহণের অনুরোধ করি। যদি ক্রমান্বয়ে এরূপ করা হয় তবে একদিন আমরা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করণের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি পাবো। আমি প্রতি পরিচ্ছদের গণণায় আরবী পান্ডুলিপিতে ব্যবহৃত সার্বজনীন পদ্ধতি অব্যাহত রেখেছি এবং সূরাগুলোর একটি যুক্তিসংগত বিভক্তি চিহ্ন প্রদান করেছি। আমি পাঠকদেরকে পরিচ্ছদের উপ-বিভাগগুলোকে অনুচ্ছেদের মাধ্যমে বুঝতে দিতে চেষ্টা করেছি। এগুলোকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়নি, কিন্তু একটি পুষ্পিত আদ্যক্ষর দ্বারা স্বতন্ত্র করে তোলা হয়েছে।

অনুবাদের ব্যাপারে আমি আমার নিজস্ব কোনো মতামত প্রয়োগ করিনি বরং স্বীকৃত ব্যাখ্যাকারকদের অনুসরণ করেছি। যেখানে তারা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ পোষণ করেছেন, সেখানে সকল দিক থেকে যে মতটি আমার কাছে খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে আমি সেটিই গ্রহণ করেছি। যেখানে কেবলমাত্র শব্দের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন এসেছে সেক্ষেত্রে আমি প্রশ্নটি সম্পর্কে টীকায় ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট বলে মনে করিনি, আরো এক ধাপ এগিয়ে কিছু বলেছি; কিন্তু যেখানে মূল বক্তব্যের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উঠেছে সেখানে টীকায় এর পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। যেসব স্থানে আমি ইংরেজীতে মূল অর্থ উত্তমরূপে প্রকাশের জন্যে হুবহু অনুবাদ করিনি সেসব স্থানে টীকায় এর হুবহু অর্থ ব্যাখ্যা করেছি। উদাহরণস্বরূপ ২য় পারার ১০৪নং ও ২৬ নং আয়াত দেখা যেতে পারে। একটি আরবী শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ ব্যবহারে একজন অনুবাদককে অবশ্যই তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হয় এবং এতে হয়তো বা নিজের অজান্তেই তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগি প্রকাশিত হয়, অবশ্য তা পরিহার্য।

এখন টীকাসমূহের ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করা যাক। আমার দৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যতোদূর সম্ভব সংক্ষেপে আমি এগুলো আলোচনা করেছি। অর্থাৎ পাঠ্যটির অর্থ আমি যতোটুকু বুঝতে পেরেছি সে সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ আমি ইংরেজী পাঠক, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ পাঠকদের কাছে সমানভাবে তুলে ধরেছি। ধর্মতত্ত্বীয় বাদানুবাদ আলোচনা করতে গিয়ে আমি আমার রচনার বাহ্যিক দিকও বিবেচনা করেছি। এ ধরনের আলোচনা ও সমালোচনা হয়তো খুবই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান, কিন্তু তা যদি পবিত্র গ্রন্থটির প্রতি শুধুমাত্র শ্রদ্ধার আতিশয্য হয়ে থাকে, তবে সেগুলোর ভিন্ন কোনো নিবন্ধে স্থান পাওয়া উচিত। তাছাড়া বর্তমান পাঠকরা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর তথ্য জানতে চান। ফলে যেখানে এ ব্যাপারে কোরআনে সাধারণ নিয়মনীতি



www.nagorikpathagar.org

নির্দেশিত হয়েছে আমি সেগুলো ব্যাখ্যা করেছি। আমি বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনাকে এড়িয়ে গেছি. আমার 'Anglo-Muhammadan Law' বইটিতে সঠিক স্থানে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। আমি ব্যকরণ সংক্রান্ত বা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক কোনো টীকার জন্যে বেশী জায়গা দেইনি। এসব ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, আমাদের অতীতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা এতোই বিশ্লেষণ করে রেখে গেছেন যে, বর্তমানে নতুন করে বলার মতো কিছুই বাকী রাখেননি। স্বাভাবিকভাবে সেখানে খুব বেশী যুক্তিতর্ক দেখানো হয়নি এবং আমি কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। যেখানে একটি স্বতন্ত্র পংক্তি একটি স্বতন্ত্র ঘটনার নির্দেশ করতে চায় সেখানে পাঠ্যটিকে বুঝতে পারা একান্ত অপরিহার্য, তাই সেখানে আমি সংক্ষিপ্তাকারে তা বুঝানোর চেষ্টা করেছি, তাই বলে এ জন্যে অসামাঞ্জস্যপূর্ণ কোনো স্থান দখল করতে দেইনি। দেখা যাবে যে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা প্রকাশের জন্যে প্রতিটি পংক্তিরও আবার সাধারণ অর্থ আছে। নির্দিষ্ট ঘটনা ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট জনগণ এক সময় অতীত হয়ে যায়, কিন্তু এর সাধারণ অর্থ ও প্রয়োগ সকল সময়ে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। হিজরী চৌদ্দ শতকের যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা বর্তমানে উদ্বিগ্ন, তা হলো আল্লাহর বাণী থেকে আমরা নিজেদের জন্যে কি বিধান অনুসরণ করতে পারি?

আমি পংক্তিমালার সাধারণ অর্থ সম্পর্কে বলেছিলাম। কোরআনের প্রতি উৎসুক ও আগ্রহী ছাত্র যখন অধ্যয়ন ও গবেষণা চালিয়ে যায়, তখন সে বর্ণনাতীত গভীর আনন্দের সাথে দেখতে পায় তার বুঝার ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে কিভাবে এর সাধারণ অর্থ আরো বিস্তৃত হতে থাকে। এটা যেন পর্বতারোহীর ন্যায়, যতোই ওপরে ওঠা যায় ততোই বেশীদূর পর্যন্ত দেখা যায়। সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কবি কিট্‌স যখন চ্যাপম্যানের আশপাশের জায়গাগুলোতে 'হোমার' আবিষ্কার করেন তখন তিনি তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন এভাবে-

Then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his ken, or like stout cortez when with eagle eyes. He stared at the pacific,—and all his men looked at each other with a wild surmise, silent, upon a peak in Darien,

কোরআন যখন আমাদের অন্তদৃষ্টি খুলে দেয় তখনকার আনন্দ ও অলৌকিক অনুভূতি সত্যিই বর্ণনাতীত। যে অর্থ আমি চিন্তা করেছিলাম ও আঁকড়ে ধরেছিলাম তা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। চিন্তার সামনে নতুন নতুন জগৎ উন্মোচিত হয়। নতুন জগৎ আমাদের দৃষ্টিসীমায় সাঁতরে বেড়াতে থাকে। অলৌকিকতা গভীর থেকে গভীরতর হয় এবং একসময় তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে আমাদের গ্রাস করে ফেলে। আমরা জানি যে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, 'আল্লাহর মুখোমুখী হওয়া' আমরা এখনও সেই স্তরে পৌঁছতে পারিনি। যা মন্দ লোকেরা প্রত্যাখ্যান করতো, মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো এমনকি তা অপবিত্র ভাষায় পরিণত করতো, কিন্তু সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীবদের পক্ষ থেকে আসা আল্লাহর প্রতি নিন্দা, পরিহাস ও ঘৃণাকে আমরা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারি, কারণ আমরা বাস্তবতার দ্বারপ্রান্তে রয়েছি এবং আল্লাহ তায়ালার বাগানের অতি সামান্য সুগন্ধ ইতিমধ্যেই আমাদেরকে মুগ্ধ বিমোহিত করেছে।



www.nagorikpathagar.org

এ ধরনের অর্থ প্রকাশ করা খুবই কঠিন। কিন্তু আমি যেখানে যতোটুকু পেরেছি সেখানেই টীকায়, বর্ণনায় এবং পাঠ্যটির ঝংকার ও উন্নত ভাষার সাহায্যে তা সীমিত সাধ্যের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

আলোকচিত্র সম্বলিত কাঠের ছাঁচ থেকে আমি যে আরবী পাঠ্যটি ছাপিয়েছিলাম তা আমার জন্যে তৈরী করেন মাষ্টার মোহাম্মদ শরীফ। ক্যালিগ্রাফী এসেছে পীর আব্দুল হামিদের কলম থেকে, যার সংস্পর্শে আমি বহুদিন কাটিয়েছি এবং যার সাহসী ও শক্তিশালী হাত আমার ইচ্ছার সাথে একীভূত হয়েছিলো। স্বরবর্ণগুলো শব্দ থেকে পরিষ্কার ভাবে আলাদা হয়ে যে সব বর্ণের সাথে সম্পর্কিত তার উপরে বা নীচে বসে সঠিকভাবে নির্দেশিত হয়েছিলো এবং পংক্তিমালা সঠিকরূপে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়ে তাদের ইংরেজী সমার্থকের পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছিলো। মুসলিম চারুশিল্পে ক্যালিগ্রাফী একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে এবং আমি চাই আমার অনুবাদ যেন কোনোভাবেই এর থেকে আলাদা না হয়।

আরবী পাঠ্যের প্রুফ দেখার কাজে অধ্যাপক জাফর ইকবালের সাহায্য পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আঞ্জুমানের প্রকাশিত কোরআনের আরবী সংস্করণটিতে সঠিক বিরামচিহ্ন বসাতে তিনিও অনেক সময় বুদ্ধি ব্যয় করেছেন, এর ইতিহাস ও সমস্যাবলী অনুসন্ধান করেছেন। আমি আশা করি, একদিন তিনি এসব মূল্যবান টীকাসমূহ প্রকাশ করবেন। আমি আঞ্জুমান প্রকাশিত গ্রন্থটি নিয়মমাফিক প্রকাশনা শেষ হওয়ার পূর্বে তা দেখার বিশেষ সুবিধা পেয়ে আসছিলাম। আমি গ্রন্থটিকে ভারতে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে প্রস্তুত বলে মনে করি। আমি সাধারণত এর পংক্তিমালায় বিরাম চিহ্ন ও সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছি- কোরআনের পাঠ্যে এই একটি ক্ষেত্রেই কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ছাপার কাজটি যতোদূর সম্ভব শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিতে, নতুন আংগিকে, ভালো কাঁচের ন্যায় চকচেক কাগজে, সহজপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠ কালিতে করা। সব মিলে আমার স্বপ্ন সত্যিই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আমি আশা করি যারা এ কাজের অধিক প্রয়োজনীয় অংশগুলো উত্তমরূপে অনুমোদন করবেন, এর ফলাফল তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে। রিপন প্রেসের মালিক ও তার সকল কর্মী বিশেষ করে তাদের প্রধান প্রুফ পরীক্ষক কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। যখনই কোনো অস্বাভাবিক প্রশ্ন বা সমস্যা তাদের চোখে পড়েছে, তারা আনন্দের সাথে তা সমাধান করেছেন। এ জন্যে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রকাশক জনাব শায়খ মোহাম্মদ আশরাফ মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে তার কাজ করেছেন এবং আমি আশা করি জনগণ তার কাজের প্রশংসা করবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম বিনিময় দিবেন।

আমার পরিকল্পনা হলো প্রত্যেক পারার কাজ শেষ করে তা প্রচার করতে তিন মাসের অধিক সময় যেন না লাগে। কাজ যতো এগুতে থাকে, আমি আশা করি এর গতি আরো বাড়ানো সম্ভব। পরবর্তী খন্ডগুলোতে এই ধারাবাহিক পত্রাংক পদ্ধতি বজায় থাকবে। দুই বা তিন খন্ডে চূড়ান্ত বাঁধাই হবে। আমার লক্ষ্য হলো সমগ্র গ্রন্থটির একটি সম্পূর্ণ



www.nagorikpathagar.org

বিশ্লেষণমূলক সূচীপত্র সংগ্রহ করা। আমার আশা, সকল আগ্রহী ব্যক্তিরা অগ্রীম প্রদান পূর্বক প্রকাশকের মূল্য তালিকায় স্বাক্ষর করবেন।

পাঠকদের প্রতি আমার শেষ নিবেদন হলো, পবিত্র গ্রন্থটি পড়ুন, অনুশীলন করুন এবং হৃদয়ংগম করুন। এ ধরনের অধ্যয়ন নিজেই এর পুরস্কার। আপনারা যদি এ গ্রন্থে সমালোচনা করার মতো কিছু পান তবে দয়া করে এ কারণে বাকী অংশ পড়ার আনন্দটুকু নষ্ট করবেন না। আপনারা যদি আমাদের কাছে এর অধ্যায় ও পংক্তি উল্লেখপূর্বক লিখেন, আমরা আপনাদের সমালোচনা সানন্দচিত্তে বিবেচনা করবো। কিন্তু আমি যদি আমার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি দ্বারা আমার নিজের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করি তবে এতে আপনারা কষ্ট পাবেন না। যে কোনো সংশোধন কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হবে। অপর দিকে, কোনো বিষয় যদি আপনাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ বা সাহায্য করে, দয়া করে আমাদের লিখতে সংকোচ করবেন না। আপনাদের সাহায্য করতে আমি অন্যান্য দিকও আলোচনা করেছি। তবে এটা জেনে আনন্দিত হবেন যে, আমার এ পরিশ্রম বৃথা যায়নি। আপনারা যদি লাহোরের ঠিকানায় প্রকাশকের প্রযত্নে আমাকে লিখেন তবে তিনি সর্বদাই আমার কাছে পত্র পৌঁছে দিবেন।❑

*লাহোর, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৪*



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

৪

# কোরআনের ছায়াতলে

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

www.nagorikpathagar.org

কোরআনুল কারীম অধ্যয়নের সময় আমার মনে হয়েছে যেন আমি মর্ত্যলোক থেকে অনেক ওপরে উঠে গেছি, আর এই ওপর থেকে আমি নিচের পৃথিবীর দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, আর অবলোকন করছি জাহেলিয়াত যেন এক প্রলয়ংকরী ও সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে সমগ্র দুনিয়ার ওপর ছেয়ে আছে। আর এই জাহেলিয়াতে মাতোয়ারা মানুষগুলো যেন অন্ধকার আবেষ্টনীতে আটকা পড়ে আছে।

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমার জীবনের কতিপয় পবিত্র দিবারাত্রি, যা কোরআনের অধ্যয়নে অতিবাহিত হয়েছে–

'কোরআনের ছায়াতলে' জীবন অতিবাহিত করা, তার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং আল্লাহ তায়ালার এই শেষ কেতাব অনুধাবনের চেষ্টায় লেগে থাকা এমন মহামূল্যবান সৌভাগ্যের ব্যাপার, যার অনুধাবন শুধু তিনিই করতে পারেন, যিনি তার সময়গুলোকে কোরআন বোঝার কাজে লাগিয়ে রেখেছেন এবং কোরআনের পথে চলে নিজের জীবনকে পুত ও পবিত্র করে নিতে পেরেছেন।'

আমি আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, যিনি আমাকে এই মহান কাজের তাওফীক দান করেছেন। আমি এই কোরআন অধ্যয়নে নিজের সময় ব্যয় করে এমন একটি মূল্যবান সম্পদ হাসিল করতে পেরেছি, যার মূল্য ও মর্যাদার কোনো ধারণা ও পরিমাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার মতো অধম ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তায়ালার এ ছিলো এক বিরাট অনুগ্রহ। আমি যখন কোরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছি তখন তিনি আমার জন্যে রহমতের সব কয়টি দরজাই খুলে দিয়েছেন এবং আমাকে কোরআনের 'রূহের' এতো নিকটবর্তী করে দিয়েছেন, মনে হয় যেন কোরআন নিজেই বুঝি আমার ওপর তার সত্যসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করছে।

কোরআনুল কারীম অধ্যয়নের সময় আমার মনে হয়েছে যেন আমি মর্ত্যলোক থেকে অনেক ওপরে উঠে গেছি, আর এই ওপর থেকে আমি নিচের পৃথিবীর দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, আর অবলোকন করছি জাহেলিয়াত যেন এক প্রলয়ংকরী ও সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে সমগ্র দুনিয়ার ওপর ছেয়ে আছে। আর এই জাহেলিয়াতে মাতোয়ারা মানুষগুলো যেন নিজ নিজ অন্ধকার আবেষ্টনীতে আটকা পড়ে আছে এবং এমন এক গভীর খাদের ভেতর চাপা পড়ে আছে যে, তাদের কর্ণকুহরে এই আসমানী ডাক পৌঁছুতে পারছে না। সমগ্র মানবতা যেন পাগলের ন্যায় নেশাগ্রস্ত হয়ে জাহেলিয়াতে ডুবে আছে এবং জাহেলিয়াতের কর্মতৎপরতায় তারা সবাই আনন্দে আত্মহারা, যেমন এক শিশু তার খেলনাসমূহ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

এই দৃশ্য দেখে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং ভাবতে থাকি, কোরআনের উপস্থাপিত পূর্ণাংগ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন জীবনাদর্শকে দেখেও মানবতা কেন জাহেলিয়াতের এই দুর্গন্ধময় স্থানের দিকে ধাবিত হচ্ছে? এই অধপতনের দিকে তারা কেন নিমজ্জিত হচ্ছে এবং অন্ধকারের আবেষ্টনীতে তারা কেন ঘুরপাক খাচ্ছে, যেখানে কোরআন তাদের পরিচ্ছন্ন জীবনের দাওয়াত দিচ্ছে, জীবনের উচ্চতর স্থানের দিকে বারবার ডাক দিচ্ছে, চীৎকার দিয়ে তাদের ডাকছে, 'এসো, হে মানুষরা। আমি তোমাদের অন্ধকারের অতল থেকে বের করে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসি।'

কোরআন অধ্যয়নকালে আমি একথা অনুধাবন করেছি যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে জীবন কাঠামো ও জীবন বিধান নির্ধারণ করেছেন তার সাথে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট–এই সৃষ্টিজগতের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং এর সর্বত্র একটা সামঞ্জস্য বিরাজ করছে।



www.nagorikpathagar.org

অতপর এটা আমি অনুধাবন করেছি যে, মানবতার বিপর্যয়ের মূল কারণ হচ্ছে সামঞ্জস্যশীল এই প্রাকৃতিক নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা, অপর কথায় এই নীতিমালার সাথে সংঘর্ষ বাঁধানো। মূলত শয়তান মানব জাতিকে এমন এক জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিয়েছে যেখানে 'আফসোস' ছাড়া আর কোনো উপায়ই তার জন্যে বাকী থাকেনি। কোরআন অধ্যয়নের সময় আমি এ কথাটা খুব ভাল করে জেনে নিয়েছি যে, এই বিশ্বজগতের ব্যাপকতা অসীম এবং এই দৃশ্যমান বিশ্বের চেয়ে অদৃশ্যমান বিশ্ব অনেক ব্যাপক।

মানবীয় জীবন এই বৈষয়িক দুনিয়ার রাস্তা ধরে আখেরাতের অসীম ব্যাপকতার দিকে ধাবিত হয়। মৃত্যু কোনো শুরুর শেষ নয়–বরং তা হচ্ছে এক অন্তিম যাত্রার সূচনা মাত্র। দুনিয়া ও আখেরাতের দীর্ঘ দূরত্বের ওপর বিস্তৃত হয়ে আছে মানুষের এই জীবন। এই জীবনে মানুষ যা কিছুই অর্জন করুক না কেন, শুধু সেটুকুই নয়–আরো অনেক কিছুই তার জন্যে রয়েছে। কোনো মানুষ এই দুনিয়ায় স্বীয় কর্মকান্ডের দন্ড থেকে বাঁচতে পারলেও ওখানে তার মুক্তি নেই। কারণ সেখানে কোনো যুলুম নেই, কিছুর অভাব নেই, কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। এই দুনিয়ায় একজন মোমেনের জীবন বিশ্ব চরাচরের সবকিছুর সাথেই সামঞ্জস্যশীল। মোমেন ব্যক্তি নিজেও আল্লাহ তায়ালার দিকে নিবিষ্ট এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিও আল্লাহ তায়ালার হুকুমের দিকে নিবিষ্ট, তাঁর হুকুমের সামনে সেজদারত।

'আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে যতো কিছু রয়েছে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়–সবকিছুই তাঁর সামনে মাথানত করছে এবং তাঁরই আশ্রয়তলে সবাই সকাল সন্ধ্যা অবনত মস্তকে নিমগ্ন আছে।' (সূরা আর রা'দ-১৫)

'এই সাত আসমান ও যমীনে এবং তার মধ্যে যতো সৃষ্ট জীব রয়েছে সবাই তাঁর গুণ গায়। এই সমগ্র সৃষ্টিকূলের মাঝে এমন একটি বস্তুও নেই, যা প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ আদায় করছে না।' (সূরা বনি ইসরাঈল-৪৪)

আমি কোরআন অধ্যয়নকালে একথা অনুধাবন করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন এক সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, যার সাথে তারা ইতিপূর্বে কখনো পরিচিত হতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতপর তাতে 'রূহ' দান করে জীবন দিয়েছেন।

'যখন আমি তাকে (মানব আকৃতিতে) ঠিক করে নেবো এবং তাতে আমার 'রূহ' দান করবো তখন তোমরা তার সামনে সেজদাবনত হয়ে পড়বে।' (সূরা আল হেজর-২৯)

এরপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করলেন।

'যখন তোমার মালিক বললেন, আমি যমীনের বুকে আমার একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি এবং যা কিছুই এই বিশ্বজগতে রয়েছে তার সবটুকুকেই আমি তোমার অধীনস্থ করে রেখেছি।' (সূরা আল বাকারা-৩০)

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মানব জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং নিজস্ব রূহ দিয়ে তার মধ্যে জীবন দান করেছেন তাই এই আল্লাহকেন্দ্রিক বিশ্বাসই মানব জাতিকে একত্রিত করে রাখার মাধ্যম হিসেবে নির্ধারিত হবে। এই বিশ্বাসই হচ্ছে মোমেনের দেশ,



www.nagorikpathagar.org

মোমেনের জাতি ও মোমেনের খান্দান। এই কারণেই এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মোমেন যে কোনো সময়ই একই প্লাটফরমে একত্রিত হতে পারে। মানুষ কোনো জন্তু-জানোয়ারের দল নয় যে, তাদের এক স্থানে একত্রিত করার জন্যে ঘাস কিংবা চারণভূমির ব্যবস্থা করতে হবে। দেশ, জাতি ও তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের স্থান তো সত্যিকার অর্থে মানবতার আসন থেকে অনেক অনেক নিচে।

ইতিহাসের প্রতি স্তরে মোমেনদের খান্দান ছিলো একটাই। সর্বাবস্থায় সে ঈমানী কাফেলায় শামিল থাকবে। যে কাফেলার সর্দার ছিলেন- নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), ইসমাইল (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (অ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.), ও মোহাম্মদ (স.)।

'এই যে তোমাদের দল, মূলত তা একই দল এবং আমিই তোমাদের মালিক, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।' (সূরা আল মোমেনুন- ৫৩)

যখন থেকে মানুষ এই যমীনে পা রেখেছে তখন থেকেই–ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে, যুগের প্রতিটি বিবর্তনে ঈমানদারদের একটা কাফেলা এখানে সতত মওজুদ ছিলো, আর ঈমানদারের এই কাফেলাকে ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি অধ্যায়ে একই ধরনের অবস্থা, একই ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাদের সংগ্রাম ছিলো জাহেলিয়াতের সাথে। গোমরাহীর বিরুদ্ধে তারা সর্বদাই আল্লাহদ্রোহিতাকে উচ্ছেদ কাজে তৎপর ছিলেন। তারা সর্বদাই অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। এই কাফেলা কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে হামেশা এগিয়ে গেছে, সব সময়ই তারা আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, কুফর ও ইসলামের প্রতিটি রণক্ষেত্রে তারা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করেছে।

'এবং যারা কাফের, আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাসী ছিলো, তারা তাদের নবীদের বললো, আমরা হয় তোমাদের এই জনপদ থেকে বের করে দেবো অথবা তোমাদেরকে আমাদের দলে শামিল হতে হবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে ওহী পাঠিয়ে বললেন যে, আমি যালেমদের ধ্বংস করে দেবো এবং অতপর এই যমীনের ওপর তোমাদের আমি 'আবাদ' করাবো। একথা তাদের বেলায় প্রযোজ্য যারা কেয়ামতের দিন আমার সামনে দাঁড়ানোকে এবং আমার আযাবকে ভয় করে।' (সূরা ইবরাহীম- ১৩, ১৪)

কোরআন অধ্যয়নের বিভিন্ন স্তরে আমার অন্তরে এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এই বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি কোনো ঘটনাচক্র নয় এবং এমনি এমনি তা সৃষ্টি করা হয়নি বরং আল্লাহ তায়ালা একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই তা তৈরী করেছেন।

'আমি প্রতিটি জিনিসকে সঠিক পরিমাপের ভিত্তিতে বানিয়েছি।' (সূরা আল ক্বামার- ৪৯)

'এবং তিনিই প্রতিটি জিনিসকে তৈরী করেছেন এবং অতপর তার একটি পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।' (সূরা আল ফোরকান- ২)

কিন্তু এসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার হেকমতসমূহ মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়নি।

'এতে ব্যথিত হবার কিছু নেই যে, তোমরা কোনো জিনিসকে হয়তো পছন্দ করছো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সূরা আন নেসা- ১৯)

'এতেও আশ্চর্যন্বিত হবার কিছু নেই যে, কোনো বিষয় তোমাদের ভালো লাগে না, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাতে তোমাদের জন্যে মংগল নিহিত রেখেছেন, আবার অন্য একটি



www.nagorikpathagar.org

জিনিস যা তোমাদের ভালো লাগে অথচ তা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর। এ বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন এবং তোমরা কিছুই জানো না। (সূরা আল বাকারা- ২১৬)

উপায়-উপকরণের ওপর কখনো ফলাফল নির্ভর করে, আবার কখনো করেও না। উপকরণ কখনো কার্যকর হয়, আবার কখনো তা ব্যর্থও হয়ে যায়, আর উপায়-উপকরণ সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার হাতে।

'তোমার তো জানা নেই, হয়তো আল্লাহ তায়ালা অতপর এর কোনো রাস্তা বের করে দেবেন।' (সূরা আত্ তালাক-১০)

'তোমরা কিছুই আশা করতে পারো না-হ্যাঁ আল্লাহ তায়ালার যা মঞ্জুর আছে তা ছাড়া।' (সূরা আত্ তাকওয়ীর ২৯)

মোমেন ব্যক্তি উপায়-উপকরণ এ জন্যেই ব্যবহার করে যে তাকে তা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার বিশ্বাস থাকে যে, এসব কিছুর কাংখিত ফলাফল আল্লাহ তায়ালার হাতেই। মোমেন তাঁর সমস্ত মনোনিবেশ আল্লাহ তায়ালার প্রতিই নিবদ্ধ রাখে। তাঁর হেকমত, জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রতি সে সদা সজাগ থাকে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের ওপর তার প্রগাঢ় আস্থা থাকে। এ কারণেই মোমেন ব্যক্তি সব রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে দূরে থাকতে পারে।

'শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদের অশ্লীল কাজ করতে বলে, (অপর দিকে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন, আল্লাহ তায়ালা বিশাল ব্যাপক ও অনেক প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল বাকারা-২৬৮)

কোরআনের ছায়াতলে আমি গভীর প্রশান্তিময়, নিশ্চিত ও পবিত্র জীবন কাটিয়েছি। আমি প্রতিটি দিগন্তে আল্লাহ তায়ালার লীলা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমি তার বহু ধরনের গুণাবলীর বিকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি।

'যখন সে তাঁর কাছে দোয়ার হাত ওঠায় তখন, এমন কে আছেন যিনি অস্থির হৃদয়ের আকুতি শ্রবণ করেন, আবার কে এমন আছেন যিনি তাঁর কষ্টসমূহ দূরীভূত করেন।' (সূরা আন নামল ৬২)

'তিনি স্বীয় বান্দাদের ওপর বিপুল ক্ষমতাবান।' (সূরা আল আনয়াম -৬১)

'তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সম্যক অবগত।' (সূরা আল আনয়াম-৭৪)

'আল্লাহ তায়ালা নিজ কার্যকলাপের ওপর অসীম ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (সূরা ইউসূফ-২১)

'জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার মনের মাঝে প্রাচীর হয়ে থাকেন।' (সূরা আল আনফাল-২৪)

'যা তিনি চান তাই তিনি করেন।' (সূরা আল বুরুজ-১৬)

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে কোনো না কোনো 'পথ' বের করে আনেন এবং তাকে এমন সব স্থান থেকে রেযেক সরবরাহ করেন, যার কোনো ধারণাও সে করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করবে, তিনি নিজেই তার জন্যে যথেষ্ট হবেন এবং তিনি যা করতে চান তা সহজেই সম্পন্ন করে দেন। (সূরা আত্ তালাক ৩)



www.nagorikpathagar.org

'এই ভূখন্ডে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণীকেই তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণে ধরে রেখেছেন।' (সূরা হুদ-৫৬)

'আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দাদের জন্যে যথেষ্ট নন? এবং তাঁকে ছাড়া তারা তোমাদের অন্য লোকদের দিয়ে ভয় দেখায়।' (সূরা আঝ ঝুমার-৩৬)

'আল্লাহ তায়ালা যাকে অপদস্থ করেন তাকে সম্মান দান করার কেউ নেই।' (সূরা আল হজ্ব-১৮)

'আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।'(সূরা আঝ ঝুমার ২৩)

আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়া জোড়া সবকিছু বানিয়ে একে অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মনীতির ওপর ছেড়ে দিয়ে রাখেননি বরং এখানে সর্বদাই প্রতিটি ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়ার পেছনে আল্লাহ তায়ালার নিজ ইচ্ছা ও এরাদাই কার্যকর থাকে।

মানুষের চলার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে জীবন বিধান রচনা করেছেন, তা মানবীয় উৎকর্ষের প্রতিটি ধাপে এবং উন্নতির প্রতিটি যুগে সমভাবে উপকারী, মুক্তি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে একই ধরনের নিশ্চয়তা বিধানকারী প্রমাণিত হয়েছে। এই জীবন বিধান এমন সব মানুষদের জন্যে যারা এই দুনিয়ায় বসবাস করে, এ কারণেই তাতে তার প্রকৃতি, যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ইসলাম এই ভূখন্ডে মানুষকে এবং তার ক্রিয়াকান্ডকে কখনো হীন করে দেখে না। ব্যক্তিগত, সামষ্টিক কিংবা কোনোক্ষেত্রেই তার গুরুত্বকে খাটো করে তাকে জন্তু-জানোয়ারের স্তরে নামিয়ে দেয় না। আবার তার ওপর তার যোগ্যতা, প্রতিভা ও ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত কোনো দায়িত্বও চাপিয়ে দেয় না। ইসলামের মতে মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এতো ঠুনকো নয় যে, মনগড়া কতিপয় দর্শন তৈরী করে তাকে পালটে ফেলা যাবে। মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার প্রদর্শিত 'সেরাতুল মোস্তাকীমে' কদম রাখে তখন মূলত সে তার প্রতিভা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার বিধি-নিষেধের ওপর চলতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে আল্লাহ তায়ালার পথে সে অগ্রসর হতে থাকে।

তবে ইসলামের এই পথ দীর্ঘ সহজ ও সরল। আল্লাহ তায়ালা এটা চান না যে, মানবীয় প্রকৃতিকে পদদলিত করে তার ওপর আধ্যাত্মিক কর্মের বোঝা চাপিয়ে ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ সিদ্ধ হোক। মানুষের তৈরী নতুন মতবাদগুলো মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আদর্শের বাস্তবায়ন দেখে নিতে চায়। এতে যদি দুনিয়ায় রক্তের নদী বয়ে যায়, মানুষের সামাজিক জীবন কাঠামো তছনছ হয়ে যায়, কিংবা তার অতীত ইতিহাসের অর্জিত পাওনাগুলো সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাতেও কিছু আসে যায় না।

ইসলাম তো মানুষের প্রকৃতির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে মিলে মিশে উন্নতির পথে কদম রাখতে চায়। দরকার মতো তাকে পথ প্রদর্শন করে অগ্রসর হতে চায়। এই প্রকৃতি যখন কল্যাণের দিকে পা বাড়ায় তখন ইসলাম তাকে আশ্রয় দেয়। আবার যখন অকল্যাণের দিকে ধাবিত হয় তখন এই প্রবণতা থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। ইসলাম প্রকৃতিকে পদদলিত করে অগ্রসর হতে চায় না বরং বুদ্ধিমত্তা ও হেকমতের সাথে প্রয়োজনে তাকে চলার পথ দেখায় এবং তাকে সাথে নিয়েই চলতে চায়। এই উন্নতির



www.nagorikpathagar.org

শীর্ষে পৌঁছানোর জন্যে এক যুগ, দু'যুগ সময়ও লাগতে পারে, আবার এই উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্যে বহু শতাব্দীরও প্রয়োজন হতে পারে।

ইসলামের উদাহরণ হচ্ছে একটি ছোট চারা গাছের মতো। একটি ছোট বীজ থেকে যার উদ্ভব, আস্তে আস্তে তা বড়ো হয় আবহাওয়ার বিবর্তনে ঝড়ঝঞ্ঝা ও দমকা হাওয়ার মোকাবেলা করে এক দীর্ঘ সময় পরে তা শক্ত বৃক্ষে পরিণত হয়। এই গাছ যিনি লাগিয়েছেন তিনি অধিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি ভালো করেই জানেন একদিন না একদিন এই চারাগাছ বৃক্ষে পরিণত হবে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে তাকে তার আহার পরিবেশন করা হবে এবং আস্তে আস্তে তা বড়ো হবে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও ঝড় তুফানে তা দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা যে প্রাকৃতিক নিয়মনীতির ওপর মানুষকে তৈরী করেছেন তাকে পদদলিত করে জোর করে চাপিয়ে দেয়া একটা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করলে তার ফলাফল হয়তো তাড়াতাড়িই দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু তেমন কিছু করার আল্লাহ তায়ালার কোনোই প্রয়োজন নেই।

'এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিয়মনীতিতে কখনো কোনো রদবদল দেখতে পাবে না।' (সূরা আল আহযাব-৬২)

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে জীবন বিধান ও বিশ্বচরাচরের জন্যে যে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করেছেন তার মূল ও একমাত্র বুনিয়াদ হচ্ছে 'হক'। কেননা প্রতিটি জিনিসই আপন অস্তিত্বের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ঋণী এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন 'হক'।

'এটি এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সত্য ও সঠিক, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদের ডাকে তারা মিথ্যা এবং আল্লাহ তায়ালা মহান, মর্যাদাবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ।' (সূরা লোকমান-৩০)

'আল্লাহ তায়ালা একে 'হক' ছাড়া আর কিছু দিয়েই তৈরী করেননি।'

'হে পরোয়ারদেগার, তুমি এই সৃষ্টিকূলকে নিরর্থক তৈরী করোনি, তুমি পবিত্র।' (সূরা আলে ইমরান-১৯১)

মোটকথা, এই বিশ্বজগতের মূল কথা হচ্ছে এই 'হক'। যখনি সৃষ্টি এই মৌলিক 'হক' থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে তখনই তার মেরুদন্ড ভেংগে পড়বে।

যদি 'হক' তাদের ইচ্ছাসমূহের আনুগত্য করে তাহলে আসমানসমূহ ও যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই কারণেই 'হক'কে ফলে ফুলে সুশোভিত হতে হবে এবং বাতিলকে মিটিয়ে যেতে হবে।

'আমি বরং সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি সত্য তখন মিথ্যার মাথা কেটে ফেলে এবং মিথ্যা মিটে যায়।' (সূরা আল আম্বিয়া-১৮)

'তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি নাযিল করেছেন, তারপর তা থেকে নদী-নালাসমূহ নিজেদের পাত্র মোতাবেক পানি গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। এরপর এই নদী-নালায় প্লাবন এলো, ফলে পানির উপরিভাগে কিছু ফেনাও সৃষ্টি হলো। অলংকারাদি বানাবার কালে মূল ধাতু আগুনে গলাবার সময়ও একই ধরনের ফেনা তাতে জেগে ওঠে। এই উপমা পেশ করে আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিলের ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করে তোলেন।' (সূরা আর রাদ-১৭)

(নদীনালা ও গলিত ধাতুর বেলায় যা সত্য) তেমনি যা ফেনা হয়ে উড়ে যায় আর যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর তাই শুধু যমীনে অবশিষ্ট থেকে যায়।



www.nagorikpathagar.org

'তোমরা কি দেখোনি যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামসমূহের কি ধরনের উপমা পেশ করেছেন। তা যেন একটি মূল্যবান ও পবিত্র বৃক্ষ, যার ভিত্তি অত্যন্ত মযবুত ও শাখা প্রশাখা আসমানসমূহে বিস্তৃত। নিজ মালিকের আদেশে তা সর্বদাই ফলমূল সরবরাহ করে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে উদাহরণ পেশ করেন। যেন তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অপবিত্র কথাসমূহের উদাহরণ হচ্ছে একটি বৃক্ষের মতো যাকে যমীনের উপরিভাগ থেকে উপড়ে ফেলা হয়। যমীনের ওপর তার কোনোই স্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সঠিক ও পরিশুদ্ধ কথাসমূহের দ্বারা দুনিয়ার জীবনেও তাদের দৃঢ়ভাবে রাখেন এবং আখেরাতের জীবনেও তাদের তিনি সেভাবেই রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা না ইনসাফ লোকদের পথভ্রষ্ট করে দেন এবং তিনি যা চান তা-ই করেন। (সূরা ইবরাহীম ৩৪-৩৭)

মোটকথা, ইসলামী জীবনাদর্শ মানুষকে যেমনি প্রশান্তি, স্থিরতা ও সত্যনিষ্ঠ আস্থা প্রদান করে তা অন্য কোনো জীবনাদর্শের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।

আমি কোরআন অধ্যয়ন কালে এ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে পেরেছি এবং এ বিষয়ের ওপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, দুনিয়ার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, মানবতা কোনোরকম শান্তি পেতেই পারে না, তার ভাগ্যে কোনোরকম মানসিক শান্তিই জুটতে পারে না, কোনো ব্যক্তিই উচ্চতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পেতে পারে না, সর্বোপরি মানব জাতি কখনো বিশ্বচরাচরের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও আসমানী নীতিমালা ও বিধি-নিষেধের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না–যতক্ষণ পর্যন্ত সে মানুষ আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত না হবে। আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হবার একমাত্র পন্থা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থাকে মানুষ সর্বাংশে গ্রহণ করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কেতাব ও তাঁর রসূল (স.)–এর সুন্নতের কাছ থেকে পথের দিশা নেবে, এই পন্থা ছাড়া আর সবকিছুই এক একটা ভাংগন-বিপর্যয়, অপবিত্রতা তথা জাহেলিয়াত।

'অতপর যদি এরা তোমার কথা না মেনে নেয়, তাহলে জেনে রাখো যে, এরা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্বই করে বেড়ায়। তার চেয়ে গোমরাহ্ ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াতকে উপেক্ষা করে নিজস্ব মনোবৃত্তির আনুগত্য করে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যালেম লোকদের পথ দেখান না।' (সূরা আল কাসাস-৫০)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কেতাবকে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী বানানো এমন কোনো কথা নয় যে, মন চাইলো তা মানলাম আবার মনে চাইলো–না বলে তা উপেক্ষা করলাম বরং এর ওপরই ঈমানের সমগ্র ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত।

'কোনো মোমেন পুরুষ কিংবা নারীর এ অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.) কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন, তা গ্রহণ না করে তাতে নিজেদের কোনোরকম অধিকার খাটাবে।' (সূরা আল আহযাব-৩৬)

'অতপর আমি তোমাদের দ্বীনের সঠিক পথে বসিয়ে দিয়েছি, তোমরা এই পথই অনুসরণ করো। অজ্ঞ ও জাহেল ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর চলো না। এরা সেদিন আল্লাহ তায়ালার সামনে তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। যালেমরা একে অন্যের বন্ধুই হয়ে থাকে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই শুধু পরহেযগারদের একমাত্র বন্ধু।' (সূরা আল জাসিয়া-১৮-১৯)



www.nagorikpathagar.org

এ ব্যাপারটা খুব সামান্য ও সহজ কিছু নয়, গোটা মানবজাতির সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সাথে রয়েছে এর সম্পর্ক। আল্লাহ তায়ালা ইসলামী জীবন পদ্ধতির মাঝেই মানুষের সব ধরনের দুঃখ মুসীবত ও জ্বালা– যন্ত্রণার সমাধান পেশ করেন।

'আমি কোরআনের মাধ্যমে সেসব কিছু নাযিল করি যা মোমেনদের জন্যে শেফা ও রহমত।' (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৩)

'এই কোরআন সে রাস্তাই দেখায় যা সবচেয়ে সহজ।' (সূরা বনি ইসরাইল-৯০)

আজ মানব জাতির দুর্ভাগ্য ও বদনসীবীর মূল কারণ হচ্ছে, তারা আজ তাদের জীবনের সব কার্যকলাপ বিশ্ব স্রষ্টার দিকে ধাবিত হয় না। যতোদিন পর্যন্ত তারা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট না হবে ততোদিন পর্যন্ত তার' এভাবেই দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে এবং এভাবেই তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হতে থাকবে। ইসলামকে উপেক্ষা করা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা, মানব জাতির ইতিহাসের এমন ভয়াবহতম দুর্ঘটনা, যা গোটা মানব ইতিহাসে দ্বিতীয়বার ঘটেনি।

ইসলাম এমন এক সময় এসেছে যখন সমগ্র মানবজাতি জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ঠোকর খাচ্ছিলো। গোটা জনপদ দুর্নীতি ও কদাচারে ভরে উঠেছিলো, পাপে সমগ্র দুনিয়া ছেয়ে গিয়েছিলো। এমন সময় ইসলাম এসে মানুষদের এক নতুন জীবন দান করলো। সর্বোপরি মানুষকে পেশ করলো আল্লাহর আখেরী কেতাব আল কোরআন–যা মানুষকে তার জীবন ও চারদিকের বিশ্ব সম্পর্কে নতুন এক মূল্যবোধের শিক্ষা দিলো।

জীবন ধারণের এই নতুন পদ্ধতিকে সমাজে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে সে দেখিয়ে দিলো। যখন এই নতুন ব্যবস্থা তার সঠিকরূপ নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তাতে এমন ধরনের পবিত্রতা, এমন ধরনে সহজ সরলতা, এমন ধরনের জ্ঞানের ব্যাপকতা, এমন ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্যতার বিকাশ ঘটলো, যা সমাজে প্রতিষ্ঠা করে দেখানো তো দূরের কথা–মানুষের জ্ঞান প্রতিভা এমন কিছুর কল্পনাও করতে পারেনি।

অতপর মানুষের দুর্ভাগ্য তাকে আস্তে আস্তে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো। জাহেলিয়াত বারবার তার লেবাস বদল করে মানুষের ওপর সওয়ার হয়ে পড়লো। তাই ধোঁকা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত এই নব্য জাহেলিয়াতের লোকেরা বললো, 'বৈষয়িক উন্নতি ও ইসলাম' এর যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। কারণ, এদের উভয়ের রাস্তা নাকি আলাদা ও পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা এতো বড়ো ধোঁকা যে, তার তুলনা সম্ভবত মানব জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাস্তব কথা হচ্ছে, ইসলাম বৈষয়িক আবিস্কার ও উদ্ভাবনার শত্রু নয়, বরং ইসলাম মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং তাকে পূর্ণাংগ পথ প্রদর্শন করেছে। ইসলাম তো মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছে। এই বিশ্ব চরাচরের সমস্ত গুপ্ত শক্তিসমূহকে তাঁর হাতে ন্যস্ত করে এদের তাঁর অনুগত বানিয়ে দিয়েছে। অবশ্য একটাই শর্ত তাতে জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং তা হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর প্রদর্শিত 'সেরাতুল মোস্তাকীম' অনুযায়ী কাটাতে হবে, আর তার জীবনের সমগ্র কর্মসূচী আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত হেদায়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। যদি এমন হয় তাহলে মানুষের প্রতিটি কাজই আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর এবাদাতের শামিল।

সমাজে এমন কিছু সরল প্রকৃতির লোক আছে যাদের নিয়তে কোনো খুঁত না থাকলেও তাদের জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব থাকে। এরা মনে করেন মানুষের ঈমানী মূল্যবোধ আলাদা



www.nagorikpathagar.org

বস্তু এবং তাদের বৈয়ষিক উন্নতি উৎকর্ষ ও প্রাকৃতিক নিয়ম নীতি আলাদা বিষয়। 'প্রাকৃতিক নিয়মনীতি আমাদের ওপর সব সময়ই তার প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার প্রভাব সৃষ্টিতে ঈমান থাকা না থাকায় তেমন কোনো তারতম্য সৃষ্টি হয় না'–এমন মনে করা মোটেই ঠিক নয়। এরা আল্লাহর বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের দু'টি বিভাগকে আলাদা আলাদা ভেবে নিয়েছে। মূলত ব্যাপারটা তা নয়, প্রাকৃতিক বিধি-বিধান যেমনি আল্লাহর আইনমালার অংশ তেমনি ঈমানী মূল্যবোধও তাঁর কানুনের একটি অংশ। এই উভয়বিধ আইনের ফলাফল পরস্পর সম্পৃক্ত ও একক। এটাই হচ্ছে সঠিক ধারণা। আল্লাহ তায়ালা একথাই কোরআনে পেশ করেছেন,

'যদি আহলে কেতাবের লোকেরা ঈমান আনতো এবং পরহেযগার হতো, তাহলে আমি তাদের গুনাহ-খাতা মিটিয়ে দিতাম এবং তাদের জান্নাতের সুন্দরতম বাগানসমূহে প্রবেশ করিয়ে দিতাম। যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও তাদের ওপর নাযিল করা অন্যান্য কেতাবের ওপর তারা ঈমান আনতো তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর করুণা এভাবে বর্ষিত হতো যেন তারা ওপর থেকেও খেতে পারতো আবার নিচ থেকেও ভোগ করতে পারতো।' (সূরা আল মায়েদা- ৬৫-৬৬)

'আমি অতপর তাদের বললাম, আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাও, তিনি মহান ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর থেকে পানি বর্ষণ করবেন এবং সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের তিনি বিভিন্ন ধরনের বাগান দান করবেন, সেখানে আবার তোমাদের জন্যে ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করবেন।' (সূরা নূহ)

'আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতির ওপর অর্পিত নেয়ামতকে কখনো বদলে দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে।' (সূরা আর রা'দ –১১)

আল্লাহর ওপর ঈমান, তাঁর এবাদাত ও তাঁর যমীনে তাঁরই আইনের প্রতিষ্ঠা মূলত তাঁর নীতিমালার চূড়ান্ত পূর্ণতার নাম। এরই এক অংশের নাম ইচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম নীতি। এমন অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় যে, মানুষ ঈমানী মূল্যবোধের কোনো পারোয়া না করে শুধু প্রাকৃতিক আইনেরই গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং তাতে সফলকামও হয়ে যায়। ঈমানী মূল্যবোধকে উপেক্ষা করার বাহ্যিক পরিণাম তেমন একটা দেখা যায় না। যদিও শুরুর দিকে এই পরিণামের বহিপ্রকাশ অনুভূত হয় না কিন্তু পরবর্তী কোনো যুগে কিংবা কোনো পর্যায়ে এসে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখা যাবেই।

ইসলামী সমাজ তখনি উন্নতির শিখরে উপনীত হতে পেরেছে যখন মুসলমানরা একই সময় ইসলামী মূল্যবোধ ও মানবীয় গুণাবলীতে নিজেদের সাজাতে পেরেছে, যতোই এই উভয়ের মাঝে দূরত্ব বিস্তৃত হতে থাকলো ততোই তাদের অধপতন বাড়তে লাগলো, আর যখন তারা এই উভয়টাকেই ভুলে গেলো তখন তারা অধপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে গেলো।

ইসলামী সমাজের পাশাপাশি আধুনিক সভ্যতার কথা চিন্তা করা যায়। এর উদাহরণ হচ্ছে, এমন একটি পাখীর ন্যায় যার একটি পাখা কেটে দেয়া হয়েছে। একটি পাখার ওপর ভিত্তি করেই সে এখন শূন্যে ঝুলে আছে, ঠিক এভাবেই আজ আধুনিক সভ্যতা যে পরিমাণ বৈষয়িক উন্নতি অর্জন করতে পারলো সেই পরিমাণ নৈতিক অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হলো। যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর দিকে ধাবিত না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা এই ধ্বংস থেকে মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাবে না।



www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে আইন নির্ধারণ করেছেন তা সেই সামগ্রিক আইনেরই অংশ বিশেষ যা তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য বানিয়েছেন। এই শরীয়তের অনুসরণই মানব প্রকৃতিকে গোটা বিশ্বের নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে দেয়, আর এই শরীয়ত তথা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ঈমানের উপস্থিতি এবং একটি ইসলামী সমাজের উপস্থিতি একান্ত জরুরী এর সাথে সাথে 'শরীয়াতে এলাহীর' পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্যে জরুরী হলো তাকওয়া, পরহেযগারী ও দৃঢ়তার সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়া। এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা যার মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলী ও ইসলামী মূল্যবোধের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারে। এই দু'টো বিষয়ই আল্লাহর অমোঘ বিধানের অধীন, যার ভিত্তিতে সমগ্র দুনিয়ার নিয়ম নীতি চলছে।

মানুষ যেহেতু নিজেও বিশ্বজগতের এক অংশ তাই তার সৃষ্টি ও অস্তিত্ব, তার কাজ ও ইচ্ছা, তার নেকী ও ঈমান, তার এবাদাত এবং নিষ্ঠা এর সব কিছুই এই বিশ্ব চরাচরের একটা 'হ্যাঁ' বোধক জবাব মাত্র। এর সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার ব্যাপক ও সাধারণ নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তার জন্ম হয়। এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েই সে ফলাফল সৃষ্টি করে, আর মানুষের জীবন যখন এই নিয়ম নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে তা থেকে দূরে সরে পড়ে তখনি তাতে বিশৃঙ্খলা ও পেরেশানি দেখা দিতে শুরু করে। জীবনের কাঠামো ভেংগে পড়ে এবং দুর্ভাগ্য ও বদনসীবির ছায়া তাদের ওপর আস্তে আস্তে বড়ো ও বিস্তৃত হতে থাকে।

'এটি এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে যখন এই নেয়ামত দান করেন যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষরা নিজেদের মনের অবস্থা পরিবর্তন না করে ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিবর্তন করেন না।' (সূরা আল আনফাল–৫৩)

মোটকথা, মানুষের বোধশক্তি ও তার কার্যকলাপের সাথে আল্লাহর নিয়ম নীতির অধীনে পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের এক গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এই সম্পর্ককে সে ব্যক্তিই বিনষ্ট করতে পারে, সে-ই এই সামঞ্জস্যে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, সে-ই এই নিয়মনীতি ও মানুষের মাঝে ক্ষতির কারণ হতে পারে–যে ব্যক্তি মানবতার দুশমন, যে ব্যক্তি হেদায়াতকে উপেক্ষা করে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাচ্ছে। সর্বোপরি এইভাবে ঘুরে বেড়ানোই মূলত যার ভাগ্যের লিখন হয়ে গেছে। আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া পর্যন্ত সে এভাবেই ঠোকর খেতে থাকবে।

আমি যখন আমার জীবনের মূল্যবান সময়গুলো 'কোরআনের ছায়াতলে' অতিবাহিত করছিলাম তখন এই কয়টি চিন্তা ও ভাবনা আমার মনে বারবার দানা বেঁধে উঠেছে। এই কথাগুলোকেই আমি 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর ভূমিকাস্বরূপ এখানে পেশ করলাম। হতে পারে এই কথাগুলোকে আল্লাহ তায়ালা কারো জন্যে হেদায়াতের উৎস বানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তায়ালার ভাষায়, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না।'❑

*( লেখকের কালজয়ী গ্রন্থ 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এর ভূমিকা)*



www.nagorikpathagar.org

# কোরআনের পরিচয়

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

www.nagorikpathagar.org

কুরআন বুঝিতে চাহিলে তাহাকে সর্বপ্রথম একেবারে উন্মুক্ত ও অনাবিল মন-মস্তিষ্ক লইয়া বসিতে হইবে। কারণ যাহারা পূর্ব হইতে বদ্ধমূল বিশেষ ধ্যান-ধারণা মনে রাখিয়া কুরআন পড়িতে শুরু করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কুরআন না পড়িয়া উহার ছত্রে ছত্রে নিজেদেরই পূর্ব ধারণার পাঠ নূতন করিয়া গ্রহণ করে মাত্র। ইহাদের মনে কুরআনের স্পর্শ পর্যন্ত লাগিতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

**কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা**

আমরা সাধারণত যে ধরনের বই-পুস্তক পড়িতে অভ্যস্ত, তাহাতে এক-একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তথ্য, মতামত ও যুক্তি-প্রমাণগুলিকে গ্রন্থ প্রণয়নের একটি পদ্ধতি ও ক্রমিক ধারায় সংযোজিত ও সুসংবদ্ধভাবে বিধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই একজন লোক যখন প্রথমবার কুরআন মজীদ অধ্যয়নের ইচ্ছা করে, তখন সে ইহাকেও অপরাপর গ্রন্থের অনুরূপ মনে করিয়া এই আশা লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হয় যে, এই কিতাবেও সাধারণ বই-পুস্তকের ন্যায় প্রথমে বিষয়বস্তু নির্ধারিত হইবে, পরে মূল আলোচ্য বিষয়কে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া ক্রমাগত সুবিন্যস্তভাবে এক একটি বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হইবে। কিন্তু কার্যত যখন সে এই কিতাব খুলিয়া পড়িতে শুরু করে, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও অভিনব এক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সম্মুখীন হয়। এখানে সে দেখিতে পায় যে, বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা, নৈতিক নির্দেশনা, শরীয়াতী বিধি-নিষেধ, আহবান-আমন্ত্রণ, উপদেশ, সাবধানবাণী, সমালোচনা, তিরস্কার, ভীতি প্রদান, সুসংবাদ, সান্ত্বনা, যুক্তি-প্রমাণ, সাক্ষ্য-উদাহরণ, ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম ও নিদর্শনের প্রতি ইংগিত বারবার পরস্পর আবর্তিত হইতেছে। বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। ইহাতে একটি বিষয়ের পরে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টির পর তৃতীয়টির আলোচনা আকস্মিকভাবে শুরু হয়। অনেক স্থানে আবার একটি বিষয়ের আকস্মিক অবতারণা করা হয়। বাক্যের মধ্যকার প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষের বারবার পরিবর্তন ঘটে এবং বারবার থাকিয়া থাকিয়া বাক্যের লক্ষ্য ও দিক বদলিয়া যায়। অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের কোনো নাম বা সীমা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ইতিহাসের আলোচনায় ইতিহাসের এবং দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে সাধারণ প্রচলিত দর্শন কিংবা তর্কশাস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করা হয় নাই। মানুষ, বিশ্বের দ্রব্য-সামগ্রী ও উপাদানের উল্লেখ পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভংগীতে করা হয় নাই। তামাদ্দুন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কীয় আলোচনাও সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে করা হয় নাই। আইনের বিধি-নিষেধ ও আইনের নীতি-ধারার আলোচনা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে আইন রচয়িতাদের অবলম্বিত পদ্ধতি আদৌ প্রযুক্ত হয় নাই। নৈতিক শিক্ষার আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু নীতি দর্শন সম্পর্কীয় সকল প্রকার বই-পুস্তক হইতেই উহার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সব কিছুই পূর্ব ধারণার বিপরীত পদ্ধতিতে আলোচিত হইতে দেখিয়া নূতন পাঠক স্বভাবতই বিব্রত হইয়া পড়ে, অস্বস্তি বোধ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে দিশাহারা হইয়া যায়। তখন সে কুরআন মজীদকে এমন একখানা অসংবদ্ধ, পরস্পর সম্পর্কহীন, বিক্ষিপ্ত ও বিশ্লিষ্ট বাণীসমষ্টি মনে করে, যাহা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ, বিভিন্ন ও পূর্বাপর সম্পর্কহীন বাক্যাংশে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু সেইগুলিকে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে ধারাবাহিক ভাষণ হিসাবে। বিরুদ্ধবাদীগণ ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া কুরআন মজীদ সম্পর্কে নানা প্রকারের প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে। আর ইহার সমর্থক লোকেরা কখনো এই বাহ্যিক অসংলগ্নতার কোন-না-কোন যৌক্তিকতা দেখাইয়া নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয়, কখনো কৃত্রিম উপায়ে পূর্বাপর সম্পর্ক সন্ধানে নানা



www.nagorikpathagar.org

প্রকার অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করে। এমনকি এই ধরনের লোকেরা অনেক সময় কুরআনের আয়াতসমূহকে পূর্বাপর সম্পর্কহীন বাণী ধারণা করিয়া বসে, যাহার ফলে প্রত্যেকটি আয়াত পূর্বাপর সম্পর্কহীন হইয়া অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অর্থ পরিবেশনের এক লীলাকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তাহা মূল বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়, একখানি কিতাবকে খুব ভালো করিয়া বুঝিবার জন্যে পাঠকের পক্ষে উহার বিষয়বস্তু, উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে, উহার কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয় গভীরভাবে জানিয়া লওয়া আবশ্যক– আবশ্যক উহার আলোচনার ধারা অনুধাবন করা, উহার পারিভাষিক শব্দসমূহ এবং উহার বিশিষ্ট বিশ্লেষণ পদ্ধতির সহিত নিগূঢ় পরিচিতি। কিতাবের ভাষণসমূহ বাহ্যিক বর্ণনার পশ্চাতে যে অবস্থা ও ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তাহাও পুরাপুরি সম্মুখে থাকা আবশ্যক। সাধারণত যেসব বই-পুস্তক পাঠে আমরা অভ্যস্ত, তাহাতে এই বিষয়গুলি যথাযথভাবে এবং অতি সহজেই পাওয়া যায়। ফলে উহার বিষয়বস্তুর সহিত গভীরতর পরিচিতি লাভের পথে আমাদেরকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না। কিন্তু এই বিষয়গুলি কুরআন মজীদে অনুরূপভাবে বর্তমান পাওয়া যায় না। ইহার ফলে একজন সাধারণ পাঠকের মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী লইয়া কেহ কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করিতে শুরু করিলে উহার নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, প্রতিপাদ্য ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ের কোনো সন্ধানই সে পাইতে পারে না। উহার আলোচনার ধারা এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতিও পাঠকের দৃষ্টিতে অনেকটা অভিনব ও অপরিচিত মনে হয়; অনেক ক্ষেত্রে আবার ভাষণের পশ্চাদভূমিও তাহার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যায়। ইহার ফলে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে মণি-মুক্তা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কম-বেশী তাহার সহিত পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও পাঠক আল্লাহর বাণীর মূল ভাবধারা অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য আল্লাহর কালামের জ্ঞান লাভ করার পরিবর্তে কিতাবের কতকগুলি বিক্ষিপ্ত তত্ত্ব জানিয়া লওয়াকেই যথেষ্ট মনে করিতে হয়। অনেক লোক কুরআন পাঠ করিতে যাইয়া বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হয়। তাহাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার আর একটি কারণ এই যে, কুরআন বুঝিবার জন্য উল্লিখিত অপরিহার্য কথাগুলি না জানিয়াই যখন কুরআন পাঠ করিতে শুরু করে, তখন উহার পৃষ্ঠায় বিভিন্ন প্রকার বিষয়বস্তু বিক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাইয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়ে। অনেক আয়াতের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করাই কঠিন মনে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পদ্ধতি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে কুরআনের প্রকৃত অর্থ পাঠকের নিকট হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকে এবং অনেক স্থানে আয়াতের পটভূমির সঠিক জ্ঞান না থাকার দরুণ পাঠক মারাত্মক ভ্রান্তিবোধে নিমজ্জিত হয়।

**সমস্যার কারণ ও উহার সমাধান**

কুরআন কি ধরনের গ্রন্থ, উহার অবতীর্ণ হওয়ার এবং বর্ণনা পরম্পরার স্বরূপ কি, উহার আলোচ্য বিষয় কি, উহার সমগ্র আলোচনা কোন্ কথাটি প্রমাণের জন্য নিয়ন্ত্রিত হয়, কোন্ কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সহিত উহার বিভিন্ন ধরনের কথা সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, উহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের জন্য কোন্ যুক্তিবিন্যাস এবং কোন্ আলোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে– এই সব এবং এই ধরনের আরো অসংখ্য প্রশ্ন এমন রহিয়াছে, যাহার সুস্পষ্ট ও সহজতর উত্তর শুরুতেই পাঠকের সম্মুখে বর্তমান থাকিলে অসংখ্য প্রকার বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। ইহার দ্বারা কুরআন অনুধাবন করা এবং সেই



www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করার পথও তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদে প্রচলিত গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতির সন্ধান করে, কিন্তু কুরআনে তাহা না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়ে, কুরআন অধ্যয়নের উল্লেখিত মৌলিক প্রশ্নসমূহের সুস্পষ্ট উত্তর অজ্ঞাত থাকাই তাহার হতাশার প্রকৃত কারণ। যেহেতু সে ধর্ম সম্পর্কে একখানা গ্রন্থ পড়িতে শুরু করিয়াছে বলিয়া ধারণা করে, ফলে 'ধর্ম' এবং 'গ্রন্থ' সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু কার্যত কুরআনের পৃষ্ঠায় যখন তাহার বদ্ধমূল ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কোন জিনিসের সাক্ষাত ঘটে, তখন সে নিজেকে উহার সহিত পরিচিত করিয়া তুলিতে ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে সক্ষম হয় না এবং বিষয়বস্তুর মূল কথার নাগাল না পাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া কুরআনের ছত্রে ছত্রে সে এমনভাবে ঘুরিতে শুরু করে, যেমন বিরাট শহরে নবাগত কোন যাত্রী নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া ঘুরিতে বাধ্য হয়। এই বিভ্রান্তি ও হতাশার আঘাত হইতে প্রত্যেক পাঠকই বাঁচিতে পারে, যদি তাহাকে প্রথমেই এই কথা সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দেওয়া যায় যে, কুরআন মজীদ গ্রন্থ-জগতে সম্পূর্ণ অভিনব ও স্বতন্ত্র ধরনের একখানা গ্রন্থ– সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই ইহা 'প্রণয়ন' করা হইয়াছে। বিষয়বস্তুর মূল আলোচনা এবং পরম্পরা বিধানের দিক দিয়া ইহা এক আশ্চর্য ধরনের গ্রন্থ; অতএব গ্রন্থাদি সম্পর্কে প্রচলিত ও বদ্ধমূল ধারণা এই কিতাব বুঝিবার জন্যে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না, বরং তাহা প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করিবে। উহাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করিতে হইলে হৃদয়-মন হইতে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল সকল প্রকার ধারণা-কল্পনা নির্মূল করিয়া এই গ্রন্থের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের সহিত গভীরভাবে পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যে পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনেরই সহিত পরিচিত হইতে হইবে। উহার প্রতি তাহার ঈমান আছে কি নাই, সেই প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু এই কিতাবকে সঠিকরূপে বুঝিবার জন্যে তাহাকে প্রারম্ভিক সূত্র হিসাবে সেই মূলকেই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা স্বয়ং উক্ত কিতাব এবং উহার উপস্থাপক হযরত মুহাম্মাদ (স) উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা নিম্নরূপঃ

দুইঃ মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন যে, তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির মালিক, মা'বুদ এবং আইন-বিধানদাতা প্রভু আমি-ই। আমার এই রাজ্যে না তোমরা স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হইতে পার, না অপর কাহারো দাস হইতে পার আর না আমি ব্যতীত অপর কেহ তোমাদের ইবাদত ও দাসত্ব-আনুগত্য পাইবার অধিকারী হইতে পারে। তোমাদের এই পার্থিব জীবন-সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা-ইখতিয়ার সম্বলিত জীবন– মূলত তোমাদের পরীক্ষার সময় মাত্র। এই জীবনান্তে তোমাদেরকে আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। অতপর আমি তোমাদের পার্থিব জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম যাচাই ও হিসাব করিয়া দেখিব এবং তোমাদের মধ্যে কে সাফল্য লাভ করিল আর কে ব্যর্থ হইল তাহার চূড়ান্ত ফায়সালা শুনাইয়া দিব। তোমাদের পক্ষে নির্ভুল ও সঠিক কর্মনীতি এই-ই হইতে পারে যে, তোমরা সকলে আমাকেই নিজেদের একমাত্র মা'বুদ ও বিধানদাতা প্রভু বলিয়া স্বীকার করিবে, আমার প্রেরিত বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পন্ন করিবে এবং পৃথিবীকে পরীক্ষা-কেন্দ্র মনে করিয়া এবং আমার চূড়ান্ত ফায়সালায় সাফল্য লাভই



www.nagorikpathagar.org

তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- এই চেতনা লইয়াই জীবন যাপন করিতে থাকিবে। এতোদ্ভিন্ন অপর সকল প্রকার আচরণই তোমাদের পক্ষে ভুল ও মারাত্মক হইবে। প্রথম পন্থা অবলম্বন করিলে- যাহা অবলম্বন করার তোমাদের স্বাধীনতা রহিয়াছে- পার্থিব জীবনেও তোমরা পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিতে পারিবে এবং আমার নিকট ফিরিয়া আসার পর 'জান্নাত' নামক চিরন্তন সুখ ও আনন্দময় স্থানে তোমাদের স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দান করিব। আর অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করিলে- যাহা করারও তোমাদের স্বাধীনতা রহিয়াছে- পৃথিবীতেও বিপর্যয় ও অশান্তি ভোগ করিতে হইবে এবং পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার পর পরকালীন জীবনে 'জাহান্নাম' নামক চিরন্তন দুঃখ ও বিপদের কঠিন ও অতল গহবরে তোমাদের নিক্ষেপ করা হইবে।

তিনঃ এই কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে এই পৃথিবীতে বসবাস করার জন্যে স্থান দিয়াছেন এবং প্রথম মানব- আদম ও হাওয়াকে পৃথিবীতে তাহাদের সন্তানদের জীবন যাপন করার নিয়ম-কানুন জানাইয়া দিয়াছেন। বস্তুত এই প্রথম মানব যুগলের আবির্ভাব মূর্খতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে হয় নাই। পৃথিবীতে জ্ঞান ও চেতনার আলোকোজ্জ্বল পরিবেশের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাঁহাদেরকে জীবন যাপনের আইন-বিধান বিস্তারিতরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর আল্লাহর আনুগত্য করাই- অর্থাৎ ইসলামই ছিল তাঁহাদের জীবন ব্যবস্থার মূল কথা। এই জন্যে তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর অনুগত বা 'মুসলিম' হইয়া থাকিবার কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীসমূহে ধীরে ধীরে মানুষ উক্ত খাঁটি ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা (দ্বীন) হইতে বিমুখ হইয়া বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত নীতি ও পন্থা গ্রহণ করিতে শুরু করে। তাহারা উপেক্ষা ও উদাসীনতার দরুণ আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়াছে- বিকৃতও করিয়াছে। তাহারা আকাশ ও পৃথিবীর অসংখ্য মানবীয় ও অমানবীয়, কাল্পনিক ও জড় পদার্থকে আল্লাহর অংশীদার বলিয়া ধারণা করিতে শুরু করিয়াছে। আল্লাহর দেয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাহারা নানা প্রকারের কুসংস্কার, ভুল মতবাদ ও ভ্রান্ত দর্শনের সংমিশ্রণ করিয়া অসংখ্য ধর্মমতের সৃষ্টি করিয়াছে। আল্লাহর নির্ধারিত সুবিচারমূলক ভিত্তিতে জীবন যাপনের নিয়ম-নীতি রচনা করিয়া লইয়াছে। তাহার ফলে সমগ্র পৃথিবী অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া গিয়াছে।

চারঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কর্মের যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দিয়াছেন, উহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার সৃষ্টিধর্মী হস্তক্ষেপ ও বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করিয়া পথভ্রষ্ট মানুষকে যবরদস্তির সহিত সঠিক পথে পরিচালিত করার কোনই যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না- এতদুভয়ের মধ্যে আদৌ কোন সামঞ্জস্যই থাকিতে পারে না। এই পৃথিবীতে মানুষকে এবং তাহার বিভিন্ন জাতিকে কাজ করার জন্য সৃষ্টিকর্তা কিছুটা অবকাশ দিয়াছেন। এই জন্য তাহার মধ্যে বিদ্রোহ ভাব পরিলক্ষিত হইলেই তিনি মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়ার নীতি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। মানব সৃষ্টির প্রথম হইতেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাধীনতাকে বজায় রাখিয়া কাজের জন্য প্রদত্ত অবকাশের সময় তাহাকে জীবনব্যবস্থা ও কর্মনীতি দিয়া পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্ব-আরোপিত দায়িত্ব



www.nagorikpathagar.org

যথাযথভাবে পালন করার জন্যে তিনি মানুষেরই মধ্য হইতে তাঁহার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁহারই সন্তোষকামী কিছু লোককে (নবী ও রাসূল) এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা তাঁহার প্রতিনিধি। আল্লাহ তাঁহাদের নিকট নিজের বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরকে প্রকৃত জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরকে নির্ভুল ও সঠিক জীবন-ব্যবস্থা উপহার দিয়া মানুষকে তদনুযায়ী গঠন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করিবার কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন।

পাঁচঃ এই পয়গম্বরগণ বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া তাহাদের আগমন অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিল। তাঁহাদের সংখ্যা লক্ষাধিক পৌঁছিল। বস্তুত ইহারা সকলেই একই দ্বীন (ইসলাম) লইয়াই প্রেরিত হইলেন। সে দ্বীন ছিল এমন একটি সঠিক নীতি-নিয়ম ও বিধি-বিধান, যাহা সর্বপ্রথম দিনই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সম্মুখে পেশ করিয়াছিলেন। এভাবে নৈতিক চরিত্র, সমাজ ও তামাদ্দুনের জন্যে যে শাশ্বত ও চিরন্তন বিধান প্রথম দিনই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারই প্রচার হইতে লাগিল। তাঁহাদের সকলেরই 'মিশন' ছিল এক ও অভিন্ন। বিশ্বমানবকে আল্লাহর দ্বীন ও বিধানের দিকে আহবান করাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র কাজ। অতঃপর যাহারাই তাহা গ্রহণ করিত, তাহাদেরকে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত করিয়া একটি উম্মতরূপে গড়িয়া তোলাই ছিলো তাহাদের লক্ষ্য। এই উম্মতের লোকদের আল্লাহর বিধান অনুসারে চলা যেমন দায়িত্ব, অনুরূপভাবে পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের আনুগত্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং উহার বিরুদ্ধতা প্রতিরোধ করাও তাহাদের কাজ। এই পয়গাম্বরগণ নিজেদের জীবনকালে সুষ্ঠুরূপেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। কিন্তু সব সময়ই মানুষের একটি বিরাট অংশ তাহাদের বাণী ও পয়গাম গ্রহণ করিতে আদৌ প্রস্তুত হয় নাই। আর যাহারা তাহা গ্রহণ করিয়া একটি মুসলিম উম্মতের মর্যাদা পাইয়াছিল, তাহারাও ধীরে ধীরে ভ্রষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। এমন কি, ইহাদের বেশ কয়েকটি জাতি আল্লাহর বিধানকে চূড়ান্তভাবে হারাইয়া ফেলিল। আর কতকগুলি জাতি আল্লাহর বাণীর সহিত নিজেদের মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূত কথা মিশাইয়া উহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিল।

ছয়ঃ সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলা আরব-ভূখন্ডে নবীগণের কর্তব্য ও দায়িত্ব সহকারে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে প্রেরণ করিলেন। এই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্যে ইতিপূর্বে অন্য নবীগণকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। হযরত মুহাম্মাদ (স) আসিয়া সাধারণ মানুষকেও যেমন ইসলামের দিকে আহবান জানাইলেন, তেমনি পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট উম্মতদেরকেও সঠিক পথে আনিবার জন্যে চেষ্টা করিলেন। মোটকথা সকল মানুষকে সঠিক জীবন যাপন পদ্ধতির দিকে আহবান করা, সকলের নিকট নূতনভাবে আল্লাহর বিধান উপস্থাপন করা এবং তাহা যাহারা গ্রহণ করে তাহাদেরকে একটি আদর্শবাদী উম্মতে পরিণত করাই তাহার কাজ ছিল। এই উম্মতকে তিনি এমনভাবে গঠন করিয়াছিলেন যে, একদিকে তাহারা নিজেরাই নিজেদের পরিপূর্ণ জীবনকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গঠন করিবে এবং অপর দিকে উহারই ভিত্তিতে সমগ্র দুনিয়াকে সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য সাধনা করিবে। বলা বাহুল্য, কুরআন মজীদই হইতেছে আল্লাহর সেই বিধান যাহা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল।



www.nagorikpathagar.org

**কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় ও লক্ষ্য**

কুরআন মজীদ সম্পর্কে এই গোড়ার কথা জানিয়া লওয়ার পর এই মহাগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু, উহার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং ইহার শেষ লক্ষ্য অনুধাবন করা পাঠকদের পক্ষে সহজ হইবে বলিয়া আশা করি।

কুরআনের বিষয়বস্তু হইতেছে মানুষ; এই দিক দিয়া যে, প্রকৃত ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে কিসে মানুষের কল্যাণ এবং কিসে তাহার অকল্যাণ হইতে পারে– কুরআন মজীদে তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে।

উহার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, স্থূলদৃষ্টি, অমূলক ধারণার অনুসরণ কিংবা প্রবৃত্তির দাসত্ব করার কারণে মানুষ আল্লাহ, বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থা, স্বয়ং নিজের সত্তা এবং নিজের পার্থিব জীবন সম্পর্কে যেসব মতবাদ রচনা করিয়াছে এবং সেই সব মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া যে আচরণ ও কর্মনীতি তাহারা অবলম্বন করিয়াছে, প্রকৃত ব্যাপারের দৃষ্টিতে তাহা সবই ভুল এবং পরিণতির দিক দিয়া তাহা স্বয়ং মানুষের পক্ষেই মারাত্মক। প্রকৃত সত্য তাহাই হইতে পারে, যাহা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে খলীফা নিযুক্ত করার সময় নিজেই সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন। এই সত্য তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেও বলা চলে যে, উপরে বর্ণিত নীতিই হইতেছে মানুষের জন্যে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা।

কুরআন মজীদের শেষ লক্ষ্য হইতেছে মানুষকে নির্ভুল কর্মনীতি এবং আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার দিকে আহবান করা, যাহা প্রথিবীর মানুষ নিজেদের উপেক্ষায়ই হারাইয়াছে এবং নিজেদের কুটিল হস্তে বিকৃত করিয়া ফেলিয়েছে।

এই তিনটি মৌলিক বিষয় স্মরণে রাখিয়া কুরআন মজীদ পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে যে, এই মহাগ্রন্থ কোথাও উহার মূল বিষয়বস্তুর লক্ষ্য এবং কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হইতে এক বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত বা বিভ্রান্ত হয় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উহার বিভিন্ন প্রকারের আলোচ্য বিষয় উহার কেন্দ্রীয় বিষয়ের সহিত এমনভাবে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে, যেমন একখানি কণ্ঠহারের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র বর্ণের হীরা-জহরত হারের সূত্রের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া থাকে। কুরআনে পৃথিবীর ও আকাশ রাজ্যের গঠন প্রকৃতি, মানুষের সৃষ্টি পদ্ধতি, বিশ্ব জগতের নিদর্শনসমূহের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং অতীতকালের জাতিসমূহের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্মধারার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক ব্যাপারাদি এবং বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক বিষয়েরই আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু উহার এই আলোচনার উদ্দেশ্য পদার্থ বিজ্ঞান কিংবা ইতিহাস অথবা দর্শন কিংবা অন্য কোন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া নয়, বরং প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে মানব মনের ভুল ধারণা দূর করিয়া মূল সত্যকে লোকদের মনে গভীরভাবে বদ্ধমূল করিয়া দেয়াই উহার লক্ষ্য। প্রকৃত সত্যের বিপরীত আচরণের মৌলিক ভ্রান্তি ও মারাত্মক পরিণতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা এবং প্রকৃত সত্যের অনুকূল ও কল্যাণময় পরিণতির বাহক আচরণের দিকে লোকদেরকে আহবান জানান হইয়াছে। এইজন্যই উহাতে প্রত্যেক বিষয়ের ঠিক ততখানিই উল্লেখ করা হইয়াছে, যতখানি উহার মূল লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় এবং তাহাতে অনুরূপ ভংগীই গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি বিষয়ের ঠিক প্রয়োজন অনুযায়ী উল্লেখ করিয়া এবং অপ্রাসংগিক



www.nagorikpathagar.org

বিবরণ বাদ দিয়া সব সময়ই উহার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হইয়াছে। বস্তুত ইসলামী দাওয়াতকে কেন্দ্র করিয়াই উহার সকল আলোচনা-পর্যালোচনা গভীর ঐক্য ও সামঞ্জস্যের সহিত চক্রাকারে ঘুরিতেছে।

**নাযিল হওয়ার পদ্ধতি**

কিন্তু কুরআনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি, উহার পর্যালোচনা এবং উহার অসংখ্য আলোচ্য বিষয়কে গভীরভাবে হৃদয়ংগম করার জন্য উহার নাযিল হওয়ার অবস্থা ও রীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্তই আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবখানি একই সময় সম্পূর্ণরূপে লিখিয়া হযরত মুহাম্মাদ (স.)-কে দিয়া ইহার বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে একটি বিশেষ জীবন যাপন পন্থার দিকে আহবান জানাইবার নির্দেশ দান করেন নাই। বস্তুত ইহা আদৌ সেই ধরনের কোন গ্রন্থ নহে। ইহাতে গ্রন্থ প্রণয়ন-পদ্ধতির চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু ও উহার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কেও আলোচনার অবতারণা করা হয় নাই। এই জন্যই উহাতে যেমন গ্রন্থ প্রণয়ন-পদ্ধতির ক্রমিক পর্যায় গৃহীত হয় নাই, অনুরূপভাবে সাধারণ বই-পুস্তকের ধরন-ধারণও ইহাতে পাওয়া যায় না। বস্তুত ইহার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ তায়ালা আরবের মক্কা নগরে তাহার এক প্রিয় বান্দাকে পয়গাম্বরীর গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজ শহর ও নিজ গোত্র– কুরাইশদের মধ্যেই এই আহবান কার্যের সূচনা করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই কাজ শুরু করার জন্যে প্রথমেই যে সব উপদেশের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহাই দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহা প্রধানত তিন প্রকারের বিষয়বস্তু সমন্বিত ছিল।

প্রথম, পয়গাম্বর নিজে এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে কিরূপে তৈয়ার করিতে পারেন এবং তিনি কোন্ পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ করিবেন সেই সব বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হইল।

দ্বিতীয়, প্রকৃত রহস্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য এবং নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সমাজের সাধারণ প্রচলিত ভুল ধারণাসমূহের প্রতিবাদ করা হইল। কারণ এই ভুল ধারণার জন্য তাহাদের জীবন-যাত্রা অত্যন্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইতেছিল।

তৃতীয়, সঠিক ও নির্ভুল জীবন যাপন পন্থার দিকে আহবান এবং আল্লাহর দেওয়া বিধানের মৌলিক চরিত্র নীতির বিশ্লেষণ করা হইল; কারণ উহার অনুসরণের মধ্যেই বিশ্বমানবতার চিরন্তর কল্যাণ ও সৌভাগ্য নিহিত রহিয়াছে।

**ইসলামী দাওয়াতের সূচনা**

প্রাথমিক পর্যায়ের এই পয়গামসমূহ ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হিসাবে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত 'বাণী' সমন্বিত ছিল। এইগুলির ভাষা ছিল স্বচ্ছ, ঝরঝরে, অত্যন্ত মিষ্টি-মধুর; অতিশয় প্রভাব বিস্তারকারী এবং যাহাদের লক্ষ্য করিয়া তাহা বলা হইতেছিল, তাহাদের রুচি অনুযায়ী উন্নত সাহিত্যিক ভূষণে সজ্জিত। ফলে তাহা শ্রোতাদের মনে তীরের ন্যায় বিদ্ধ হইত, উহার মধুর ভাব-সামঞ্জস্যের দরুণ লোকেরা আত্মহারা হইয়া তাহা উচ্চারণ ও আবৃত্তি করিতে শুরু করিত।



www.nagorikpathagar.org

পরন্তু, তাহাতে স্থানীয় বিশেষ ভাবধারার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। যদিও বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হইত সার্বিক সত্যের, কিন্তু উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য যুক্তি-প্রমাণ, দলীল-সাক্ষ্য এবং উদাহরণ নিকটস্থ ও পারিপার্শ্বিক সমাজ হইতেই গ্রহণ করা হইত। কারণ শ্রোতাবৃন্দ সেই সবের সহিত গভীরভাবে পরিচিত ছিল। তাহাদেরই ইতিহাস, তাহাদেরই জাতীয় ঐতিহ্য, তাহাদেরই দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণাধীন নিদর্শনসমূহ এবং তাহাদেরই মত, বিশ্বাস নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক জীবনের অসংখ্য প্রকার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কেই তাহাতে আলোচনা হইত। ফলে উহার তীব্র প্রভাব তাহাদের উপর বিস্তৃত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল।

**প্রতিক্রিয়া**

ইসলামী দাওয়াতের এই প্রথম অধ্যায় প্রায় চার-পাঁচ বৎসর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। এই সময়ের মধ্যে নবী করীম (স)-এর আদর্শ প্রচারের প্রতিক্রিয়া মোট তিনটি রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক ঃ মুষ্টিমেয় সৎ ও সত্যপন্থী লোক এই দাওয়াত গ্রহণ করিয়া মুসলিম জাতি হিসেবে সংঘবদ্ধ হইতে প্রস্তুত হইল।

দুই ঃ এক বিরাট সংখ্যক লোক মূর্খতা কিংবা স্বার্থপরতা অথবা বংশানুক্রমিক প্রচলিত নিয়ম-প্রথার অন্ধ প্রেমে মশগুল হইয়া তাঁহার বিরোধিতা করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

তিন ঃ মক্কা ও কুরাইশ বংশের পরিসীমা হইতে বাহির হইয়া এই নবতর আহ্বান-বাণীর আওয়ায অপেক্ষাকৃত বিশাল পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতঃপর এই আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। এই অধ্যায়ে ইসলামের নবোত্থিত আন্দোলনের সহিত প্রাচীন জাহিলিয়াতের এক কঠিন ও প্রাণান্তকর দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। আট-নয় বৎসরকাল পর্যন্ত উহার জের অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। কেবল মক্কাতেই নহে-কেবল কুরাইশ গোত্রেই নহে, আরবের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই প্রাচীন জাহিলিয়াতের সমর্থকগণ ইসলামী আন্দোলনকে অংকুরেই বিনষ্ট করিয়া দিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। উহাকে নিস্তেজ ও নাস্তানাবুদ করার জন্য তাহারা সর্বতোভাবে চেষ্ট করিতে শুরু করে। মিথ্যা প্রচারণা, অন্যায়-অপবাদ ও দোষারোপ, সন্দেহ-সংশয় এবং নানাবিধ প্রশ্নের সুতীক্ষ্ণ-বাণ নিক্ষেপ করিয়া প্রচন্ড আক্রমণ চালাইতে থাকে। জনগণের মনে এই আন্দোলন সম্পর্কে বিবিধ প্রকারের প্ররোচনা ও প্রতারণা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। অপরিচিত লোকেরা যাহাতে নবী করীম (স)-এর কথা শ্রবণ করিতে না পারে, তাহার ব্যাপক ব্যবস্থা করে। ইসলামে দীক্ষিত লোকদের উপর অত্যন্ত পাশবিক অত্যাচার এবং নিষ্পেষণ চালাইতে শুরু করে। তাহারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সহিত সম্পর্ক এবং সহযোগিতা ছিন্ন করে। এইভাবে তাহাদের উপর এতো অমানুষিক অত্যাচার চালান হয় যে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া দুই দুইবার নিজেদের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করিতে বাধ্য হয় এবং তৃতীয়বার তাহাদের সকলকেই মদীনায় হিজরত করিতে হয়। কিন্তু এই কঠিন বিরুদ্ধতা ও



www.nagorikpathagar.org

ক্রমবর্ধমান প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন অব্যাহতভাবে সম্প্রসারিত হইতে থাকে। মক্কার প্রত্যেকটি বংশ ও পরিবার হইতে অন্তত এক একজন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামের অধিকাংশ বিরুদ্ধবাদীদের শত্রুতা তীব্র এবং অত্যন্ত তিক্ত হওয়ার মূল কারণ এই ছিল যে, তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, পুত্র-কন্যা, ভগ্নীপতিগণ ইসলামী দাওয়াত শুধু গ্রহণই করে নাই, বরং সেই জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাহাদের 'কলিজার টুকরা' সন্তানগণই তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী হইয়া উঠিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা মজার ব্যাপার এই ছিল যে, প্রাচীন জাহিলিয়াতের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া যাহারাই এই নূতন আন্দোলনে যোগদান করিতেছিল, তাহারা তাহাদের পূর্বতন সমাজেও 'সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক' রূপে স্বীকৃত ছিলো। অতঃপর এই নবোত্থিত আন্দোলনে যোগদান করার পর তাহারা বেশী সৎ, অধিক সত্যপন্থী এবং সর্বাপেক্ষা পূত চরিত্র বিশিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। ইহার ফলে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে এই আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কারণ তৎকালীন সমাজের সর্বাধিক সৎ লোকদের এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং তাহাদেরকে আরো অধিক সৎ করিয়া তোলার খুব সহজ ও সাধারণ কথা ছিল না।

এই দীর্ঘ এবং কঠিন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কালে আল্লাহ তা'আলা সময়, সুযোগ ও প্রয়োজন মত তাঁহার নবীর প্রতি এমন সব আবেগময়ী 'ভাষণ' নাযিল করিয়াছেন, যাহাতে নদীর গতিময়তা, প্লাবনের শক্তিমত্তা এবং আগুনের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতার ন্যায় প্রভাব বর্তমান ছিল। এই সব ভাষণে একদিকে ঈমানদার লোকদেরকে তাহাদের প্রাথমিক কর্তব্যসমূহ বলিয়া দেয়া হইল; তাহাদের মধ্যে সাংগঠনিক চেতনার সৃষ্টি করা হইল, তাহাদেরকে তাকওয়া, পুত চরিত্র-মাধুর্য এবং পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতির শিক্ষা দেয়া হইল; তাহাদেরকে সত্য জীবন ব্যবস্থা– ইসলামের প্রচার পন্থা ও পদ্ধতি বুঝাইয়া দেয়া হইল। সাফল্যের প্রতিশ্রুতি এবং বেহেশতের সুসংবাদ দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা জাগাইবার চেষ্টা করা হইল। ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং উন্নত সাহসিকতার সহিত আল্লাহর পথে চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম করার জন্য তাহাদের উদ্বুদ্ধ করা হইল। তাহাদের মধ্যে সকল প্রকার বিপদ মুসিবত বরদাশত করার ও বিরুদ্ধতার বিরাট ও গগণচুম্বী তরঙ্গমালার মুকাবিলা করার উপযোগী আত্মোৎসর্গী ভাব ও আন্তরিক নিষ্ঠার সৃষ্টি করা হইল। অপর দিকে বিরুদ্ধবাদী পথভ্রষ্ট ও অবসাদগ্রস্ত সত্য-বিমুখ লোকদেরকে ইতিহাসের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের উল্লেখ করিয়া সাবধান ও সতর্ক করা হইল। তাহারা নিজেরা যেসব জাতির ইতিহাস জানিত, তাহাদেরই মর্মান্তিক পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হইল। তাহারা দিন-রাত্রি যেসব ধ্বংসাবশিষ্ট অঞ্চলের উপর দিয়া ভ্রমণ-ব্যাপদেশে যাতায়াত করিত, তাহারই নিদর্শন উল্লেখ করিয়া তাহাদেরকে উপদেশ দান করা হইল। আকাশ ও পৃথিবীতে যে সব সুস্পষ্ট নিদর্শন দিন-রাত্রি তাহাদের চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইত এবং যাহা কিছু তাহারা তাহাদের নিজেদেরই জীবনে সর্বদা দেখিত ও অনুভব করিতে পারিত, সেই সব প্রকাশ্য নিদর্শন দ্বারাই 'তাওহীদ'- আল্লাহর একত্ব এবং পরকাল সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থিত করা হইল। শিরক এবং স্বেচ্ছাচারিতা, পরকালে অবিশ্বাস এবং বাপ-দাদা হইতে প্রচলিত নিয়ম-নীতির অন্ধ অনুসরণের ভ্রান্তি প্রমাণ করা হইল মন ও মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ-সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য যুক্তি দ্বারা। অতঃপর



www.nagorikpathagar.org

তাহাদের সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়কে দূর করা হইল; প্রত্যেকটি প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেয়া হইল। যেসব জটিল সমস্যায় তাহাদের নিজেদের মন জর্জরিত ছিল কিংবা অপরের মনকে কুয়াশাচ্ছন্ন করিতে তাহারা চেষ্টা করিত, তাহার প্রত্যেকটিরই সুস্পষ্ট সমাধান পেশ করা হইল। এইরূপে জাহিলিয়াতকে সর্বদিক হইতে এমনভাবে অবরুদ্ধ করা হইল যে, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের জগতে উহার টিকিয়া থাকার জন্য এক বিন্দু পরিমাণ অবকাশও থাকিল না। সেই সঙ্গে তাহাদেরকে আল্লাহর গযব এবং কিয়ামতের ভীষণ-ভয়ংকর রূপ ও জাহান্নামের কঠিনতম আযাব সম্পর্কে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। তাহাদের খারাপ চরিত্র, ভ্রান্ত জীবনযাত্রা পদ্ধতি, জাহিলী ধরনের নিয়ম-প্রথা, সত্য বিরোধিতা ও মুসলিম নির্যাতনের জন্য তাহাদেরকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করা হইল এবং নৈতিকতা ও তামাদ্দুনের যেসব বড় বড় মূলনীতি আল্লাহর মনোনীত সত্যাশ্রয়ী ও সত্যানুসারী সভ্যতার ভিত্তি, তাহা বিস্তারিতরূপে তাহাদের সম্মুখে পেশ করা হইল।

বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের এই পর্যায়টি এককভাবে বিভিন্ন মঞ্জিলের সমন্বয় ছিল। উহার প্রত্যেকটি মঞ্জিলেই ইসলামের আহ্বান বাণী অধিকতর প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চেষ্টা-সাধনাও প্রতিরোধ-বিরুদ্ধতাও অত্যন্ত তীব্র ও কঠিন হইয়া উঠিল। উহাকে বিভিন্ন ধারণা-বিশ্বাস ও পরস্পর বিরোধী কর্মপন্থা সমন্বিত অসংখ্য দলের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী আল্লাহর তরফ হইতে প্রদত্ত বাণীসমূহেও আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র বৃদ্ধি পাইতেছিল। কুরআন মজীদের মক্কী সূরাসমূহের ইহাই হইতেছে পটভূমি।

**তৃতীয় অধ্যায়**

মক্কায় এই আন্দোলনের তেরটি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। এই সময় সহসা মদীনা নগরে এমন একটি কেন্দ্র উহার হস্তগত হইল, যেখানে আরবের সকল অঞ্চল হইতে উহার অনুসারী ও কর্মীবৃন্দকে একত্রীভূত ও নিজের সমগ্র শক্তিকে এককেন্দ্রিক করিয়া তোলা উহার পক্ষে বিশেষ সহজ হইয়া পড়িল। এই সময় নবী করীম (স) এবং অধিক সংখ্যক মুসলিম হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া যান। ফলে ইসলামী আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়।

এই পর্যায়ে অবস্থার চিত্র অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল। মুসলিম জাতি এক সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সাফল্যমন্ডিত হইল। প্রাচীন জাহিলিয়াতের ধারক ও বাহকদের সহিত প্রকাশ্য সশস্ত্র মুকাবিলা শুরু হইয়া গেল। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মত-ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের সহিতও প্রত্যক্ষ সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠিল। এই দিকে স্বয়ং মুসলিম জাতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার মুনাফিকের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল এবং তাহাদের সহিতও বুঝাপড়া করিতে হইল। দশ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন কঠিন দ্বন্দ্বের পর শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইল। সমগ্র আরব উহার অধীন হইয়া গেল এবং বিশ্ব-ব্যাপী সর্বাত্মক দাওয়াত প্রচার ও সমাজ সংশোধন প্রচেষ্টার দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই পর্যায়েও বহু সংখ্যক মঞ্জিল ছিল এবং প্রত্যেক মঞ্জিলেই এই আন্দোলনকে বিশেষ প্রয়োজনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে এমন সব 'বক্তৃতা' নবী করীম (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ হইতেছিল, যাহার ধরন কখনো অনলবর্ষী-ভাষণ, কখনো রাজকীয় ফরমান ও নির্দেশনামার ন্যায় ছিল আবার



www.nagorikpathagar.org

কখনো তাহা ছিল শিক্ষকসুলভ শিক্ষা পাঠদানের ন্যায় এবং কখনো ছিল সংশোধন প্রয়াসীর উপদেশ বুঝাইবার প্রচেষ্টার মত। তাহাতে সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র এবং সুসংবদ্ধ সভ্যতা ও সামাজিকতার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। মানব জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে সঠিকভাবে পরিচালনার মূলনীতি ও কায়দা-কানুনও তাহাতে বিবৃত হইয়াছে। মুনাফিকদের প্রতি কিরূপ নীতি প্রয়োগ করা হইবে, যিম্মী কাফিরদের প্রতি কিরূপ আচরণ অবলম্বন করা হইবে, আহলি কিতাবদের সহিত সম্পর্ক-সম্বন্ধের স্বরূপ কি হইবে, যুদ্ধমান শত্রুদের এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ জাতিসমূহের সহিত কোন্ ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করা হইবে এবং সুসংগঠিত ঈমানদার লোকদের এই দল দুনিয়ায় বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার খলীফা হওয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য নিজেদের কিভাবে গড়িয়া তুলিবে-এই সব কথাই তখনকার আয়াতসমূহে বিস্তারিতরূপে বলিয়া দেয়া হইয়াছে। এই সব বক্তৃতা দ্বারা একদিকে মুসলমানদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইত, তাহাদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত, আল্লাহ্ তা'আলার পথে ধন-প্রাণ ব্যয় করিয়া জিহাদ করিবার জন্য তাহাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হইত। জয়-পরাজয়, বিপদ-শান্তি, দুরবস্থা-সুঅবস্থা, নিরাপত্তা-ভীতি-এক কথায় সকল অবস্থায়ই তাহাদেরকে উপযুক্ত নৈতিকতার শিক্ষা দান করা হইত। নবী করীম (স)-এর পর তাহারা যাহাতে ইসলামী দাওয়াত ও সমাজ সংশোধন প্রচেষ্টায় সুদক্ষ হইয়া উঠিতে পারে এবং এই দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করিতে পারে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদেরকে প্রস্তুত করা হইতো। অপর দিকে ঈমানের সীমা-বহির্ভূত আহলি-কিতাব, মুনাফিক, কাফির ও মুশরিক-সকলকেই তাহাদের স্ব স্ব স্বতন্ত্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নম্রতার সহিত দাওয়াত প্রদানের, কঠোরতার সহিত ভর্ৎসনা করার, নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদানের, আল্লাহ্র আযাবের ভয় প্রদর্শনের এবং শিক্ষামূলক ঘটনা ও অবস্থাসমূহের উল্লেখের দ্বারা উপদেশ প্রদানের চেষ্টা হইতেছিল, যাহাতে তাহাদের নিকট সত্য উদঘাটন করার ব্যাপারে কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা থাকিয়া না যায়। মাদানী সুরাসমূহের ইহাই হইতেছে পটভূমি।

**বাচনভংগী**

এই আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, মূলত একটি দাওয়াত-একটি বিপ্লবী আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়াই কুরআন নাযিল হইতে শুরু করে। এই দাওয়াত ইহার সূচনা হইতে চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা অবধি-তেইশ বৎসরের সুদীর্ঘকালে যে যে পর্যায় এবং যে যে স্তর অতিক্রম করিয়া যে ভাবে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, উহারই বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআন মজীদের বিভিন্ন অংশ অবতীর্ণ হইয়াছে। এই ধরনের কিতাবে যে ডক্টরেট উপাধি লাভের উদ্দেশ্যে লিখিত গ্রন্থের অনুরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের নিয়মতান্ত্রিকতা ও শ্রেণী পরম্পরা রক্ষা পাইতে পারে না, তাহা সুস্পষ্ট। এতদ্ব্যতীত এই আন্দোলনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অংশ নাযিল হইয়াছে, তাহাও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হইত না; বরং তাহা বক্তৃতার ন্যায় প্রচার করা হইত। এই জন্য উহার ধরন ও রচনাভংগী লেখা নয়, বরং বক্তৃতার ধরনই উহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। পরন্তু ইহা কোন অধ্যাপকের বক্তৃতার অনুরূপও নহে। ইহা একটি বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রনেতার বক্তৃতার ন্যায় ঝংকারপূর্ণ, ইহা শ্রোতার মন-মস্তিষ্ক, বুদ্ধি-বিবেক সব কিছুকেই উদ্বুদ্ধ ও



www.nagorikpathagar.org

অনুপ্রাণিত করে। সমাজের বিভিন্ন প্রকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের সহিত নেতাকে মুকাবিলা করিতে হয়। আন্দোলন পরিচালনা, বাণী প্রচার এবং বাস্তব কর্মতৎপরতার দিক দিয়া অসংখ্য প্রকার অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে কাজ করিয়া যাইতে হয়। সম্ভাব্য সকল দিক দিয়াই লোকদের-মনে নিজের কথা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া, তাহাদের চিন্তা-বিশ্বাসের দুনিয়া আমূল পরিবর্তন করিয়া দেওয়া, ভাবাবেগ ও উচ্ছাসের প্লাবন সৃষ্টি করা, সকল বিরোধিতার শক্তি চূর্ণ করা, সংগী-সাথীদের সংশোধন ও সংস্কার এবং তাহাদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করা, শত্রুদেরকে বন্ধু এবং অসমর্থকদেরকে সমর্থকে পরিণত করা, বিরুদ্ধবাদীদের সকল যুক্তিজাল ছিন্ন করা এবং তাহাদের নৈতিক শক্তি চূর্ণ করার-এইভাবে একটি দাওয়াতের নিশানবরদার একটি বিপ্লবী আন্দোলনের নেতার পক্ষে সাধারণত যত প্রকা কাজ করা প্রয়োজন, তাঁহাকেও তাহাই করিতে হয়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই উদ্দেশ্যে তাঁহার পয়গাম্বরের প্রতি যত 'বক্তৃতাই' নাযিল করিয়াছেন, তাহার সবগুলিতেই একটি আন্দোলনের উদ্বোধনসুলভ ধরনই বর্তমান রহিয়াছে। তাহাতে কলেজের অধ্যাপকসুলভ বক্তৃতার স্টাইল সন্ধান করা সুসংগত নহে।

**একই কথার বারবার উল্লেখ**

কুরআন শরীফে একই কথার পুনরাবৃত্তির মূল কারণও পূর্বোক্ত আলোচনা হইতেই সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। একটি দাওয়াত বা বাস্তব কর্মভিত্তিক আন্দোলনের স্বাভাবিক দাবি-প্রকৃতি অনুযায়ী উহাকে উহার প্রত্যেকটি পর্যায় ও অবস্থার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই কথা বলিতে হয়। দাওয়াতের এক পর্যায়ে অবস্থান করার সময় পরবর্তী পর্যায়ের কথা বলা আদৌ সমীচীন নয়; বরং সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের কথাই বার বার আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে সময় যতটুকু লাগুক না কেন– কয়েক মাস অতীত হউক বা কয়েক বৎসর, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু একই প্রকার কথার পুনরাবৃত্তি যদি একই ধরন ও ভংগীতে হইতে থাকে, তবে তাহার একঘেয়েমীতে কান অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে, মন-মেজায স্বভাবতই বিগড়াইয়া যায়। এই জন্যই আন্দোলনের প্রত্যেক পর্যায়েই যেসব কথা বারবার বলা হইবে, তাহা প্রত্যেক বারই নূতন শব্দ, অভিনব ভংগী এবং পদ্ধতিতে বলিতে হইবে। তাহা হইলে এই কথা অধিকতর সুশ্রাব্য থাকিবে। উপরন্তু যেসব আকীদা-বিশ্বাস এবং রীতি-নীতির উপর আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হইবে, প্রথমে পদক্ষেপ হইতে শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত কোন একটি মুহূর্তেও তাহা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাইতে পারেন, বরং আন্দোলনের প্রতিটি স্তরেই উহার পুনরাবৃত্তি হওয়া একান্তই অপরিহার্য। বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের এক পর্যায়ে অবতীর্ণ কুরআনের সকল সূরায়ই সাধারণত একই প্রকারের বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি আবর্তিত হইয়াছে। আর তাওহীদ, আল্লাহ্র গুণ-বৈশিষ্ট্য, পরকাল, নবুয়্যাত ও কিতাবের প্রতি ঈমান, তাকওয়া, সবর, তাওয়াক্কুল এবং এই পর্যায়ের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের পুনরাবৃত্তিও সমগ্র কুরআন মজীদে পরিলক্ষিত হইতেছে। কারণ এই বিষয়গুলি ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আন্দোলনের এক এক পর্যায়েও এই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অসতর্কতা বা উপেক্ষার প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত মৌলিক বিষয়ে সামান্য মাত্রও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইলে ইসলামের এই আন্দোলন কখনও সঠিক দিকে গতিবান হইতে পারিত না।



www.nagorikpathagar.org

সন্নিবেশ পরম্পরা

কুরআন মজীদ যে ক্রমিক ধারায় নাযিল হইয়াছিল, উহাকে গ্রন্থাবদ্ধকরণের ব্যাপারে নবী করিম (স) অনুরূপ পরম্পরা কেন অনুসরণ করিলেন না, তাহারও মূল কারণ উপরোল্লিখিত আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

পূর্বে বলিয়াছি, আন্দোলনের সূচনা এবং উহার বিকাশের গতিধারা অনুযায়ীই কুরআন মজীদ দীর্ঘ তেইশ বৎসরকাল ধরিয়া নাযিল হইয়াছে। কাজেই আন্দোলনের ক্রমবিকাশের সহিত সামঞ্জস্যশীল ক্রমিক ধারা আন্দোলনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর বিশেষ কার্যকর হইতে পারে না। অতঃপর অন্য কোন ক্রমিক ধারা বা শ্রেণী পরম্পরা কার্যকর হইতে পারে, যাহা উহার পরবর্তী অবস্থার সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। কারণ আন্দোলনের একেবারে সূচনায় এমন লোকদের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছিল, যাহারা ছিল ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কাজেই তখন একেবারেই প্রথম সূচনা-বিন্দু (Starting point) হইতেই শিক্ষাদান করিতে ও আলোচনার সূত্রপাত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আন্দোলনের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর উহার প্রধান লক্ষ্য হইল সেই লোকসমষ্টি, যাহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার কারণে একটি উম্মত বা জাতিতে পরিণত হইয়াছিল এবং যাহাদের উপর এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল। নবী করীম (স.) শেষ পরগম্বর হিসাবে এই আন্দোলনকে একটি মতাদর্শ ও বাস্তব কর্মপন্থা উভয় দিক দিয়াই পূর্ণতা প্রদান করিয়া তাহাদের নিকট সোপর্দ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদের কর্মসূচী নিশ্চিতরূপে এই-ই হওয়া উচিত যে, প্রথমত তাহারা নিজেদের কর্তব্য-দায়িত্ব, নিজেদের জীবন ব্যবস্থা ও আইন-বিধান এবং পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতদের মধ্যে সৃষ্ট বিকৃতি-বিপর্যয় সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিবে। অতঃপর ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ পৃথিবীর সম্মুখে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান পেশ করিবে।

এতদ্ব্যতীত কুরআন মজীদ যে ধরনের গ্রন্থ-কোন ব্যক্তি উহা গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে স্বতই তাহার নিকট এই তত্ত্ব উদঘাটিত হইবে যে, কোন বিষয়ের আলোচনা এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া সজ্জিত করার নীতি ইহার সহিত বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্যশীল হইতে পারে না; বরং এই ধরনের গ্রন্থে বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস এমনই হওয়া উচিত, যাহাতে পাঠকের সম্মুখে মাদানী পর্যায় সংশ্লিষ্ট আলোচনার মধ্যে মক্কী যুগের কথা এবং মক্কী যুগের আয়াতের মধ্যে মাদানী যুগে অবতীর্ণ কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সেই সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের বক্তব্যের আলোচনা শেষ কালের আলাচনার মাঝখানে এবং প্রথম যুগের উপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি শেষ যুগের প্রদত্ত শিক্ষা দেখিতে পাওয়া আবশ্যক। কারণ ইহার ফলে একই সময় ইসলামের সমগ্র পটভূমি এবং পূর্ণাংগ চিত্র পাঠকের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং কোন সময়ই উহার কোন একটি দিকও চোখের আড়ালে পড়িয়া থাকিবে না।

পক্ষান্তরে কুরআন মজীদকে যদি উহার অবতীর্ণ হওয়ার পরম্পরা অনুযায়ী গ্রন্থাবদ্ধ করা হইত, তবে পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য উহা অর্থবহ করিবার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ণ ইতিহাস এবং উহার প্রত্যেকটি অংশের অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা ও পটভূমির পূর্ণ পরিচয় কুরআনের সংগেই লিখিয়া দেয়া আবশ্যক হইত; কিন্তু তাহা দেওয়া হইলে তাহাও অপরিহার্যরূপে কুরআন মজীদেরই অংশ বা পরিশিষ্ট হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু এইরূপ



www.nagorikpathagar.org

করা হইলে ঠিক যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বাণী-সমষ্টি প্রণয়ন ও সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য কখনই সফল হইতে পারিত না। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল, খালেসভাবে কেবলমাত্র তাঁহার বাণী অপর কাহারো কথার সংযুক্তি ও সংমিশ্রণ ব্যতীতই উহার আসল ও প্রকৃত রূপেই উহাকে চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত করা; যুবক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, শহরবাসী, গ্রামবাসী উচ্চশিক্ষিত সকলেই যেন তাহা পড়িতে পারে। সকল সময় এবং সকল অবস্থায় সকল প্রকার জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই যেন তাহা হইতে অন্তত এতটুকু জানিতে পারে যে, তাহার আল্লাহ্ তাহার নিকট কি পাইতে চাহেন আর কি চাহেন না। আর আল্লাহ্র এই সংক্ষিপ্ত বাণী-সমষ্টির সহিত একটি দীর্ঘ ইতিহাস যুক্ত হইলে এবং তাহাও পাঠ করা অপরিহার্য হইলে আল্লাহ্র এই উদ্দেশ্য হাসিল হইতে পারিত না।

বস্তুত কুরআন মজীদের বর্তমান অনুক্রম বা পরম্পরা সম্পর্কে যাহারা আপত্তি উত্থাপন করে, তাহারা এই মহান গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত বলিয়া মনে হয়; বরং তাহারা হয়ত এই কিতাবকেই ইতিহাস কিংবা সমাজ দর্শনের ছাত্রদের জন্য অবতীর্ণ একখানা পুস্তক মনে করিয়াই মারাত্মক ভুল করিয়া বসিয়াছে।

এই কথা নিঃসন্দেহে মনে রাখা দরকার যে, কুরআনের এই ক্রমিক পরম্পরা পরবর্তী যুগের লোকদের দ্বারা নির্ধারিত হয় নাই; বরং সত্য কথা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুসারেই হযরত মুহাম্মদ (স.) এই পরম্পরা নির্ধারণ করিয়াছেন। কুরআনের কোন সূরা যখনই নাযিল হইত, তখনি নবী করীম (স.) তাঁহার নিকট নিযুক্ত 'লেখকদের' [illegible] উহা লিখিয়া লইবার জন্য আদেশ করিতেন। উহা ঠিকভাবে লিখিয়া লওয়ার পর তিনি উহার স্থান নির্ধারণ করিয়া দিতেন এবং বলিতেন যে, এই সূরাটি অমুক সূরার পরে এবং অমুক সূরার পূর্বে রক্ষিত হইবে। অনুরূপভাবে কোন খন্ড সূরা-যাহাকে কোন স্বতন্ত্র সূরার মর্যাদা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না-নাযিল হইলে উহাকে অপর কোন্ সূরার কোন্ স্থানে তাহা রক্ষিত হইবে, তাহাও নবী করীম (স) নিজেই বলিয়া দিতেন। শুধু তাহাই নহে, অনুরূপ পরম্পরা অনুযায়ী তিনি নিজেই নামাযে কুরআনের বিভিন্ন সূরা পাঠ করিতেন। কুরআনের তিলাওয়াতও তিনি তদনুযায়ীই সম্পন্ন করিতেন। সাহাবাগণও অনুরূপ পরম্পরা অনুযায়ী কুরআন শরীফ মুখস্থ করিতেন। বস্তুত কুরআন মজীদের অবতরণ যেদিন একেবারে সম্পূর্ণ হইয়া গেল, সেই দিনই চূড়ান্তভাবে উহার পরম্পরা নির্ধারণ ও পূর্ণতা লাভ করিল। ফলে ইহা এক ঐতিহাসিক সত্য যে, কুরআন যিনি নাযিল করিয়াছেন, তিনি নিজেই উহার পরম্পরাও নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার হৃদয়ের উপর উহা অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার দ্বারাই তিনি ইহার প্রণয়ন কার্যও সুসম্পন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে অপর কাহারো বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না।

নামায যেহেতু শুরু হইতেই মুসলমানদের প্রতি ফরয ছিল[১] আর কুরআন পাঠ ছিল নামাযের একটি অপরিহার্য অংশ, এই জন্যই কুরআন নাযিল হওয়ার সংগে সংগেই মুসলমানগণ উহাকে কণ্ঠস্থ করার প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছিলেন। একদিকে কুরআন নাযিল হইতেছিল আর অপর দিকে মুসলমানগণ তাহা মুখস্থ করিয়া লইতেছিলেন। ফলে কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারটি কেবলমাত্র খর্জুর-পত্র, হাড় বা পাথর খন্ডের উপর-যাহার উপর



www.nagorikpathagar.org

সাধারণত কুরআন লেখা হইত-একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল না, বরং উহা নাযিল হওয়ার সংগে সংগেই একাধিক, শত শত, হাজার হাজার এবং পরে লক্ষ লক্ষ মানব মনের উপর মুদ্রিত হইয়া যাইত। অতঃপর তাহাতে একটি শব্দেরও হেরফের বা রদ-বদল করা কোন শয়তানেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

**গ্রন্থাবদ্ধ করার ইতিহাস**

নবী করীম (স.)-এর ইন্তেকালের পর আরব দেশে যখন কিছু লোক 'মুরতাদ' (ইসলামত্যাগী) হইতে শুরু করে এবং তাহা দমন করিবার জন্য সাহাবাগণকে যখন বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইয়াছিল, তখন এই সব যুদ্ধে ও সংগ্রামে সম্পূর্ণ কুরআনের অসংখ্য হাফেয শহীদ হন। ইহা লক্ষ্য করিয়অ হযরত উমর ফারুক (রা.) চিন্তা করিলেন যে, কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে মাত্র একটি পন্থার উপর নির্ভর করা উচিত হইবে না; বরং মানসপটের সংগে সংগে কাগজ-পত্রের উপরও উহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। তিনি এই প্রয়োজনের কথা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সম্মুখে পেশ করিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এই ব্যাপারে প্রথমে খানিকটা ইতস্তত করেন, কিন্তু পরে ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া হযরত উমর (রা)-এর সংগে সম্পূর্ণ একমত হন। অতঃপর হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রা)-কে-যিনি স্বয়ং নবী করীম (স.)-এর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী ছিলেন- এই মহান দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কুরআন মজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করিবার জন্য একদিকে নবী করীম (স)-এর পরিত্যক্ত লিখিত অংশসমূহ সম্মুখে রাখা হইল, অপর দিকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাহার নিকট পূর্ণ কুরআন কিংবা উহার কিছু অংশ লিখিত পাওয়া গেল, তাহাও সংগ্রহ করা হইল[২] এবং কুরআনের হাফেযদের নিকট হইতেও এই ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করা হইল।

এই তিন প্রকারের পন্থার সম্মিলিত সাহায্য ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পূর্ণ কুরআন মজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করা এবং এই ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা ও নিঃসংশয়তা লাভ করার পর কুরআন মজীদের এক একটি শব্দ সুলিখিত হইল। এই পন্থায় কুরআন মজীদের একখানি নির্ভরযোগ্য পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইলে তাহা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট আমানত স্বরূপ রাখিয়া দেয়া হইল এবং উহা হইতে কুরআন পুনরায় লেখার কিংবা উহার সহিত নিজের লিখিত কুরআনের তুলনা ও যাচাই করার জন্য সাধারণ অনুমতি দেয়া হইল। কুরআনকে গ্রন্থাবদ্ধ করার মূল ইতিহাস ইহাই।

আমাদের দেশের ভাষা বাংলা কিংবা উর্দু হওয়া[৩] সত্ত্বেও বিভিন্ন শহর ও জেলার লোকদের কথাবার্তায় যেরূপ পার্থক্য রহিয়াছে, আরবের সাধারণ ভাষা আরবী হওয়া সত্ত্বেও তথাকার বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রের কথা ও ভাষায় অনুরূপ পার্থক্য বর্তমান ছিল। কুরআন মজীদ যদিও মক্কার কুরাইশদের ব্যবহৃত ভাষায় নাযিল হইয়াছিল, কিন্তু প্রথম পর্যায়ে অপরাপর এলাকার ও গোত্রের লোকদেরকে তাহাদেরই নিজেদের উচ্চারণ ভংগী ও প্রথা অনুযায়ী তাহা পাঠ করার অনুমতি দেয়া হইয়াছিল। কারণ ইহাতে মূল অর্থে কোন প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি হইত না; কেবলমাত্র বাহ্যিক ভাষণই তাহাদের পক্ষে সহজ হইত।

কিন্তু ইসলাম সম্প্রসারিত হওয়ার সংগে সংগে আরববাসীগণ যখন মরুভূমি হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীর একবিরাট অংশ জয় করিল, অন্যান্য জাতির লোকও যখন ইসলামে



www.nagorikpathagar.org

দীক্ষিত হইল, আরব-অনারবদের ব্যাপক মিশ্রণের ফলে যখন মূল আরবী ভাষা প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল, তখন অপরাপর উচ্চারণ ভংগী ও প্রচলিত প্রথায় কুরআন পাঠের অনুমতি থাকিলে তাহাতে বিভিন্ন প্রকার বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে বলিয়া আশংকা দেখা দিল। যেমনঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অপরিচিত উচ্চারণ ভংগীতে কুরআন পাঠ করিতে দেখিলে, সে ইচ্ছা করিয়াই কুরআন মজীদ ভুল পড়িতেছে মনে করিয়া তাহার সহিত ঐ ব্যক্তি হয়ত পুরাদস্তুর যুদ্ধে লিপ্ত হইবে। কিংবা এই শাব্দিক পার্থক্য হয়ত ধীরে ধীরে মৌলিক বিকৃতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে, অথবা আরব-অনারবদের সংমিশ্রণে যাহাদের ভাষা বিকৃত হইয়া যাইবে, তাহারা নিজেদের বিকৃত ভাষার অনুরূপ কুরআনের মধ্যে বিকৃতি ঘটাইয়া উহার সৌন্দর্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। এই সব আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উসমান (রা) সাহাবীদের সহিত পরামর্শ করিয়া কেবল মাত্র হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রচেষ্টায় সুসংবদ্ধভাবে লিখিত উন্নতমানের কুরআন মজীদের অনুলিপি সমগ্র ইসলামী রাজ্যে প্রচার করার এবং অন্যান্য সকল প্রকার উচ্চারণ ভংগী ও প্রচলিত ধ্বনিতে লিখিত কুরআনের প্রচার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করিলেন।

বর্তমান সময়ে যে কুরআন মজীদ আমাদের নিকট বর্তমান রহিয়াছে তাহা অবিকল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) কর্তৃক সুসংবদ্ধ গ্রন্থেরই অনুলিপি। কারণ হযরত উসমান (রা) উহারই অনুলিপি সরকারী ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে দেশ-বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে বর্তমান সময়েও কুরআনের উক্ত নির্ভরযোগ্য অনুলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কুরআনের অবিকৃত ও সুরক্ষিত থাকা সম্পর্কে কাহারো মনে যদি একবিন্দু সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে পশ্চিম আফ্রিকার কোন পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে একখানা কুরআন লইয়া পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত জাভার কোন হাফেযের নিকট মৌখিক কুরআন শুনিয়া উহার সহিত মিলাইয়া দেখিবেন এবং হযরত উসমান (রা) হইতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন শতাব্দীতে লিখিত কুরআনের সহিত যাচাই করিয়া দেখিলেই তাহার সকল সন্দেহ অপসৃত হইয়া যাইবে এবং এই সম্পর্কে তাহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ তুলনা করিয়া দেখার ফলে কোন অক্ষর কিংবা সামান্যতম ব্যাপারেও যদি কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তবে উহাকে তো এক ঐতিহাসিক আবিষ্কার বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে এবং এই আবিষ্কারকে গোপন না রাখিয়া বিশ্ব সমাজে প্রকাশ করিয়া দেওয়াই কর্তব্য। কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম এবং তাঁহারই নিকট হইতে অবতীর্ণ, এই সম্পর্কে কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি যদি কোনরূপ সন্দেহ করিতে চায় তবে তাহার সেই স্বাধীনতা কেহ হরণ করিবে না; কিন্তু এই কথায় কোন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকিতে পারে না যে, আমাদের নিকট যে কুরআন মজীদ বর্তমান আছে, তাহা ঠিক তাহাই যাহা হযরত মুহাম্মদ (স) বিশ্বমানবের সম্মুখে পেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে এক বিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন বা কম-শৌ করা হয় নাই। বস্তুত ইহা এক ঐতিহাসিক সত্য-এই সম্পর্কে কোনই সন্দেহ করা যাইতে পারে না। মানবীয় ঈতিহাসে এতদূর দৃঢ় প্রমাণিত ও সকল প্রকার সন্দেহমুক্ত অন্য কোন গ্রন্থেরই উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কুরআনের সত্যতায় যদি কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারে, তবে ভারতের মোগল রাজত্ব এবং ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য অথবা নেপোলিয়ান নামে কোন ব্যক্তি কোন দিন বর্তমান ছিল



www.nagorikpathagar.org

বলিয়া বিশ্বাস করারও কোন অধিকার তাহার থাকিতে পারে না। বস্তুত এইসব ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা জ্ঞানের নয়-মূর্খতারই পরিচায়ক।

**অধ্যয়নের নিয়ম**

কুরআন এমন একখানি গ্রন্থ যে, পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া ইহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এই সব লোকের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাহাকেও কোনরূপ পরামর্শ দেওয়া কাহারো পক্ষেই সম্ভব নহে। কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট বিভিন্ন উদ্দেশ্যসম্পন্ন লোকদের এই বিরাট ভীড়ের মধ্যে শুধু তাহাদের প্রতি আমার কৌতুহল ও সহানুভূতি রহিয়াছে, যাহারা ইহাকে বুঝিতে ও অনুধাবন করিত আগ্রহী এবং এই গ্রন্থ মানুষের জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে কোন্ দিকে পথনির্দেশ করে, তাহা জানিতে ইচ্ছুক ও উৎসাহী। এই সব লোককে আমি এখানে কুরআন অধ্যয়নের পন্থা সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিতে এবং এই ব্যাপারে সাধারণত যেসব সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিয়া থাকে, তাহার সঠিক সমাধান পেশ করিতে চেষ্টা করিব।

কোন ব্যক্তি কুরআন বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, কিন্তু ইহাকে বুঝিতে চাহিলে তাহাকে সর্বপ্রথম একেবারে উন্মুক্ত ও অনাবিল মন-মস্তিষ্ক লইয়া বসিতে হইবে। পূর্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার ধারণা-কল্পনা ও চিন্তা-বিশ্বাস এবং অনুকূল কিংবা প্রতিকূল সকল লক্ষ্য হইতে মন ও মগযকে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এইভাবে কুরআন মজীদ বুঝা ও অনুধাবন করার একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য লইয়া তাহাকে কুরআন পাঠ শুরু করিতে হইবে। কারণ যাহারা পূর্ব হইতে বদ্ধমূল বিশেষ ধ্যান-ধারণা মনে রাখিয়া কুরআন পড়িতে শুরু করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কুরআন না পড়িয়া উহার ছত্রে ছত্রে নিজেদেরই পূর্ব ধারণার পাঠ নূতন করিয়া গ্রহণ করে মাত্র। ইহাদের মনে কুরআনের স্পর্শ পর্যন্ত লাগিতে পারে না। শুধুমাত্র কুরআনই নয়-কোন গ্রন্থ পাঠের জন্যই এই পন্থা বৈজ্ঞানিক ও নির্ভুল হইতে পারে না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যাহারা বিশেষভাবে এই পন্থায় কুরআন পাঠ করিতে চায়, উহার গভীর অন্তর্নিহিত মহা সত্য ও তথ্যের দ্বার কখনোই তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হয় না।

পরন্তু যাহারা কুরআন সম্পর্কে নেহায়েত সাদাসিধা ধরনের ধারণা অর্জন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে সম্ভবত একবার পড়িয়া লওয়াই যথেষ্ট; কিন্তু ইহার অতলস্পর্শ গভীরে অবগাহন যাহার লক্ষ্য হইবে, তাহার পক্ষে মাত্র দুই চারিবার পড়াও কোনরূপ যথেষ্ট হইতে পারে না; বরং কুরআনকে বারবার পড়াই তাহার কর্তব্য এবং প্রত্যেক বারই এক বিশেষ পদ্ধতি ও ধরনে পাঠ করা উচিত। একজন ছাত্রের ন্যায় পেন্সিল ও খাতা বই লইয়া পড়িতে বসা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি লিখিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পন্থায় যাহারা কুরআন অধ্যায়ন করিতে চাহে, তাহাদেরকে সমগ্র কুরআন মজীদ অন্তত দুইবার আদ্যোপান্ত পড়িতে হইবে। কারণ এই মহাগ্রন্থ সামগ্রিকভাবে যে পরিপূর্ণ চিন্তা ও কর্মাদর্শ মানুষের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, তাহা পূর্ণরূপে এইভাবেই তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে। এই প্রাথমিক অধ্যায়নকালে সমগ্র কুরআনের উপর তাহাকে এক সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে এবং এই কাজের যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই কিতাব যেসব মৌলিক ধারণা পেশ করে এবং তদনুযায়ী যে জীবন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চায়,



www.nagorikpathagar.org

এই প্রসংগে সেই দিকেও তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই অধ্যায়ন ব্যাপদেশে তাহার মনে কোন প্রকার প্রশ্ন বা সংশয়ের উদয় হইলে সে সম্পর্কে সেখানে কোন চূড়ান্ত ফায়সালা করিয়া লওয়া ঠিক হইবে না, বরং উহাকে টুকিয়া রাখিবে এবং বিশেষ ধৈর্য সহকারে অধ্যয়ন জারী রাখিবে। পরবর্তী অংশ অধ্যয়নের মাধ্যমে কোথাও না কোথাও তাহার উক্ত প্রশ্ন বা সংশয়ের উত্তর পাওয়া যাইবে বলিয়াই আশা করা যায়। উত্তর পাওয়া গেলে নিজের প্রশ্নের সাথে উহাও টুকিয়া লইবে। কিন্তু প্রথম অধ্যয়নের পর যদি কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না যায়, তবে ধৈর্যের সহিত তাহাকে দ্বিতীয়বার কুরআন পাঠ করিতে হইবে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলিতে পারি যে, দ্বিতীয়বারের গভীরতর অধ্যয়নের পর জওয়াব পাওয়া যায় নাই এমন প্রশ্ন কদাচিতই থাকিতে পারে।

এইভাবে সমগ্র কুরআন সম্পর্কে ব্যাপক দৃষ্টি লাভ করার পর বিস্তারিত পাঠ শুরু করিতে হইবে। এইবার পাঠককে কুরআনের শিক্ষাসমূহকে এক এক দিক দিয়া হৃদয়ংগম করিয়া উহা লিখিয়া লইতে হইবে। কুরআন বিশ্ব-মানবতার জন্য কোন্ আদর্শ মনোনীত করে আর কোন্ ধরনের মানুষ উহার দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ ও অভিশপ্ত, তাহা এইবার পাঠের মাধ্যমে তাহাকে বিশেষভাবে জানিয়া লইতে হইবে। এই বিষয়টিকে সঠিকভাবে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য নোট বহির একদিকে 'মনোনীত মানুষ'-এর বৈশিষ্ট এবং অপর দিকে 'অমনোনীত মানুষ'-এর পরিচয় পাশাপাশি লিখিতে থাকা বাঞ্ছনীয়। কিংবা পাঠক যদি জানিতে চাহে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি কোন্ সব জিনিসের উপর নির্ভর করে এবং কোন্ সব জিনিসকে কুরআন মানুষের জন্য ক্ষয়-ক্ষতি এবং ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ বলিয়া নির্ধারিত করে, তাহা হইলে একদিকে 'কল্যাণকর' ও অপরদিকে 'ক্ষতিকর' এই দুই শিরোনাম স্থাপন করিয়া উহার প্রত্যেকটির নীচে সংশ্লিষ্ট আয়াত লিখিতে থাকিলে এই ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। অনুরূপভাবে বিশ্বাস, আকীদা, নৈতিক চরিত্র, অধিকার, কর্তব্য, সামাজিক আইন, সমাজ গঠন প্রণালী, সন্ধি-যুদ্ধ ও অপরাপর জীবন সমস্যার প্রত্যেকটি সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহ এক স্থানে লিখিয়া লইয়া গবেষণা করিলেই সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সামগ্রিক রূপ এবং এই সকলকে মিলাইয়া পরিপূর্ণ জীবন চিত্র কিরূপ হইতে পারে তাহা এই পন্থায় সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়।

উপরন্তু, বিশেষ কোন জীবন সমস্যা সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিকোণ জানিতে হইলে উহার সঠিক পন্থা এই হইবে যে, এতৎসংক্রান্ত নূতন ও পুরাতন সাহিত্যের গভীরতর অধ্যয়ন করিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মৌলিক অবস্থা ও তত্ত্ব জানিয়া লইতে চেষ্টা করিবে, আজ পর্যন্ত মানুষ এই সম্পর্কে কি কি চিন্তা করিয়াছে, এই ব্যাপারে প্রকৃত মীমাংসা-সাপেক্ষ জটিলতা কি এবং মানুষের চিন্তার গতি কোন স্তর পর্যন্ত উপনীত হইয়াছে- এই সব কথা জানিয়া লইয়া কুরআন পাঠে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। আমার নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বলিতে পারি, এই পন্থায় কোন বিষয়ের মীমাংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি কেহ কুরআন পাঠ করিতে বসে, তাহা হইলে এমন সব আয়াত হইতে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইবে, যাহা ইতিপূর্বে সে বহুবার পাঠ করিয়াছে; কিন্তু এই গভীর তত্ত্ব যে এইভাবে লুকাইয়া রহিয়াছে, সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ইতিপূর্বে তাহার মনে কখনো জাগ্রত হয় নাই।



www.nagorikpathagar.org

অনুধাবনের প্রকৃত ক্ষেত্র

কিন্তু কুরআন বুঝিবার জন্য এতসব চেষ্টা-যত্নের পরও মানুষ কুরআন মজীদের সঠিক ভাবধারা ততক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হয় না, যতক্ষণ না সে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করে, যাহা করিবার জন্য কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হইয়াছে। বস্তুত কুরআন মজীদ নিছক কোন চিন্তা-কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার গ্রন্থ নয়, অতএব শুধু আরাম-কেদারায় বসিয়া পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করা যাইবে না। দুনিয়ার সাধারণ ধর্মমত অনুযায়ী ইহা নিছক কোন ধর্ম-পুস্তকও নয়। কাজেই শুধু মাদ্রাসা, খানকাহ ও টোলে বসিয়াই উহার অন্তর্নিহিত সমস্ত তত্ত্ব কথা সঠিকরূপে জানিতে পারা সম্ভব নয়। এই ভূমিকার শুরুতেই বলা হইয়াছে, মূলত ইহা একখানা দাওয়াত ও আন্দোলনের গ্রন্থ। ইহা নাযিল হইয়াই এক নির্লিপ্ত স্বভাব ও সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিকে নির্লিপ্ততার ক্রোড় হইতে বাহির করিয়া আল্লাহ্-বিরোধী পৃথিবীর মুকাবিলায় দাঁড় করিয়া দিল। তাঁহাকে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আওয়ায তুলিতে এবং সমসাময়িক কাফিরী, ফাসিকী ও পথভ্রষ্টতার অগ্রনায়কদের সহিত প্রকাশ্য মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত করিল। প্রতিটি ঘর হইতে পবিত্র আত্মা ও নির্মল চরিত্রসম্পন্ন লোকদের বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া আনিল এবং তাহাদেরকে সত্যের নিশানবরদারের পতাকাতলে সমবেত করিয়া দিল। ইহা তদানীন্তন সমাজের প্রতিটি কোণ হইতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও ফাসাদপন্থী ব্যক্তিদের উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল এবং সত্যপন্থীদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। এক ব্যক্তির আহ্বান হইতে শুরু করিয়া খিলাফতে ইলাহিয়ার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পূর্ণ তেইশটি বৎসর যাবত এই কিতাব একচ্ছত্রভাবে এই বিরাট আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে। 'হক' ও 'বাতিলে'র এই প্রাণান্তকর দ্বন্দ্বের ধারার প্রতিটি মন্যিল ও প্রতিটি পর্যায়েই এই কুরআন ভাংগন ও পুনর্গঠনের পূর্ণ চিত্র ও পদ্ধতি পেশ করিয়াছে। এমতাবস্থায় দ্বীন ও কুফর এবং ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পারস্পরিক সংগ্রাম ক্ষেত্রে একটুও ঝাঁপাইয়া না পড়িয়া এবং এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের দীর্ঘ ধারার কোন পর্যায়ই অতিক্রম না করিয়া শুধু কুরআনের শব্দ পড়িয়া ও উহার অর্থ জানিয়া লইয়াই উহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করিতে সমর্থ হইতে চাওয়া কতখানি হাস্যকর, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বস্তুত পূর্ণরূপে কুরআন অনুধাবন করা কেবল তখনি সহজ হইতে পারে, যদি আপনি উহা লইয়া উঠিয়া দাঁড়ান এবং আল্লাহর দিকে বিশ্ব-মানবকে আহ্বান জানাইয়াবার কাজ বাস্তব ক্ষেত্রে শুরু করেন। অতঃপর আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কার্যক্রম এই কুরআন অনুযায়ী সম্পাদিত হইলে ইহা অবতীর্ণ হওয়ার সময় তখনকার লোকদের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল, আপনার জীবনেও তাহাই লাভ হওয়া সম্ভব হইতে পারে। অতঃপর মক্কা, আবিসিনিয়া ও তায়েফের কঠিনতম পর্যায়গুলি এক এক করিয়া আপনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বদর ও ওহুদ হইতে শুরু করিয়া হোনায়েন এবং তাবুক পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ই সম্মুখে হাযির হইবে। আবূ জেহেল ও আবু লাহাবের মত লোকদের সহিতও আপনার মুকাবিলা হইবে। বহু মুনাফিক ও ইয়াহুদী জাতির সহিতও আপনার সাক্ষাত ঘটিবে এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের হইতে শুরু করিয়া যাহাদের মন রক্ষা করা হইয়াছে এমন সব লোক পর্যন্ত সকল প্রকারের মানুষের সহিতই সাক্ষাত ঘটিবে। বস্তুত ইহা এমন এক প্রকারের সাধনা,



www.nagorikpathagar.org

যাহাকে আমি 'কুরআনী সাধনা' নামে অভিহিত করিতে চাই। এই সাধনার বাস্তব ফল এই যে, এই পথে যতই অগ্রসর হইবেন, কুরআনের অনেক আয়াত এবং অনেক পূর্ণ সূরা সম্মুখে আসিয়া স্বতই জানাইতে থাকিবে যে, উহা এইরূপ অবস্থায় এই বাণী লইয়া নাযিল হইয়াছিল। এই পথে কুরআনের কোন কোন শব্দের অর্থ কিংবা কোন তত্ত্ব পাঠকের দৃষ্টির আড়ালে থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু কুরআন তাহার সমগ্র অন্তর্নিহিত ভাবধারা যে তাহার সম্মুখে উদঘাটিত করিয়া দিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই মূলনীতি অনুযায়ী কুরআনের আদেশ-নিষেধ, নৈতিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিধান ও মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উহার প্রদত্ত নিয়ম-নীতি ও বিধি-নিষেধ মানুষ সঠিক ও সুস্পষ্টরূপে ততক্ষণ পর্যন্ত অনুধাবন করিতে পারিবে না, যতক্ষণ না তাহা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কার্যত প্রয়োগ করা হইবে। ব্যক্তিগত জীবনের কাজ-কর্মে কুরআনের বাস্তব অনুসরণ না করিয়া যেমন কোন ব্যক্তিই এই বিশাল মহাগ্রন্থ ভালোরূপে হৃদয়ংগম করিতে পারিবে না, তদ্রূপ সেই জাতিও তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবে না, যাহার সকল সামগ্রিক বিষয়াদি কুরআন নির্ধারিত পন্থার বিপরীত পথে ও পন্থায় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বস্তুত কুরআন যে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জীবন-ব্যবস্থা হওয়ার স্পষ্ট দাবি উথাপন করিয়াছে, তাহা ছোট-বড় সকলেরই জানা আছে। কিন্তু উহা পড়িতে শুরু করিলে দেখা যায় যে, উহার অধিকাংশ বাণীই তদানীন্তন আরববাসীদের সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। যদিও মাঝে মাঝে সমগ্র বনী আদম-গোটা মানব জাতিকেও সম্বোধন না করিয়াছে এমন নহে। কিন্তু অধিকাংশ কথাই আরবের ইতিহাস, আরবের পরিবেশ এবং আরব দেশেরই নিয়ম-প্রথার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই বলা হইয়াছে। এই সব দেখিয়া প্রতিটি চিন্তাশীল পাঠকের মনে স্বতই এই প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, বিশ্বের সর্বসাধারণ মানুষের জন্য প্রদত্ত বিধানে সাময়িক, স্থানীয় এবং বিশেষ জাতীয় উপাদানের এত প্রাচুর্য ও আধিক্য কেন? এই ব্যাপারটির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া অনেকের মনেই নানা প্রকার সংশয় জাগে। তাহাদের মনে এই সন্দেহ জাগে যে, এই বিধানটি মূলতই বোধ হয় সমসাময়িক আরবদেরই সংশোধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে জোর করিয়া টানিয়া খিঁচিয়া উহাকেই সর্বকালের ও সমগ্র মানব জাতির জন্যই একমাত্র বিধান হিসাবে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিছক তর্কের খাতিরেই যাহারা এই প্রশ্ন উথাপন করে না বরং বস্তুতই ব্যাপারটি বুঝিতে এবং এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিতে চায়, কেবল তাহাদেরকেই আমি একটি পরামর্শ দিতে চাই। প্রথমত আপনারা নিজেরাই কুরআন মজীদ পাঠ করুন এবং অধ্যায়নকালে যেসব জায়গায় কোন আকীদা, ধারণা কিংবা নৈতিক বিধান অথবা কোন কাজের পন্থা ও পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হইবে, যাহা একান্তভাবে আরবদের জন্যই নির্দিষ্ট এবং যাহা সময়-কাল ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া অনুভূত হইবে, তাহা ক্রমাগতভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখুন। সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিবেন যে, বিশেষ একটি স্থান ও কালের লোকদেরই সম্বোধন করিয়া তাহাদের মুশরিকী ধারণা-বিশ্বাস ও নিয়ম-প্রথার প্রতিবাদ করা হইলে এবং তাহাদেরই পরিবেশ হইতে যুক্তি-প্রমাণের উপাদান গ্রহণ



www.nagorikpathagar.org

করিয়া তাওহীদকে সপ্রমাণিত করা হইলেই উহার দাওয়াতকে 'সাময়িক' কিংবা স্থানীয় বলিয়া অভিযুক্ত করা যুক্তিসংগত নয়। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখুন, কুরআন 'শিরকের' ন্যায় দুনিয়ার সকল কালের সকল 'শিরকের' প্রতিবাদে হুবহু সেই সব যুক্তি উপস্থাপন করিতে পারা যায় না কি? এই একই যুক্তিগুলিকে আমরা সর্বকালের সর্বদেশের মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারি না কি? উপরন্তু 'তাওহীদ' প্রমাণের জন্য কুরআনে উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণগুলিকে সামান্য রদবদল করিয়া সকল স্থানে প্রয়োগ করা যায় না কি? ইহার উত্তর যদি 'ইতিবাচক' হয়, তাহা হইলে বিশেষ কোন স্থানে বিশেষ এক জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছিল বলিয়াই এই সর্বাত্মক শিক্ষাকে 'স্থানীয়' বা 'সাময়িক' বলিয়া কিছুতেই সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়া যায় না। দুনিয়ার কোন দর্শন, কোন জীবন ব্যবস্থা এবং কোন ধর্মমতই সামগ্রিকভাবে বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) বাচন-ভংগী ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পেশ করা হয় নাই; বরং প্রতিটি বিষয়কেই কোন-না-কোন নির্দিষ্ট অবস্থা, পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিত এবং বিশেষ পরিস্থিতি সম্মুখে রাখিয়া উহার ভিত্তিতেই পেশ করা হইয়াছে। এইরূপ পরিপূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষতা মূলত সম্ভব নয় আর তাহা সম্ভব হইলেও এই পদ্ধতিতে যাহা কিছু পেশ করা হইবে, তাহা কাগজের পৃষ্ঠায়ই চিরদিন সীমাবদ্ধ থাকিবে, মানুষের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হইয়া উহা কখনই কোন কর্ম-বিধান হওয়ার মর্যাদা পাইতে পারিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ।

পরন্তু কোন চিন্তাভিত্তিক, আদর্শিক কিংবা নৈতিক ও তামাদ্দুনিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচারিত ও প্রসারিত হইলেও শুরু হইতেই উহাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে চেষ্টা করা অপরিহার্য নহে; বরং সত্য কথা এই যে, তাহা কোন দিক দিয়া কার্যকর ও কল্যাণকরও হইতে পারে না। বস্তুত এই উদ্দেশ্য লাভ করার সঠিক ও বাস্তব কর্মপন্থা শুধু একটিই হইতে পারে এবং তাহা এই যে, এই আন্দোলন যে চিন্তাধারা, মতবাদ, নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে মানব জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ইচ্ছা করে, পরিপূর্ণ শক্তি দিয়া তাহাকে প্রথম এমন একটি দেশে বাস্তবায়িত করিতে হইবে যেখান হইতে এই আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। আন্দোলনের আহ্বায়ক যাহাদের ভাষা, স্বভাব-প্রকৃতি, মেজায-মর্যী, অভ্যাস ও মনস্তত্ত্ব ভালো করিয়া বুঝিতে পারিবেন, তাহাদেরই মনে আন্দোলনের বাণী প্রথমে দৃঢ়মূল করিয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সেখানেই উক্ত আদর্শকে বাস্তবায়িত করিয়া ও উহার ভিত্তিতে একটি সফল জীবন-ব্যবস্থা পরিচালিত করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে উহার বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করা একান্তই আবশ্যক। কেননা তাহা হইলে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির দৃষ্টি উহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং তাহাদের সমঝদার ও প্রতিভাশালী লোকগণ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহা অনুধাবন করিবে এবং নিজেদের দেশেও উক্ত আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য অনুরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করিবে। অতএব কোন আদর্শ এবং চিন্তা-কর্মের নীতিকে বিশেষ কোন দেশের কোন জাতির সম্মুখে সর্বপ্রথম পেশ করা হইয়াছিল এবং তাহাদেরকেই উহা বুঝাইবার ও উহার প্রতি পুরাপুরি আস্থাশীল করিয়া তুলিবার জন্যই যদি যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তবে তাহা দ্বারা এই কথা প্রমাণ হয় না যে, উহা বিশেষ কোন জাতির জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহা একটি বিশেষ জাতীয় চিন্তা ও কর্মপ্রণালী মাত্র। বস্তুত একটি



www.nagorikpathagar.org

জাতীয় জীবন-ব্যবস্থা ও একটি আন্তর্জাতিক আদর্শের মধ্যে এবং একটি সাময়িক নীতি ও চিরন্তন আদর্শের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। জাতীয় ব্যবস্থা হয় বিশেষ কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তুলিবে কিংবা তাহাতে এমন কিছু নীতি ও মতবাদ বর্তমান থাকিবে, যাহা অন্যান্য জাতির মধ্যে আদৌ চালু ও কার্যকর হইতে পারে না। পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক আদর্শ সমস্ত মানুষকে সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার দান করিবার জন্য রচিত হয় এবং উহার নীতিসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা ও সার্বিকতা সুপ্রকট হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে একটি সাময়িক ব্যবস্থার ভিত্তি এমন কতকগুলি নীতির উপর স্থাপিত হইয়া থাকে, যাহা কালের চিরন্তন ও শাশ্বত আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। কালের কয়েকটি পরিবর্তনের পরই উহা সম্পূর্ণ অকর্মন্য ও অকার্যকর হইয়া যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু একটি চিরন্তন ও শাশ্বত ব্যবস্থার সকল নীতিই পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বাধাহীন গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়। এই সব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদি কেহ কুরআন মজীদ পাঠ করে এবং উহাতে সাময়িক ও বিশেষ জাতির নিজস্ব বিধান হওয়ার লক্ষণসমূহ নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার ব্যর্থতা সুনিশ্চিত।

কুরআনের প্রত্যেক পাঠকই কুরআন সম্পর্কে আবহমানকাল হইতে এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে যে, ইহা একখানি বিস্তারিত বিধান ও আইন গ্রন্থ; কিন্তু উহার অধ্যায়নকালে তামাদ্দুন, রাজনীতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিধান ও আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ তাহাতে সে পায় না; বরং সে প্রত্যক্ষ করে যে, উহাতে নামায ও যাকাতের প্রায় গুরুত্বপূর্ণ ফরযগুলি সম্পর্কে-যে সম্পর্কে কুরআন বার বার কঠোর তাগিদ করিয়াছে-বিস্তারিত হুকুম আহকাম দিয়া কোন কর্মনীতি পেশ করা হয় নাই। ফলে পাঠকের মনে ইহার দরুণ সংশয় জাগে, উহা কর্মবিধান হওয়ার অর্থ তাহার বোধগম্য হয় না।

এই ব্যাপারে সকল বিভ্রান্ত ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের একমাত্র কারণ এই যে, কুরআন পাঠের সময় প্রকৃত ব্যাপারের ও নিগূঢ় রহস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালেই থাকিয়া যায়। তাহার একথা খেয়াল থাকে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কেবল একখানা গ্রন্থ নাযিল করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি সেই সংগে একজন নবীও প্রেরণ করিয়াছেন। কোন প্রাসাদ নির্মাণের ব্যাপারে মূল 'স্কীম' যদি এই হয় যে, উহার শুধু 'প্লান' ও 'নকশা' তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইবে এবং লোকেরা নিজেরাই তদনুযায়ী প্রাসাদ তৈয়ার করিবে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে পূর্ণ চিত্র ও বিস্তারিত 'প্ল্যান' তৈয়ার করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশের সংগে সংগে একজন ইঞ্জিনিয়ারও যদি সরকারীভাবে প্রেরিত হয় এবং সে নির্দেশ অনুযায়ী একখানা প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দেয়, তবে ইঞ্জিনিয়ার এবং তাহার নির্মিত প্রাসাদকে উপেক্ষা করিয়া কেবল 'চিত্র' ও 'প্ল্যান'-এর মধ্যে সমগ্র খুঁটিনাটি বিষয়ের নির্দেশ সন্ধান করা এবং তাহা না পাইয়া 'প্ল্যানের' বিরুদ্ধে সম্পূর্ণতার অভিযোগ তোলা মূলতই ভুল।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন খুঁটিনাটি বিষয় সম্বলিত কোন গ্রন্থ নহে। ইহা মূলনীতি ও মৌলিক ব্যাপার সমন্বিত গ্রন্থ। উহার মূল কাজ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আদর্শিক ও নৈতিক বিধানকে শুধু পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ ও আবেগ ধর্মী আবেদন-



www.nagorikpathagar.org

উভয়ের সাহায্যে উহাকে অধিকতর দৃঢ়মূল করিয়া দেওয়াই উহার দায়িত্ব। কিন্তু ইসলামী জিন্দেগীর রূপায়ন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যবস্থা দিয়া উহা মানুষের পথ প্রদর্শন করে না, বরং উহা মানব জীবনের প্রতিটি মৌলিক বিভাগের শুধু 'চতুঃসীমা' বলিয়া দেয় এবং জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষ স্তম্ভ দাঁড় করিয়া দেয়; আল্লাহ্ তা'আলার মর্যী অনুযায়ী ঐ সব বিভাগের রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের সঠিক পন্থা কি হওয়া উচিত, তাহা ঐ স্তম্ভ সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত করিয়া দেয়। এই মূলনীতি ও মৌলিক বিধান অনুযায়ী কার্যত ইসলামী জীবন গড়িয়া তোলা হযরত নবী করীম (স)-এর দায়িত্ব ছিল। মূলত কুরআন প্রদত্ত মূলনীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার জন্যই নবী করীম (স) প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এই প্রসংগে আর একটি প্রশ্নও সাধারণভাবে লোকদের মনে জাগ্রত হয়। আল্লাহ্র কিতাব নাযিল হওয়ার পরও যাহারা দলাদলি ও মতদ্বৈততায় নিমজ্জিত হয় এবং নিজেদের 'দ্বীন'কে খন্ড-বিখন্ডিত করে, কুরআন একদিকে সেই সব লোকদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে; অপর দিকে কুরআনের বিধি-নিষেধ নির্ধারণ এবং উহার তাফসীর ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে কেবল শেষ জামানার লোকই নয়-ইমাম, তাবেয়ীন এমনকি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কুরআনের নির্দেশকসূচক এমন একটি আয়াতও সম্ভবত পাওয়া যাইবে না, যাহার ব্যাখ্যা ও তাফসীর সম্পূর্ণরূপে সর্বসম্মত। এখন প্রশ্ন এই যে, কুরআনে উল্লেখিত তীব্র সমালোচনা কি ইহাদের উপর প্রযোজ্য হইবে? আর তাহা না হইলে কুরআনের কোন্ ধরনের দলাদলি ও মতবৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে?

আসলে ইহা এক ব্যাপক ও বিস্তারিত আলোচনা-সাপেক্ষ ব্যাপার; এখানে তাহার অবকাশ নাই। তবে একজন সাধারণ পাঠকের মনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য এতটুকু বলা যথেষ্ট হইবে যে, দ্বীন-ইসলামের মূল বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ ও ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ একমত থাকিয়া আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণায় স্বভাবতই যে সুস্থ মতপার্থক্য হইয়া থাকে, কুরআন উহার বিরোধী নয়। কিন্তু যে মত-পার্থক্য শুরু হয় স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও বক্রদৃষ্টির কারণে এবং যাহার পরিণতি হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবদমান দলে বিভক্ত হওয়া এবং যাহার ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও সংঘর্ষ দেখা দেয়, কুরআন এই ধরনের মতপার্থক্য আদৌ সমর্থন করে না; বরং ইহারই কঠোর সমালোচনা করে।

বস্তুত এই দুই প্রকারে মতপার্থক্য মূল ব্যাপারের দিক দিয়া এক নয় এবং পরিণতি ও ফলাফলের দিক দিয়াও পরস্পরের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। কাজেই এই দুই ভিন্ন মতকে এক মনে করিয়া উভয়কেই 'অসংগত' ঘোষণা করার কোন যুক্তি নাই। মূলত প্রথম প্রকারের মতপার্থক্য উন্নতির সহায়ক এবং জীবনের প্রাণ-স্পন্দনস্বরূপ। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তিসম্পন্ন প্রতিটি সমাজেই এই ধরনের মতপার্থক্য বর্তমান থাকে। এইরূপ মতপার্থক্য প্রাণ-স্পন্দনের লক্ষণ বিশেষ, যে সমাজ বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় নাই-হইয়াছে পচা কাষ্ঠের ন্যায় নিস্পন্দ ভোঁতা 'মানবাকৃতি বিশিষ্ট জীবের' সমন্বয়, একমাত্র সেই সমাজই বর্ণিত মতপার্থক্য হইতে মুক্ত বা শূন্য হইতে পারে।



www.nagorikpathagar.org

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের মতপার্থক্য যে সমাজেই একবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সেই সমাজকেই উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ছাড়িয়াছে। এইরূপ মতপার্থক্য সৃষ্টি হইলে বুঝিতে হইবে যে, সমাজ-দেহ হইতে সুস্থতা বিদায় নিয়াছে এবং উহাতে কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। উহার পরিণাম কখনো কোন 'উম্মতের' পক্ষে ভালো হয় নাই-হইতেও পারে না। এই দুই প্রকারের মতদ্বৈততার পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি অনুধাবন করা বাঞ্ছনীয়ঃ

এক প্রকার মতপার্থক্যের উদ্ভব হয় এই ভাবে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে গোটা সমাজ এক মত থাকিবে এবং কুরআন ও সুন্নাকে আইন-বিধানের উৎস হিসাবে সকলেই স্বীকার করিবে; ইহার পর কোন আইনগত খুঁটিনাটি বিষয়ের বিশ্লেষণে দুইজন আলেমের মধ্যে কিংবা কোন মুকদ্দমার রায় দানের ব্যাপারে দুইজন বিচারকের মধ্যে মত-পার্থক্য সৃষ্টি হইলেও তাহাদের কেহই নিজের মতকে চূড়ান্ত ও দ্বীন-ইসলামের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া মনে করিবেন না এবং এই ব্যাপারে বিপরীত মতাবলম্বনকারীকে দ্বীন-ইসলামের বহির্ভূত বলিয়াও অভিযুক্ত করিবেন না, বরং উভয়ই নিজ নিজ মতের অনুকূলে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিয়া তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন। অতঃপর তাহারা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব হয় জনমতের উপর অথবা আইন-আদালতের ব্যাপার হইলে সর্বোচ্চ আদালতের উপর কিংবা সমষ্টিগত ব্যাপার হইলে সমাজ তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপর একান্তভাবে অর্পণ করিবেন এবং দুই প্রকারের মতের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিবেন কিংবা দইটিকেই সংগত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

দ্বিতীয় প্রকারের মতপার্থক্য দেখা দেয় দ্বীন-ইসলামের মূল ভিত্তি সম্পর্কে। কোন আলিম, সুফী, মুফতী কিংবা কোন নেতা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল দ্বীন-ইসলামের মৌলিক বিষয় বলিয়া গণ্য করেন নাই এমন ব্যাপারে বিশেষ কোন মত প্রকাশ করিলেন এবং উহাকে টানিয়া খিঁচিয়া শুধু শুধুই দ্বীন-ইসলামের মৌলিক বিষয় বানাইয়া ফেলিলেন। অতঃপর উহার সহিত মতভেদকারী প্রতিটি ব্যক্তিকেই দ্বীন-ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং নিজেদের সমর্থকদের লইয়া দল বানাইয়া উহাকেই একমাত্র ও খাঁটি 'মুসলিম উম্মত' আর অন্যান্যদের 'জাহান্নামী' বলিয়া রায় দিলেন। বলিলেন, মুসলমান হইতে হইলেই এই দলে শামিল হও কিংবা এই দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেই মুসলমান হইতে পারিবে-অন্যথায় নহে।

বস্তুত কুরআন মজীদ এই শেষোক্ত ধরনের মতপার্থক্য ও দলাদলির স্পষ্ট বিরোধিতা করে। প্রথম প্রকারের মতপার্থক্য চিরদিনই ইসলামী সমাজে বর্তমান ছিল-স্বয়ং নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায়ও এই ধরনের মতপার্থক্যের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নবী করীম (স) এই মতপার্থক্যকে শুধু জায়েযই বলেন নাই, উহার প্রশংসা করিয়াছেন। কেননা, এই ধরনের মতপার্থক্য প্রমাণ করে যে, জাতির লোকদের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা, অধ্যায়ন-অনুশীলন ও গভীরতর উপলব্ধি করার মত যোগ্যতা ও প্রতিভা বর্তমান রহিয়াছে এবং জাতির এই সব লোকদের মনে নিজেদের দ্বীন-ইসলাম ও উহার আইন-বিধান সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলও আছে। উপরন্তু এই সব যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পন্ন লোকেরা তাহাদের সামগ্রিক জীবন-সমস্যার সমাধান নিজস্ব দ্বীনের বাহিরে নহে-উহার ভিতরেই অনুসন্ধান



www.nagorikpathagar.org

করে। ইহা হইতে একথাও প্রতিপন্ন হয় যে, মূলনীতিতে একমত থাকিয়া, নিজেদের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর করিয়া এবং সমাজে বিদগ্ধ ও প্রতিভাসম্পন্ন লোকদেরকে সঠিক সীমার মধ্যে গবেষণা ও জ্ঞানান্বেষণের কাজের সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়া সমষ্টিগতভাবে গোটা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির পন্থা নির্দেশ করা যাইতে পারে।

ইহাই আমার কথা, প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র নিকট; আমি তাঁহারই উপর ভরসা করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

এই মুখবন্ধে কুরআন অধ্যায়নকালে পাঠকের মনে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যা, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সম্যক আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেননা, এই ধরনের অধিকাংশ প্রশ্নই কোন-না-কোন 'আয়াত' কিংবা 'সূরা' পাঠকালে পাঠকের মনে জাগ্রত হয়। এবং সেই সব সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরও 'তাফহীমুল কুরআনে'র যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। কাজেই সেই সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়া এখানে শুধু সমগ্র কুরআনের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক সমস্যাসমূহের আলোচনা এবং উহার সমাধান দানের চেষ্টা করা হইয়াছে। অতএব এই মুখবন্ধ পাঠ করিয়অই ইহার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা এবং সমগ্র কিতাবখানি পাঠ করার পর উত্তর-সাপেক্ষ কোন প্রশ্ন থাকিয়অ গেলে কিংবা কোন প্রশ্নের উত্তর অসম্পূর্ণ মনে হইলে সেই সম্পর্কে গ্রন্থকারকে/অনুবাদককে অবহিত করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা যাইতেছে।❑

*আমাদের কালের একটি শীর্ষস্থানীয় তাফসীর তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকা অনুবাদক মরহুম মওলানা আবদুর রহীম। মূল অনুবাদকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধের কারণে তার অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নিজেদের বানানরীতিকে এখানে গুরুত্ব দেইনি। –সম্পাদক*

১. মনে রাখা দরকার যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায কিন্তু বেশ কয়েক বৎসর পর ফরয হইয়াছিল। নামায মূলত প্রথম হইতেই ফরয হইয়াছিল। ইসলামের কোন একটি মুহূর্তও এমন যায় নাই যখন মুসলমানদের উপর সালাত ফরয ছিল না।

২. উল্লেখ্য যে, একথাটি বলা হইয়াছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের পটভূমিকায়।

৩. নির্ভরযোগ্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বহু সংখ্যক সাহাবী নবী করীম (স)-এর জীবনেই পূর্ণ কুরআন কিংবা উহার বিভিন্ন অংশ লিখিয়া নিজেদের নিকট সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই প্রসংগে হযরত উসমান, হযরত আলী, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস, সালেম মাওলা, হুযায়ফা, যায়েদ ইবনে সাবিত, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব এবং আবু যায়েদ কায়েস বিন সাকান (রা) প্রমুখ সাহাবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# কোরআন এক বিপ্লবের কর্মসূচী

মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী

www.nagorikpathagar.org

কোরআনের বিপ্লব ছিলো এমনি। সেই কোরআন সম্পূর্ণ অবিকৃত অপরিবর্তিত ভাবে আমাদের কাছে এখনো বিদ্যমান; কিন্তু আমরা কোরআন কি পাঠ করি? কোরআনের অর্থ বুঝে দেখার, সে সব বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে কি মনযোগী হয়েছি বা হচ্ছি? এটা আমাদের গভীরভাবে দেখতে হবে, এ আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেই রয়েছে কোরআন নির্দেশিত পথনির্দেশ অনুসরণের অনুপ্রেরণা।

www.nagorikpathagar.org

এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে, পবিত্র কোরআন রমযান মাসের সাতাশ তারিখে অর্থাৎ লায়লাতুল কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, সকল আসমানী কেতাব রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, রমযানের প্রথম তারিখে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি সহীফা অবতীর্ণ করেন। একইভাবে রমযান মাসেই তাওরাত, ইনজিল, যবুর ছয় দিন পর পর অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ সহীফার ছয় দিন পর পর অন্যান্য কেতাব নাযিল হয়েছে। রমযানের ছয় তারিখে হযরত মুসা (আ.) প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে। রমযানের বারো তারিখে হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি যবুর অবতীর্ণ হয়েছে। রমযানের আঠারো তারিখে হযরত ঈসায় (আ.) প্রতি ইনজিল অবতীর্ণ হয়েছে এবং রমযানের সাতাশ তারিখে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম রাযী বলেন, সকল আসমানী কেতাবের সার নির্যাস হলো কোরআন, আর কোরআনের সার নির্যাস হলো সূরা আল ফাতেহা। সূরা ফাতেহার সার নির্যাস হলো বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আর বিসমিল্লাহর সার নির্যাস হলো তার প্রথম অক্ষর 'বা'। 'বা'-এর অর্থ হলো কোনো জিনিস মিলিয়ে দেয়া, ভাঙ্গা জিনিস জোড়া দেয়া। পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে কয়টি কেতাব অবতীর্ণ করেছেন-এর সবগুলোরই উদ্দেশ্য হলো হেদায়াত বিচ্ছিন্ন মানুষকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়া।

বর্তমান বিশ্বে মানুষ শান্তির অন্বেষায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। নানা রকম অশান্তি, ফেতনা, ফাসাদ তাদের ঘিরে ধরেছে। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানরা নানা প্রকার ফেতনা ফাসাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। সাহাবায়ে কেরাম নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেসব ফেতনা থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে? নবীজী বললেন, আল্লাহর কেতাবের মাধ্যমে সেসব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর কোনো গ্রন্থ কোরআনের মতো মধুর সুরে পাঠ করা যায় না। কিন্তু এই কোরআন আসলে কি? আমরা কিভাবে তা থেকে উপকার লাভ করতে পারি? বিগত চৌদ্দশতাধিক বছরে আমরা কোরআন থেকে কিরূপ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়েছি? এসব প্রশ্ন যথাযথভাবে আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

প্রশ্ন হলো ওহীর প্রয়োজন কি? বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষ কি নিজের বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা জীবনের পথ নির্ধারণ করতে পারে? না পারে না। মানুষ সব কিছু পারে না। আপন স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা সঠিক কিছু বলতে পারে না। মানুষ আলো তৈরী করতে পারে, যে আলো দ্বারা অন্ধকার দূর করতে পারে কিন্তু তার মনের অন্ধকার দূর করার মতো আলো সৃষ্টি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মনের অন্ধকার দূরীকরণের মতো আলো একমাত্র নবীদের কাছেই থাকে। সেই আলো হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত। বিবেক বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছা জানা তো দূরে থাক মানুষ অন্য মানুষের মনের কথাও তো বলতে পারে না। এ বিশ্ব জগত আল্লাহ তায়ালা কেন সৃষ্টি করেছেন। এর পেছনে আল্লাহর কী উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটাও আল্লাহরই বলে দেয়া তথ্যের দ্বারাই মানুষ জানতে পারে। আল্লাহ তায়ালা সেসব তথ্য সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই নবীদের ওপর কেতাব অবতীর্ণ



www.nagorikpathagar.org

করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর ওপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর সমাপ্তির দ্বারা আসমানী কেতাব তথা ওহী অবতরণ সমাপ্ত করা হয়েছে।

হযরত আদম (আ.)-এর ওপর আল্লাহ তায়ালা যে সহীফা অবতীর্ণ করেছিলেন তাতে কাঠ এবং লোহার ব্যবহার সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নবীর কাছে প্রেরীত ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে তাঁর মনোনীত জীবন বিধানকে পূর্ণতা দান করেন। মানুষের ব্যবহারিক ও বস্তুজীবনের নানা প্রকার শিক্ষাও কোরআনে উল্লেখ রয়েছে।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন পৃথিবীর সকল দার্শনিক ঐক্যবদ্ধ হলেও তার কোনো একটি শব্দ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে না। আইনের কথা ধরুন। সকল প্রকার মৌলিক আইন কোরআনে বিদ্যমান রয়েছে। চরিত্র গঠনের মূলনীতির কথা ধরুন। কোরআনে তারও চমৎকার সমাবেশ রয়েছে। আল্লাহর নবী এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এই চরিত্র মাধুর্যের রূপায়ন রয়েছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য দর্শনের চরিত্র গঠন পদ্ধতিতে আমরা ভালো ভালো কথা যদিও দেখতে পাই কিন্তু তত্ত্বকথার কোনো বাস্তব দৃষ্টান্ত তারা আজও উপস্থাপন করতে পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না। কারণ তারা যা বলে, করে তার বিপরীত। কিন্তু মুসলমানদেরকে কোরআন যা শিক্ষা দিয়েছে তারা যথাযথভাবেই অনুসরণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনের জীবনে তার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা আমরা লক্ষ করতে পারি।

মজলিসী আদব-কায়দার কথা ধরুন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে ঈমানদররা, যদি অন্যদের বসার জন্যে তোমাদের মজলিসে জায়গা করে দিতে বলা হয় তবে জায়গা করে দাও আল্লাহ তায়ালা তোমদের বেহেশতে জায়গা দেবেন।' এটা শিখিয়ে দেয়ার কারণ হলো নিকৃষ্ট মনে করে কোনো মানুষের প্রতি আমরা যেন অবজ্ঞা প্রদর্শন না করি। কখনো মানুষ ও মনুষ্যত্বের শিক্ষা এতোটা দেয়া হয়েছে যে, কোনো বৈঠকে বা মজলিশে তিনজন লোক থাকলে তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুজনকে কানে কানে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে তৃতীয় ব্যক্তি ধারণা করতে পারে যে,ওরা হয়তো তার বিরুদ্ধেই কিছু বলছে। কোনো মানুষের মনে এতোটুকু কষ্টও যেন কিছুতেই না দেয়া হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে, কী অনুপম শিক্ষা! এই উন্নত ও অনুপম শিক্ষার কারণেই আরবের মেষপালক বেদুইন জাতি একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো। কোনো গ্রন্থই এ যাবত পৃথিবীতে এমন মহাবিপ্লব সাধন করতে পারেনি।

একটি জাতির জীবনে ২৩ বছর সময় কতো সামান্য। কিন্তু এই ২৩ বছরেই কোরআন এক বিরাট সভ্যতা সাংস্কৃতির অধিকারী মানব গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে। বৈরুতের এক খৃস্টান পাদ্রী লিখেছেন, কোরআন যে আসমানী কেতাব এতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ মানুষের লিখিত কোনো কেতাব এতো ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লব সাধন করতে পারে না।

কোরআনের বক্তব্যের প্রতি যারা গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ফোযায়েল ইবনে আয়ায ছিলেন ডাকাত লুটেরা। নোটিশ দিয়ে তিনি ডাকাতি করতেন। একরাতে তিনি ডাকাতির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন, সেই সময় তারই ঘরে কে একজন কোরআন তেলাওয়াত করছিলো তিনি কান সজাগ করে শুনলেন যে,



www.nagorikpathagar.org

পঠিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'ঈমানদারদের জন্যে এখনো কি সেই ক্ষণটি আসেনি যে আল্লাহর (আযাবের) স্মরণে তাদের অন্তকরণসমূহ বিগলিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন (তার সামনে তারা আনুগত্যের মাথা নোয়ায়ে দেবে!) ফোযায়েল 'হায় আল্লাহ', বলে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর জীবন ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

আসমায়ী নামক একজন ওলিয়াল্লাহ অরণ্যপথে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একদল ডাকাত এসে তাকে ঘিরে ধরলো। তিনি নির্ভীক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা এ কাজ কেন করছো? তারা বললো, রেযেকের জন্যে। আসমায়ী কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন, তার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের রেযেক আসমানে নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে রেযেক তোমরা পাবেই। ডাকাত দল তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো। তিন বছর পর ইমাম আসমায়ী কাবাঘর তওয়াফ করছিলেন, একজন লোক এসে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। ইমাম আসমায়ী বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না ভাই! লোকটি বললো, আপনি একদা বনপথে যে ডাকাত দলের কবলে পড়েছিলেন তাদের কথা সম্ভবত আপনার মনে আছে। আমি সেই ডাকাতদের একজন।

কোরআনের বিপ্লব ছিলো এমনি। সেই কোরআন সম্পূর্ণ অবিকৃত অপরিবর্তিত ভাবে আমাদের কাছে এখনো বিদ্যমান; কিন্তু আমরা কোরআন কি পাঠ করি? কোরআনের অর্থ বুঝে দেখার, সে সব বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে কি মনযোগী হয়েছি বা হচ্ছি? এটা আমাদের গভীরভাবে দেখতে হবে, এ আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেই রয়েছে কোরআন নির্দেশিত পথনির্দেশ অনুসরণের অনুপ্রেরণা।❑



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

৭

# ইকবালের কোরআন সাধনা

খালেদ বযমী

www.nagorikpathagar.org

একদিন কোরআন তেলাওয়াতের সময় তার পিতা তাকে বলেছিলেন, খোকা, কোরআন তেলাওয়াতের সময় এতোটা মনোযোগী হবে, যেন স্বয়ং তোমার ওপরেই এই কোরআন নাযিল হচ্ছে। একথার অর্থ হচ্ছে, তোমাকে বুঝতে হবে তুমি যে কোরআন তেলাওয়াত করছো এই কোরআনের পয়গাম শুধু তোমার জন্য। এরূপ যদি মনে করো তবেই তুমি পবিত্র কোরআনের ওপর যথাযথ আমল করতে সক্ষম হবে।

www.nagorikpathagar.org

আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে।

ছোটবেলায় তিনি নিয়মিত ও গভীর মনযোগ দিয়ে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। একদিন কোরআন তেলাওয়াতের সময় তার পিতা তাকে বলেছিলেন, খোকা, কোরআন তেলাওয়াতের সময় এতোটা মনোযোগী হবে, যেন স্বয়ং তোমার ওপরেই এই কোরআন নাযিল হচ্ছে। একথার অর্থ হচ্ছে, তোমাকে বুঝতে হবে তুমি যে কোরআন তেলাওয়াত করছো এই কোরআনের পয়গাম শুধু তোমার জন্য। এরূপ যদি মনে করো তবেই তুমি পবিত্র কোরআনের ওপর যথাযথ আমল করতে সক্ষম হবে।

পিতার সেই কথার প্রভাবেই সম্ভবত এমনটি সম্ভব হয়েছিল যে, যখনই তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখন অন্য কোনো কিছুরই তার খবর থাকতো না। তিনি যেন কোরআনের অতল গভীরে ডুবে যেতেন। কোরআন তেলাওয়াতের সময় আল্লামা ইকবালের দুই চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরতো। পবিত্র কোরআন মুসলিম জাতির জন্য সর্ব শক্তিমান আল্লাহর যে শেষ পয়গাম, আল্লামা ইকবাল এই বাস্তবতা উপলব্ধি করার পর তার চিন্তা চেতনা দৃষ্টিভংগি ও মননশীলতায় কোরআনের শিক্ষার রং সব কিছুর ওপর বিজয়ী হয়ে পড়ে।

ইকবালের চিন্তাধারা সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে আমরা স্পষ্টতই এটা বুঝতে পারি যে, তার আদর্শ ও চিন্তাধারার আলোর অধিকাংশই তিনি কোরআন থেকে গ্রহণ করেছেন। এ দাবীর সত্যতা ও বাস্তবতা ইকবালের সমগ্র জীবন তো বটেই তাঁর কাজ ও কথার মধ্যেও লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। ইকবালের অনেকগুলো গ্রন্থ এবং বহু সংখ্যক কবিতার শিরোনামও একথার সত্যতা প্রমাণ করে। 'বালে জিবরিল', 'যরবে কলিম' 'যবুরে আযম' প্রভৃতি নাম সেই ব্যক্তির পক্ষেই রাখা সম্ভব যিনি পবিত্র কোরআনের সাথে ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত হতে পারেন ।

ইকবালের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম ছাড়াও তার প্রবর্তিত ও ব্যবহৃত পরিভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার অধিকাংশ লেখার মধ্যে কোরআনের প্রভাব বিদ্যমান। এসব কিছু তিনি কোরআনের পরিভাষা এবং কোরআনে বর্ণিত কেসসা কাহিনী থেকে গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা ইকবালের লেখায় পবিত্র কোরআন থেকে সরাসরি নেয়া অথবা কোরআনের ভাব অনুযায়ী তৈরী করা পরিভাষাসমূহের কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। 'কুম বে এযনিল্লাহ, যরবে ইয়াদুল্লাহি, মায়ে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, বাঙ্গে লা তাখাফ, নারায়ে লা তাযির, শরিকে যামরাহ, লা তাহযানু, চেরাগে মুস্তফাবী, শরাবে বুলহবী, বাঙ্গে ইসরাফিল, লাত মানাত, চুবে কলিম, মূসা ফেরাউন, তুর, ইয়াওমুননুশুর, ছের কলিমি, খুনে ইসরাইল, ইবরাহীমী নযর, আয়াতে কায়েনাত, লওহে কলম, তলছামে ছামেরি, আতেশে নমরুদ, ইবরাহীম, ঈমান, শোয়ায়ব, শাবানি, কলিমি, বাতানে আজেরি, তকদীরে ইলাহী, আরেনি' শব্দ প্রভৃতি।

আল্লামা ইকবালের সাথে যেসব স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান লোক ঘরোয়া আলাপচারিতায় অথবা মজলিসী বৈঠকে কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি কথায় কথায় কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব



www.nagorikpathagar.org

দিতেন। পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলার সময়েও এর ব্যতিক্রম হতো না।

হাকীম মোহাম্মদ হোসেন আরশী আল্লামা ইকবালের সাথে একাধিক ঘরোয়া বৈঠকে আলাপচারিতায় যোগদানের সুযোগ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ইকবালের সাথে আলোচনা করেন। ইকবালের ইন্তেকালের পর হাকীম আরশী একটি প্রবন্ধে তার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি লিখেছেন ইকবালের সাথে ঘরোয়া বৈঠকের আলোচনায় কোরআনের আদর্শ ও শিক্ষাই বেশী প্রাধান্য পেতো। ইকবাল সেই বৈঠকে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকে কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন। শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে আল্লামা ইকবাল তাদের সন্তুষ্ট করতেন।

একদিন হাকীম মোহাম্মদ হোসেন আরশী আল্লামা ইকবালের কাছে যাচ্ছিলেন। হাকীম তালেব আলী নামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও আরশীর সাথে যেতে চাইলেন। কুশল বিনিময়ের পর আলোচনা শুরু হলো। আরশীর ভাষায় আলোচনার বিবরণ নিম্নরূপ। হাকীম তালেব আলী আল্লামা ইকবালের কাছে সূরা 'নাজম'-এর প্রথম রুকুর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। আল্লামা ইকবাল এ সম্পর্কে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বিশেষত তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান থাকলো অথবা তার চেয়ে কম এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইকবাল তাঁর নিজস্ব ঢং-এ চমৎকারভাবে দিলেন।

উল্লিখিত আয়াত কোরআনে করিমের জটিল আয়াতসমূহের মধ্যে একটি আয়াত। এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বড় বড় মোফাসসেররা পর্যন্ত হিমসিম খেয়েছেন। ইউরোপের একজন বিদ্বেষী অমুসলিম ভাষ্যকার কোরআনের উক্ত আয়াতকে নবী মোহাম্মদ (স.)-এর পরবর্তী সময়ের কোনো ব্যক্তির রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইকবালের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মূলকথা হচ্ছে এই যে, তিনি নাছুত ও লাহুত বা আকল ও ওহী বা মানব সত্তা ও আরশে এলাহীকে দুটি ধনুক নামক বৃত্তের সাথে তুলনা করেছেন। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির শেষ প্রান্ত হচ্ছে যে, মানুষ আল্লাহর ওহীর সাথে পূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ আধুনিক বুদ্ধি-বিবেকের বাদ্যযন্ত্র থেকে মাঝে মধ্যে যে সংগীত বের হয় সেটা এলহামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এমনি করে সেটি দুটি ধনুকের সংযোগস্থলে পৌঁছে যায়। মানব জাতির মধ্যে নবীরা, আবার নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী সেই স্থানের শেষ প্রান্তের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন।

বক্তৃতার পর আল্লামা ইকবাল বললেন, আমার এই ব্যাখ্যায় এই সন্দেহ পোষণ করা যাবে না যে কোরআন আল্লাহ পাকের নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর রচনা। আল্লাহর প্রেরিত ওহীর মধ্যে মানুষের চিন্তা চেতনার কোনো স্থান নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জার্মানীতে আমাদের একজন অধ্যাপক রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ছাত্ররা সেই বিষয়ে তাকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতো। তিনি সাথে সাথে জবাব দিতেন। ছাত্ররা ব্যাখ্যা চাইলে তিনি দুই সপ্তাহের সময় চাইতেন। তার জন্য প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ ছিল কিন্তু উদাহরণ দিয়ে প্রায়োগিক দিক আলোচনা ছিলো কষ্টসাধ্য। এ জন্য পড়াশোনা ও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন ছিলো। ঠিক অনুরূপভাবে বিবেক ও ওহীর সমন্বয় সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।



www.nagorikpathagar.org

হাকীম আরশী তার সেই লেখায় আল্লামা ইকবালের সাথে তার আরো কয়েকটি সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন। সেই সব সাক্ষাতে কোরআন সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। আল্লামা আরশীর লেখায় আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঘটনা থেকে ইকবালের কোরআন দর্শন সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। আরশী লিখেছেন, এক সাক্ষাতে আমি আল্লামা ইকবালকে বললাম, 'আপনার মাদ্রাজের ভাষণসমূহ খুবই কঠিন। আপনি সে সব ভাষণে ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে যেসব কথা উল্লেখ করেছেন আধুনিক কালের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ওলামায়ে কেরামরা তা বুঝতে সক্ষম নন। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের প্রথম যুগে মরুবাসী আরবেরা সেই কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু বুঝেছিলেন?'

আল্লামা ইকবাল বললেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বুনিয়াদের ওপর। একটি জাতি গঠনের জন্য ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বুনিয়াদ এবং এর অনুষংগসমূহই যথেষ্ট। নবী করিম (স.)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেখা গেছে। ইতিহাসের কোনো পাঠকই এই বাস্তব সত্য বিস্মৃত হতে পারে না।'

সেই সাক্ষাতের সময় কোরআনের অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হয়েছিল। আরশী সাহেব আল্লামা ইকবালকে আরো একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করেন। তিনি লিখেছেন, আমি বললাম, কোরআনে আল্লাহ পাক একদিকে বলছেন কোরআনকে আমি খুব সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় নাযিল করেছি। আবার অন্যত্র বলা হচ্ছে যে, এসব আয়াতের মর্ম কথা আল্লাহ পাক স্বয়ং জানেন এবং বিশেষ জ্ঞানে যারা জ্ঞানী তারা জানেন। এ রকম বিপরীতধর্মী বক্তব্যের কি কারণ?

আল্লামা ইকবাল বললেন, একবার লন্ডনে এক ভদ্রলোক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মানে নিজের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত দিলেন। আমিও সেখানে দাওয়াত পেয়েছিলাম। আহারের পর বিস্তারিত পরিচয় পর্বে জানা গেছে যে, সেই বিশিষ্ট ব্যক্তি পাথর বিশেষজ্ঞ। এ কথা শোনার পর আমি তার সাথে পুনরায় সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলাম। সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা সফরে যাবো। এরপর নির্ধারিত সময়ে আমরা সমুদ্রোপকূলে পৌঁছুলাম। আমি তাঁকে বললাম, আপনার অতীত বিষয় সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি মাটি থেকে এক টুকরো নুড়ি পাথর তুলে নিলেন এবং তার জীবন কথা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। মোট কথা আমরা ১৫ দিন সফর করলাম। এই সময়ে তিনি প্রায় কথা প্রসংগেই সেই নুড়ি পাথর নিয়ে কথা বললেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক বিস্ময়কর তথ্য পরিবেশন করলেন। এতো কিছু আমার জানা ছিল না। সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ প্রতিটি মানুষের কাছেই পাথর বিশেষজ্ঞের তথ্যসমূহ কঠিন আবরণে আচ্ছদিত পক্ষান্তরে তার কাছে সেই সব তথ্য অতি সহজ ও প্রাঞ্জল। ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআনের প্রতিটি তথ্য একদিকে কঠিন ও দুর্বোধ্য অন্যদিকে সহজ ও প্রাঞ্জল।

মানুষের জ্ঞান প্রজ্ঞা আগ্রহ চারিত্রিক বৈশিষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তি যতো উন্নতি লাভ করবে কোরআনের বক্তব্য তাদের কাছে ততোই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আল্লামা ইকবাল একই ধরনের অন্য একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এক অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয়ের সুযোগ হলো। তিনি সমুদ্র তলদেশের



www.nagorikpathagar.org

প্রাণীদের সম্পর্কে অভিজ্ঞ অধ্যাপক। এ বিষয়ে তিনি বিস্ময়কর বেশ কিছু তথ্য জানালেন। তার কাছে জানা গেলো যে, সামুদ্রিক প্রাণীদের শ্রেণী বৈচিত্র জীবনধারা খুবই চমকপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী এবং গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপকের বক্তৃতায় আমি আশ্চর্য ও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এমনি করে প্রতিটি মানুষই নিজের গবেষণা ও সাধনা লব্ধ জ্ঞানের আধার। তিনি সেই বিষয়ে পন্ডিত এবং বিশেষজ্ঞ হতে পারেন। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের জ্ঞানের অধিকারীদেরকে 'ইয়াস্‌সারনা' এবং 'ফুছছেলাত' বলা হয়েছে।

কোরআনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আল্লামা ইকবালকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিলো এবং তিনি সেই সব প্রশ্নের যা জবাব দিয়েছেন নীচে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হচ্ছে।

আল্লামা ইকবালের কাছে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থ জানতে চাওয়া হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যেসব লোক আমার জন্য জেহাদ করে আমি নিশ্চয়ই তাদের হেদায়াত দান করবো।' আল্লামা ইকবাল উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন, মানব জাতির জন্য কল্যাণ সকল প্রকার জ্ঞানার্জন ও সফলতা অর্জনের প্রচেষ্টায় উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাও আল্লাহর পথে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রচেষ্টায় অর্জিত ফলাফল হচ্ছে হেদায়াত প্রাপ্তির প্রমাণ।

একবারের বৈঠকে আল্লামা ইকবাল বলেছেন, জ্ঞানের চারটি পর্যায় রয়েছে। এই চারটি পর্যায়েই কোরআন আমাদেরকে পথ নির্দেশ দিয়েছে। মুসলমানরা উক্ত চারটি পর্যায়ের জ্ঞানকেই বিকশিত ও সুশোভিত করেছে। আধুনিক বিশ্ব এই ক্ষেত্রে সব সময় মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। প্রথম পর্যায় হচ্ছে ওহী। এই ওহীর পর্যায় শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় প্রাচীন কালের নিদর্শন এবং ইতিহাস। কোরআনের আয়াতে সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বলেন, তোমরা যমীনে সফর করো। কোরআনের এই আয়াত প্রাচীন বিদ্যার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে। মুসলিম গ্রন্থ রচয়িতারা এ বিষয়ে অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছেন। ইবনে খালদুনের মতো ইতিহাসবেত্তা জ্ঞানের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'মোকাদ্দামা ইবনে খালদুন' গ্রন্থে। তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে 'ইলমে নফস'। আল্লাহ পাক বলেন, 'ওয়া ফি আনফুসেকুম আফালা তুবছেরুন।' তোমাদের নিজেদের মধ্যে যা আছে তোমরা কি তা দেখো না? জোনায়েদ বোগদাদী এবং তার অনুসারীরা এই ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। চতুর্থ পর্যায় হচ্ছে সহীফায়ে ফেতরাত। কোরআনের বহু আয়াতে এর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ভূপৃষ্ঠকে তিনি বিছানার মতো বিছিয়েছেন। বিস্ময়করভাবে এর উৎকর্ষ সাধন করেছেন।

একবার আল্লামা ইকবাল বলেছেন, কোরআনের আগে কোনো আসমানী গ্রন্থ বা মানব রচিত কোনো কিছু মানুষকে এতোটা মর্যাদা দেয়নি। কোরআনই প্রথম জানিয়েছে যে তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর যেসব বস্তুকে উপাস্য বলে মনে করছো সেসব তো তোমাদের সেবা ও উপকারের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য সব কিছুর প্রভুত্ব ও দাসত্ব থেকে একমাত্র কোরআনই মানুষকে মুক্তি দিয়েছে। মানবাত্মার এতো উচ্চ মর্যাদা কোরআনের আগে অন্য কোনো গ্রন্থেই ঘোষিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আল্লামা ইকবালের সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে সময় কাটানোর কারণেই আমি এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে কোরআনের রহস্য জানার ও বোঝার ক্ষেত্রে তার মেধা ও প্রজ্ঞা ছিলো



www.nagorikpathagar.org

অসাধারণ। তার সংস্পর্শে যাওয়ার ফলেই বোঝা সম্ভব হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন। ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ-আলোচনা ছাড়াও আল্লামা ইকবাল তার বন্ধু-বান্ধবকেও অনেক চিঠি লিখতেন। সেসব চিঠি থেকেও বোঝা যায় যে কোরআন সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের মেধা ও দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়।

জার্মানীর বিখ্যাত কবি গেটের একটি কাব্যগ্রন্থের জবাবে আল্লামা ইকবাল তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'পায়গামে মাশরেক' রচনা করেন। আল্লামা ইকবাল উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, প্রাচ্য বিশেষত ইসলামী প্রাচ্য বহু শতাব্দী যাবত ঘুমিয়ে থাকার পর জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের জাতিসমূহকে একথা বুঝতে হবে যে, মানসজগতের গভীরে বিস্ময় সৃষ্টি করার আগে জীবনের বহিরাবরণে বিপ্লব সৃষ্টি সম্ভব নয়। মানুষের বিবেকের গভীরে জাগরণ সৃষ্টি ছাড়া বাহ্যিক অস্তিত্বে জাগরণ সৃষ্টি করা অসম্ভব।

প্রকৃতির এই অটল অবিচল নিয়ম কানুনকে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, 'আল্লাহ পাক কোনো জাতির ভাগ্য ততোদিন পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতোদিন সেই জাতি নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন না করে।' কোরআনের এই ঘোষণা মানুষের বহির্জগত এবং মানসজগত উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি আমার লেখা ফার্সী গ্রন্থসমূহে একথা বিশেষভাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি।

'খতমে নবুওত ও কাদিয়ানী সমস্যা' আল্লামা ইকবালের একটি ছোট পুস্তিকা। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কিছু ভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। এই ছোট গ্রন্থটি কাদিয়ানী সমস্যার ওপর এক চরম আঘাতের শামিল। এই গ্রন্থের কিছু অংশ নীচে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

'ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে ইসলাম সামাজিক সংস্কারকে বংশধারার আভিজাত্য বিলোপের মাপকাঠি রূপে গণ্য করেছে। এক্ষেত্রে সংঘাতের সম্ভাবনা যথাসম্ভব হ্রাস করার পথ অবলম্বন করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে সক্ষম হও। কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী তাকওয়া সম্পন্ন।'

সহজ সরল জীবন বিধান ইসলাম। সময়ের গতিধারার সাথে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ এই বিধান। বিবেকবুদ্ধির সাথে এই বিধানের সামঞ্জস্য রয়েছে পুরোপুরি। কোরআনের অনেক আয়াত থেকে এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমি ভেবেছিলাম ইকবাল ও কোরআনের সম্পর্কে লেখা এই প্রবন্ধে ইকবালের গদ্য রচনার ওপরই শুধু আলোচনা করবো। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তার কিছু কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে কোরআনের সাথে ইকবালের সম্পর্কে গভীরতার প্রমাণ পেশ করা সমীচীন এবং প্রাসংগিক হবে।

ইকবালের কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্যে রয়েছে। জীবনের বিভিন্ন বৈষয়িক দিকের আলোচনা ছাড়াও তার কাব্যে তাওহীদ রেসালত, কেতাব, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ইত্যাদি বিষয়ে কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শের রূপরেখা লক্ষ্য করা যায়।

কোরআনে হাকীমের বুনিয়াদী শিক্ষাকে কেউ যদি দুটি শব্দে প্রকাশ করতে চায় তবে সেটাও সম্ভব হতে পারে। দ্বিধাহীনভাবে একথা বলা যায় যে, কোরআন মানব জাতিকে যে



www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা দিয়েছে এবং দিচ্ছে সেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', এই দুটি শব্দের মধ্যেই সব কিছু নিহিত রয়েছে। এই শব্দগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ হচ্ছে, 'লা ইলাহা'। এই অংশে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এ কথা স্বীকার করে নেয়া বা মেনে নেয়া যে, পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যার সামনে মানুষ মাথা নত করতে পারে অথবা এমন কোনো শক্তি নেই যাকে মনিব মেনে নিয়ে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার মুখাপেক্ষী হতে পারে। এটা হচ্ছে নেতিবাচক দিক। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, প্রথমে মনের ওপর বিদ্যমান সব কিছুর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। এরপর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে 'ইল্লাল্লাহ'। যদি কোনো সত্তা মানুষের লক্ষ্যস্থল হওয়ার উপযুক্ত থাকে তবে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ।

আল্লামা ইকবাল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা'-এর রহস্য ও গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোকপাত করেছেন। তার এসব কথা ইসলামের তাওহীদী আদর্শের ওপর পথনির্দেশ প্রদান ও আলোকপাত করে। আল্লামা ইকবাল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তাওহীদের মাধ্যমেই মনযিলে মকসুদে পৌঁছুতে পারে। দ্বীন, হেকমত, আইন শক্তি ও স্থিতিশীলতা সব কিছু মানুষ তাওহীদের মাধ্যমেই লাভ করতে পারে। আল্লামা ইকবাল মুসলিম মিল্লাতকে দেহ স্বরূপ এবং তাওহীদকে সেই দেহের আত্মা মনে করতেন। ইকবালের মতে বংশ বর্ণের পার্থক্য ও ভেদাভেদ একমাত্র তাওহীদই মুছে দিতে পারে। তবে তিনি মনে করতেন যে, মুখে মুখে তাওহীদের কথা বলার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই বরং তাওহীদের ওপর মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

আল্লামা ইকবাল বলেন, তুমি আরব কি অনারব সে কথা বড় বিষয় নয় বরং তোমার মন তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসী কিনা সেটাই হচ্ছে আসল কথা। তোমার মনের ভেতর যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর' প্রতি বিশ্বাসের অনুরণন থাকে তবে তোমার সমগ্র জীবন পরিশীলিত ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুটি শব্দ হলেও এর শক্তি খাপ খোলা তলোয়ারের মতো। 'লা ইলাহা' ব্যতীত অন্য সকল উপাস্য ধ্বংসের পথে ডাকে। পক্ষান্তরে একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত কোনো মিথ্যা উপাস্যের অস্তিত্ব যদি মানুষের মনে না থাকে তখনই এখানে 'ইল্লাল্লাহুর' আলীশান অট্টালিকা নির্মিত হয়।

বর্তমান যুগ অস্থিরতা ও অশান্তির যুগ। এর কারণ হচ্ছে জীবনের চলার পথে 'লা ইলাহার' সংস্কৃতি অনুশীলন করা হচ্ছে না। ধ্বংসাত্মক এই প্রবণতাকে জীবনের মৌলিক সাধনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছে 'লা ইলাহার' অর্থাৎ 'কোনো মাবুদ নেই'-এর ওপর।

ইসলামের বুনিয়াদ কালেমা তাইয়্যেবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' শব্দগুলো আল্লাহ পাকের তাওহীদের প্রকাশ ঘটায়। ইকবালের অধিকাংশ কবিতায় 'লা ইলাহা' এবং 'ইল্লাল্লাহু' শব্দগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নানাভাবে করা হয়েছে। মানুষ যদি তওহীদের মূলমন্ত্র জেনে যায় এবং তাওহীদবাদী হয়ে যায়-তাহলে আল্লাহর ভয় ছাড়া পৃথিবীতে তার অন্য কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু তাওহীদের মূলমন্ত্র বোঝার জন্য নিজের মাথার ভেতরের মূর্তিঘরকে ভেংগে চুরমার করে দিতে হবে। আল্লামা ইকবাল বলেন, তাওহীদের মূলমন্ত্র তো বুঝতে পারা যায় কিন্তু তোমার মাথার ভেতর যদি মূর্তিঘর থাকে তবে আর কী হবে?



www.nagorikpathagar.org

তাওহীদের মতোই আল্লামা ইকবাল রেসালাত সম্পর্কেও ব্যাপক আলোচনা করেছেন। সেসব কিছুও কোরআন অধ্যয়ন এবং কোরআন সম্পর্কিত চিন্তা গবেষণার ফসল। ইকবাল সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, মুসলমানরা এ কারণেই এক জাতি হতে পেরেছে কেননা তারা মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মত।

মোহাম্মদ (স.)-ই মুসলমানদের এক জাতিত্বের পরিচয়ে পরিচিত করেছেন। ইকবাল মনে করেন যে, তওহীদ বিশ্বাস দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রেসালাত বা নবুওতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন সবচেয়ে বেশী জরুরি। আল্লামা ইকবালের এই চিন্তাধারা যুক্তি সঙ্গত। কেননা রেসালাত ছাড়া তাওহীদে পৌঁছা কষ্টসাধ্যই শুধু নয় বরং অসম্ভব। তাওহীদের মতোই রেসালাতের ওপর আল্লামা ইকবালের অটল অবিচল ঈমান ও বিশ্বাসের মূল উৎস হচ্ছে কোরআন।

হযরত মোহাম্মদ (স.)-শেষ নবী ছিলেন কোরআনে একথা উল্লেখ রয়েছে। নবী (স.) নিজেই বলেছেন যে, আমার পরে কোনো নবী নেই। কোরআনের ঘোষণা এবং হাদীসের ঘোষণার প্রতি আল্লামা ইকবালের বিশ্বাস ছিল ইস্পাত কঠিন। নবুওতের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লামা ইকবালের কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। কোনো ভন্ড নবীর প্রতি তার কণামাত্র পক্ষপাতিত্ব কখনো লক্ষ্য করা যায়নি।

কোরআনে করিমকে আল্লামা একবাল শুধুমাত্র একটি গ্রন্থ মনে করতেন না। ইকবাল নিজে নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং অন্যদেরকে কোরআন তেলাওয়াতের তাকিদ দিতেন। তিনি বলতেন, কোরআনের মাধুর্য ও লালিত্য শিক্ষা ও সৌন্দর্য কোনোদিন শেষ হবার মতো নয়।

আল্লামা ইকবালের কাব্য সাধনা পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। ইকবালের কবিতায় কিছু উপমা কিছু ভাব ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে যারা প্রমাণ করতে চান যে, আল্লামা ইকবাল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তারা জ্ঞান পাপী। তারা কি জানেন না যে ইকবাল বলেছেন, মুসলমান পরিচয় দিয়ে তুমি যে কোরআনের মাধ্যমে লাভ করেছো, হে মানুষ! তোমাকে সেই কোরআন নিয়েই বাঁচতে হবে। স্মরণ করা প্রয়োজন যে, কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিলুপ্তির স্বাক্ষর বিদ্যমান রয়েছে।❑



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

৮

# কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

www.nagorikpathagar.org

প্রিয় মা আমার, আজ তোমার সেই কচি ও নিষ্পাপ শিশু, তোমারই কলিজার টুকরা শিশু, তোমারই শিক্ষা ও অনুশীলনের এই ফলশ্রুতিটুকু তোমারই খেদমতে পেশ করছে। বর্ণনার সৌন্দর্য বিন্যাসে যদিও তাতে ত্রুটি আছে কিন্তু ব্যাখ্যাগত সৌন্দর্যের নেয়ামত থেকে তা কোনো অবস্থায়ই বঞ্চিত নয়।

www.nagorikpathagar.org

একান্ত শৈশব থেকেই আমি আমার মায়ের কাছে কোরআন পড়তে শুরু করি। কোরআনের বিষয়সমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের কিছুই তখন আমি বুঝতাম না। আমার জ্ঞানের পরিধিই বা তখন কতোটুকু ছিলো যে, কোরআনের মহান ও জটিল বিষয়গুলো আমার বুঝে আসবে! কিন্তু মর্মোদ্ধার করতে না পারলেও কেন যেন শৈশবেই আমি এর একটা প্রভাব নিজের মনে অনুভব করতাম। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় এর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কিছু কিছু কাল্পনিক দৃশ্য আমার সহজ সরল মনে অংকিত হয়ে যেতো, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিতান্ত মামুলী ব্যাপার বলে মনে হলেও এগুলো আমার অন্তরে কোরআনের প্রতি তীব্র আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতো। আমি অনেকক্ষণ ধরে এসব কাল্পনিক চিত্রে আনন্দ ও উৎসাহের সাথে ডুবে থাকতাম।

নিচের আয়াতটি সম্পর্কিত এ ধরনের একটি সহজ ও সরল দৃশ্য আমার অন্তরে সেদিন অংকিত হয়েছিলো। আয়াতটি পড়ার সময় প্রায়ই আমার মনে একটি কল্পনার দৃশ্য ভেসে উঠতো। 'মানুষের ভেতর এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করে একান্ত প্রান্তসীমায় বসে। যখন সে কোনো কল্যাণ ও ভালো কিছু দেখতে পায় তখন সে এবাদাতে সন্তুষ্ট থাকে, আবার যখন সে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন সে এবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমন ধরনের মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।' (সূরা আল হজ্ব ১১০)

এ আয়াত পড়ার পর আমার মনে এর যে কাল্পনিক চিত্র অংকিত হয়েছে তা আজ যদি আমি কারো কাছে বলি তাহলে সম্ভবত তা তার মনে হাসির উদ্রেক করবে।

সে দৃশ্যটি ছিলো এমন যে, আমি এক গ্রামে বাস করি। এই গ্রামের পাশেই একটি মাঠ, সে মাঠের একপাশে একটি উঁচু টিলা। আমি কল্পনার রাজ্যে দেখতাম আর এই টিলাটিকে মনে করতাম, এই বুঝি একজন মানুষ, যিনি ঝুলে থাকা একটি ঘরের একেবারে কিনারায় অবস্থান করছেন অথবা জায়গার সংকীর্ণতার কারণে টিলার ওপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন, কিন্তু তিনি নিজের অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। একেবারে প্রান্ত সীমায় থাকার কারণে প্রতিটি নড়াচড়ার সময় তিনি কাঁপছেন, মনে হয় এই বুঝি পড়ে যাবেন। আমি যেনো তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছি। তার প্রতিটি নড়াচড়া একান্ত আগ্রহ ভরে অবলোকন করছি। তার দিকে তাকিয়ে তার অবস্থার একটি কাল্পনিক চিত্র এমনি করে নিজের মনে এঁকে যাই। যখনই কোরআনের এ আয়াতটি পড়তাম তখন আমার মনে এই কল্পনার চিত্রটি অংকিত হয়ে যেতো।

'হে নবী, তাদের সবাইকে তুমি সেই হতভাগ্য ব্যক্তির কাহিনী পড়ে শোনাও, যে ব্যক্তিকে আমি আমার কোরআনের আয়াত ও এর নিদর্শনসমূহ দান করেছি, সে এগুলো থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর এক সময় তাকে শয়তান পেয়ে বসলো এবং সে শয়তানের আনুগত্য করে গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়লো। অথচ আমি যদি চাইতাম তাহলে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে তাকে উঁচু মর্যাদাও দান করতে পারতাম। কিন্তু তার অবস্থা ছিলো ভিন্নতর। সে মাটি আঁকড়েই থাকলো এবং নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্য করলো। তার উদাহরণ হচ্ছে একটি কুকুরের মতো, তার ওপর তুমি কোনো বোঝা উঠিয়ে



www.nagorikpathagar.org

দিলে সে নিজের জিহ্বা বের করে দেয়, আবার তাকে ছেড়ে দিলেও সে একইভাবে জিভ বের করে রাখে।' (সূরা আল আরা'ফ ১৭৬)

আমি এ আয়াতের বিষয়াবলী ও উদ্দেশ্যের কিছুই তখন বুঝতাম না। কিন্তু এ আয়াত পড়ার সময় আমার মনে একটি চিত্র অংকিত হতো এবং তা ছিলো এমন এক ব্যক্তির যার মুখ খোলা, জিহ্বা ঝুলছে, আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে আছি। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, কেন সে এমন করে। আমি তার কাছে যাবার সাহস করতাম না।

এছাড়াও অন্যান্য আয়াত পড়ার সময় আমার ক্ষুদ্র মনে এ ধরনের কিছু কাল্পনিক দৃশ্যের অবতারণা হতো। আর এই কাল্পনিক চিত্রগুলোর ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে আমার খুব ভালো লাগতো। এ কারণেই আমার মন কোরআন তেলাওয়াতের জন্যে ব্যস্ত থাকতো। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পড়ার সময় কোরআনেরই আভ্যন্তরীণ ময়দানে আমি আমার কল্পনার দৃশ্যসমূহ খুঁজে বেড়াতাম। বয়সের সাথে সাথে আস্তে আস্তে এ কাল্পনিক ও স্বপ্নময় সুন্দর চিন্তা-ভাবনা অংকনের দিনগুলো সব অতিবাহিত হয়ে গেলো।

এরপর এলো এমন এক সময় যখন আমি জ্ঞানার্জনের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলাম এবং তাফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে কোরআন বুঝার চেষ্টা করলাম। শিক্ষকদের মুখে কোরআনের তাফসীর শুনলাম। কিন্তু কেন যেন এই পড়ায় এবং শোনায় আমি আমার ছেলেবেলার সে আনন্দটুকু আর খুঁজে পেলাম না। আফসোস! কোরআনে সৌন্দর্যের সেসব চিহ্নসমূহ যেন সব একে একে মিটে গেলো। আনন্দ ও উৎসাহ থেকে কোরআন যেনো খালি হয়ে গেলো; কিন্তু কেন! আমার কী হলো! একি তাহলে দুই ধরনের কোরআন? একি আমার সেই শৈশবের সহজ সাবলীল মিষ্টিমধুর আনন্দ যোগানোর কোরআন কিংবা এই যৌবনের কোরআন যা জটিল, প্যাঁচানো এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেকটা খাপছাড়া!

ভাবলাম, সম্ভবত তাফসীরের ধরন ও স্টাইলের অনুকরণের ফলেই আমার মনে এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এবার আমি তাফসীরের সাহায্য বদলে স্বয়ং কোরআনকে কোরআন দিয়েই বুঝার চেষ্টা করলাম। কিছুদিন পরই আমি আমার সেই প্রিয় ও প্রাণস্পর্শী কোরআনের সন্ধান আবার পেয়ে গেলাম। কোরআনের সাথে উৎসাহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করার সেই আনন্দদায়ক দৃশ্যসমূহের সন্ধান পেয়ে আমি গেলাম। তবে আগের এসব দৃশ্যকে এখন আর সরল সহজ মনে হয় না। কারণ এখন আমার বোধশক্তিতে পরিবর্তন এসেছে, এখন আমি এসব আয়াতের মর্মোদ্ধার করতে পারছি এবং আমি এও বুঝতে পারছি, এগুলো হচ্ছে মূলত মানুষের জীবনের কিছু বাস্তব ঘটনার উদাহরণ, যাকে এভাবে পেশ করা হয়েছে, এর সব কয়টির প্রভাব ও আকর্ষণই এখানে স্থায়ী ও অনড়। আল হামদুলিল্লাহ! আমি আবার কোরআনকে পেয়ে গেলাম।

এবার আমি ভাবলাম এখানে এই নতুন পাওয়া জ্ঞানের নমুনা হিসেবে কয়েকটা আলোচনা লোকদের সামনে পেশ করি। অতপর ১৯৩৯ সালে 'আল মোকতাতাফ' ম্যাগাজিনে আমি 'আত তাসওয়ীরুল ফান্নি ফিল কোরআন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখলাম। এতে আমি কোরআন থেকে কয়েকটি সঠিক ঘটনা সম্বলিত চিত্র আঁকতে চেষ্টা করলাম, তার শিল্পগত সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা পেশ করলাম। পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরাতের এমন বর্ণনাও পেশ করলাম যা শব্দের আবরণে দারুন বিচিত্র দৃশ্য



www.nagorikpathagar.org

অংকন করে রেখেছে। প্রকৃত পক্ষে কোনো আলোকচিত্র শিল্পীর পক্ষেও এর সঠিক অংকন সম্ভব নয়। আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, এই প্রবন্ধগুলো তো একটি গোটা পুস্তকের আলোচ্যসূচী হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

আরো কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো। কোরআনের সে সব দৃশ্য আমার মনে আস্তে আস্তে তৈরী হতে থাকলো। আমি এর সর্বত্র শিল্পের অলৌকিকত্বের সন্ধান পেতে থাকলাম। আর এসব কিছু যখন আমি গভীরভাবে দেখতাম তখন আমার মনে এই ধারণা পাকাপোক্ত হয়ে যেতো যে, আমি নিজেই এ কাজটার দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং এ কাজটাকে সুসম্পন্ন করি, যতদূর সম্ভব এর পরিধিকে বিস্তৃত করে দেই। প্রায়ই আমি তখন কোরআন অধ্যয়নে নিমজ্জিত থাকতাম এবং ক্রমেই এর থেকে অমূল্য দৃশ্যসমূহ বের করতে চাইতাম। যতোই দিন এগুতে থাকে ততোই আমার অন্তরে এই বিষয়ের ওপর কিছু একটা করার এরাদা পরিপক্ব হতে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে সময় সময় এমন কিছু বাধা বিপত্তি এসে সামনে দাঁড়াতো যে এই পরিকল্পনা আমার কাছে অন্তরের একটা আক্ষেপ ও মানসিক উৎসাহ হয়েই থেকে যেতো। অতপর পুরো পাঁচটি বছর কেটে গেলো। পুনরায় 'আল মোকতাতাফ' ম্যাগাজিনে এ সিরিজের প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশ করার আমার সুযোগ হলো। আমি যখন এ আলোচনা শুরু করলাম তখন আমার প্রথম কাজ ছিলো কোরআন থেকে এর শৈল্পিক চিত্রসমূহকে একত্র করা এবং তা পাঠকদের কাছে পেশ করা। তাছাড়া এ মহাগ্রন্থের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্টসমূহের বর্ণনা পেশ করা বিশেষ করে এর সর্বত্র যে নিপুণ শিল্পকলার সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তাকে তুলে ধরা। আলোচ্য নিবন্ধে কোরআনের অন্যান্য আলোচনা ও উদ্দেশ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো না বরং আমি যা চেয়েছি তা ছিলো এর খাঁটি শিল্পগত দিকগুলো তুলে ধরা।

কিন্তু এবার আমি কী দেখলাম! আমি যেনো এক নতুন সত্যের সন্ধান পেলাম যা আমার সামনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আমি দেখলাম কোরআনে উপস্থাপিত উদাহরণসমূহ তার অন্যান্য বর্ণনা ও অংশ থেকে আলাদা কিছু নয়। এর আলাদা কোনো অবস্থানও নেই বরং কোরআনের বর্ণনাভংগিটাই হচ্ছে এর সাহিত্যিক দৃশ্য ও চিত্রের নিপুণ অংকন। এ হচ্ছে এমন এক রচনাশৈলী যাকে শরীয়াতের হুকুম আহকাম বর্ণনা করার বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যার জন্যেও ব্যবহার করা হয়েছে। আমার সামনে কোরআনের কতিপয় সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও তার নিদর্শনসমূহ একত্রিত ও সংকলিত করার বিষয়টাই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ালো না, বরং কোরআন ব্যাখ্যার মূলনীতির নতুন পথ উদ্ভাবন করাও আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ ছিলো এক অসীম নেয়ামত যা তিনি আমাকে দান করলেন। অতএব এক নতুন পদ্ধতিতে এই বইয়ের বিষয়সমূহের বিন্যাস শুরু হলো। এই বইতে যা কিছু আছে তা উপরোল্লিখিত দৃষ্টিভংগিরই বহিঃপ্রকাশ এবং কোরআন ব্যাখ্যার পদ্ধতির বৈশিষ্ট খোলাখুলি আলোচনা করাই হচ্ছে এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই তুলনামূলক পর্যালোচনা আমি যখন শেষ করলাম তখন আমি অনুভব করলাম, কোরআন এক নতুন রূপে আমার মনে অবতীর্ণ হলো। আমি এমনভাবে কোরআনকে পেলাম যেমন করে ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। কোরআন আমার অন্তরে এক নতুন



www.nagorikpathagar.org

সৌন্দর্যের আকার ধারণ করে নিলো–অবশ্য আগেও তা আমার অন্তরে এমনি সৌন্দর্যমন্ডিতই ছিলো, তবে তা ছিলো বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। আজ তা আমার সামনে একটি সাজানো ও গোছানো পুস্তক আকারে উপস্থিত, যা একটি বিশেষ মযবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এমন একটি বুনিয়াদ যাতে এক আশ্চর্যজনক ও অভূতপূর্ব মিল রয়েছে, যা ইতিপূর্বে আমি কখনো অনুধাবন করতে পারিনি, যার স্বপ্নও আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। সম্ভবত অন্য কোনো কল্পনা দিয়ে তা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। কোরআনের এসব দৃশ্য ও চিত্রসমূহের উপস্থাপন করতে গিয়ে আমার মানসিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-অনুভূতির যথাযথ দাবী আদায় করার ব্যাপারে যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাওফিক দান করেন তাহলে এটাই হবে এই পুস্তকের পূর্ণাংগ সাফল্যের মাপকাঠি।

আমার প্রিয় মা, আমার আজো মনে আছে। তখন রমযানের মাস, আমাদের ঘরে ক্বারী সাহেবরা সুন্দর সুললিত কণ্ঠে কোরআনের তেলাওয়াত করতেন। তখন গভীর ভালোবাসার সাথে তুমি পর্দার পেছন থেকে কোরআনের তেলাওয়াত শুনতে। আমি তোমার পাশে বসে যখন দুষ্টুমি করে চীৎকার দিতাম যেমনটি করে এ বয়সের অন্যান্য ছেলে মেয়েরা–তখন তুমি ইশারা ইংগিতে আমাকে চুপ থাকতে বলতে। এ সত্তেও তোমার সাথে কোরআন শোনার মাহফিলে আমি শরিক হতাম। আমি যদিও কোরআনের মর্ম অনুধাবনে তখন ছিলাম নিতান্ত অজ্ঞ, কিন্তু আমার অন্তর ছিলো কোরআনের ভাষা ও এর অলৌকিক বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ। এরপর যখন তোমার হাতে আমি বড় হতে থাকলাম তখন তুমি আমাকে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলে। তোমার বাসনা ছিলো আমার বক্ষকে যেন আল্লাহ তায়ালা কোরআনের জন্যে খুলে দেন এবং আমি যেন কোরআন শরীফ মুখস্থ করতে পারি। আমি যেন সুন্দর সুললিত কণ্ঠে তোমার সামনে বসে সারাক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি। অতপর একদিন আমি কোরআন শরীফ মুখস্থ করে নিলাম। এভাবে তোমার আকাঙ্খার একটা অংশ পূর্ণ হয়ে গেলো।

প্রিয় মা আমার, আজ তোমার সেই কচি ও নিষ্পাপ শিশু, তোমারই কলিজার টুকরা শিশু, তোমারই শিক্ষা ও অনুশীলনের এই ফলশ্রুতিটুকু তোমারই খেদমতে পেশ করছে। বর্ণনার সৌন্দর্য বিন্যাসে যদিও তাতে ত্রুটি আছে কিন্তু ব্যাখ্যাগত সৌন্দর্যের নেয়ামত থেকে তা কোনো অবস্থায়ই বঞ্চিত নয়।❑



www.nagorikpathagar.org

৯

# কোরআনের দাওয়াত পদ্ধতি

আবু সলিম মোহাম্মদ আবদুল হাই

www.nagorikpathagar.org

আপনি যদি চান যে কোরআন আপনার দু'চোখ অশ্রু-সজল করে তুলুক এবং আপনার শক্তিকে স্পন্দিত করুক তাহলে প্রথমে কোরআনের পেশকৃত দাওয়াত আত্মস্থ করুন। তারপর সেই দাওয়াতকে কার্যকরভাবে দুনিয়ার সামনে পেশ করার জন্যে তৈরী হোন। আপনি যদি সত্যিকারভাবে ইসলামী দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হন তবে আপনি অনুভব করবেন যে পদে পদে আপনার পথনির্দেশ প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

কোরআনে করীম একটি দাওয়াতের গ্রন্থ। একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের সাথে এটি অবতীর্ণ হয়েছে। দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত ইসলামী দাওয়াত যে সব পর্যায় অতিক্রম করেছে সেসব পর্যায়ে এ গ্রন্থ যথাযথ পথনির্দেশ দিয়েছে। সকল সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী এ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়েছে, প্রয়োজনের তাকিদ অনুযায়ী বিভিন্ন ভঙ্গিতে একই বক্তব্য বারবার উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কোনো জরুরী দিককে অধিক গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্ত করার বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে।

এই মহান গ্রন্থটিকে যদি আপনি অন্যান্য গ্রন্থের মতো পাঠ করেন তবে এ গ্রন্থ থেকে পুরোপুরি ফায়দা তথা কল্যাণ লাভ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। বিশেষ কোনো প্রেক্ষিতে ও প্রেক্ষাপটে যে কথা বলা হয়, সে কথা যদি পৃথক প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটে উচ্চারিত হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই তার আবেদন থাকবে না এবং শ্রোতা তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে না।

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে এক কি দু পংক্তি কবিতা অথবা সামান্য কিছু কথা শ্রোতাদের আশ্চর্য রকম উদ্দীপিত করে তুলতে পারে। অথচ সেই একই কবিতা ও কথা ভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে উচ্চারিত হলে শ্রোতাদের মনে কোনো দাগ কাটে না. তাদের আলোড়িত উদ্দীপিত করে না।

কোরআন একটি দাওয়াতের গ্রন্থ। আপনি যদি চান যে কোরআন আপনার দু'চোখ অশ্রু-সজল করে তুলুক এবং আপনার শক্তিকে স্পন্দিত করুক তাহলে প্রথমে কোরআনের পেশকৃত দাওয়াত আত্মস্থ করুন। তারপর সেই দাওয়াতকে কার্যকরভাবে দুনিয়ার সামনে পেশ করার জন্যে তৈরী হোন। আপনি যদি সত্যিকারভাবে ইসলামী দাওয়াত নিয়ে অগ্রসর হন তবে আপনি অনুভব করবেন যে, পদে পদে আপনার পথনির্দেশ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যদি আল্লাহর বাণী আপনাকে পথনির্দেশ দেয় তবে আপনার আবেগ ও প্রেরণার জগতে রীতিমতো সাড়া পড়ে যাবে। এমনকি কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে আপনার দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠবে। আপনি সেসময় নিজের ভেতর এমন এক অপার্থিব শক্তি অনুভব করবেন যে দুনিয়ার যাবতীয় শক্তিই তখন আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হবে।

পিপাসিত নয়– পানির প্রয়োজন নেই এমন ব্যক্তি পানির প্রশংসা পানির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক ভালোভালো কথা বলতে পারবে। পানি কোন্ কোন্ গ্যাস দিয়ে তৈরী হয় সেসবও সে জানিয়ে দিতে পারবে। পানির বৈশিষ্ট্য, টগবগ করে ফোটার জন্যে কতোটা উত্তাপের প্রয়োজন, কি অবস্থায় পানি জমে বরফ হয়ে যায় এসব কিছুও সে বলতে পারবে। আপনি তার কথা শুনে ভাববেন লোকটি নিঃসন্দেহে পানি বিশারদ ও পানি বিশেষজ্ঞ। পানি সম্পর্কে তার জ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু সত্যিকার ভাবে পানির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে যদি অবহিত হতে চান তবে সেই পিপাসিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, যে বালু কণায় ধূসর মরুভূমিতে কয়েকদিন যাবত পানির সন্ধান করে ফিরেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে পান করার জন্যে কোনোমতে এক পেয়ালা পানি পেয়েছেন।

একথাটি ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্যে ভেবে দেখুন যে, পবিত্র কোরআন নাযিলের প্রথম দিকে আল্লাহ তায়ালা মহানবী মোহাম্মদ (স.)-কে এমন কিছু পথনির্দেশ দিয়েছেন যেসব নির্দেশে কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

নিসন্দেহে গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে নবী (স.)-এর যোগ্যতা আগে থেকেই ছিলো। তিনি ছিলেন দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি আল্লাহর বিশেষ সাহায্য তিনি লাভ করেছিলেন। কাজেই তাঁর নিজের জন্যে হেদায়াতের প্রয়োজন ততোটা ছিলো না যতোটা ছিলো পরবর্তীকালে আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে যারা কাজ করবে। কাজেই স্পষ্ট বোঝা যায়, উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে এগিয়ে যাবে, কিছু কিছু পথনির্দেশ তারা এমনিতেই অনুভব করবে। এ ধরনের লোকের সামনে যখন কোরআনের আয়াত তুলে ধরা হবে তখন তারা প্রত্যাশিত ও ইপ্সিত জিনিসই পেয়ে যাবে। সুরা মোযযাম্মেলে নামায এবং তাহাজ্জুদের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে নবী করীম (স.)-কে যেখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, 'ইন্না লাকা ফিন্ নাহারে সাবহান তওয়ীলা'। অর্থাৎ নিসন্দেহে দিনের বেলায় তোমাকে বড় দীর্ঘ কাজ করতে হয়। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াতের কাজ।

এই দীর্ঘ কাজের জন্যে শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তির জন্যে কোরআন একটি পথ নির্দেশক। যে ব্যক্তি দীর্ঘ কোনো কাজ করে না অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দেবে না তার জন্যে কোরআনের পথনির্দেশের কী প্রয়োজন? প্রেসক্রিপশন এবং ওষুধ তো রোগীদেরই প্রয়োজন।

নবী (স.) মক্কায় অবস্থানকালে কোরআনে বিশেষভাবে দাওয়াত প্রচার করা হয়েছে। মক্কার কোরায়শরা মুসলমানদের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছিলো। আল্লাহর নাম নেয়া ছিলো অপরাধ, আপন লোকেরা পর হয়ে গিয়েছিলো, বন্ধুরা শত্রুর মতো ব্যবহার করছিলো, অসভ্য ইতর লোকেরা ভদ্র ও ভালো লোকদের ওপর অকথ্য অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছিলো।

ঈমানদাররা যা কিছু বলছিলেন করছিলেন তার মধ্যে বৈষয়িক কোনো স্বার্থ ছিলো না। তারা নিজেরা সরল পথে চলতে চেয়েছেন এবং অন্যদের সে পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন। কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তিও তারা করেননি। চিন্তা ভাবনা করার আহবান জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তারপরও প্রতিপক্ষের জেদ ও হঠকারিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তারা সব কথা শুনেও না শোনার ভান করতো। কোনো কথা গুরুত্বসহকারে শুনতো না। চিন্তা-ভাবনার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলো না। বর্তমানে কি এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়? যদি এখনো কেউ সঠিকভাবে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়িত করতে চায় তবে পরিণামে তাদেরকেও উপরোক্ত পরিস্থিতির সমুখীন হতে হবে। বন্ধু শত্রু হয়ে পড়বে, স্বজন পর হয়ে যাবে। এধরনের পরিস্থিতির লোকদের জন্যে সঠিক পথনির্দেশ কি একান্তই প্রয়োজনীয় নয়?

আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। এ কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি অনুগ্রহ করে পথনির্দেশও প্রদান করেছেন। কিন্তু আল্লাহর এই অনুগ্রহের গুরুত্ব তখনি উপলব্ধি করা যাবে যখন অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে কেউ কর্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়বে।

উপরোক্ত প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট সামনে রেখে আপনি কোরআনের সকল বিষয়বস্তুর ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন এবং নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, জীবন্ত কোনো আন্দোলন



www.nagorikpathagar.org

ও দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ না করে কোরআনের বৈশিষ্ট কতোটা আয়ত্ব করা সম্ভব?

সেই ব্যক্তির জন্যেই ধৈর্য ধারণের শিক্ষা ও তাকিদ প্রযোজ্য যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষের দ্বারা অত্যাচারিত এবং কঠিন সঙ্কটে নিমজ্জিত। দুনিয়ার প্রতি মোহাবিষ্ট ব্যক্তিকেই দুনিয়ার মোহ ও ভালোবাসার জাল থেকে বেরিয়ে আসার উপদেশ দেয়া যেতে পারে। তাওহীদ ও আখেরাতের ব্যাপারে নানা প্রকার যুক্তি এমন ব্যক্তিকেই আলোড়িত করতে পারে, যিনি তাওহীদ ও আখেরাতের প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং তাওহীদ ও আখেরাতে অবিশ্বাসীদেরকে এব্যাপারে কিছু বোঝাতে চান।

শেরেকের বিরুদ্ধে কোরআনের উপস্থাপিত বক্তব্য সেই ব্যক্তির জন্যেই শিক্ষাপ্রদ হতে পারে, যে ব্যক্তি শেরেক ও তাওহীদের পার্থক্য বোঝে এবং অন্যকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে।

ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ও রকমারী সন্দেহের জবাব সেই ব্যক্তির জন্যেই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে, যে ব্যক্তি এ ধরনের অবান্তর অভিযোগ ও সন্দেহ নিরসন করার ইচ্ছা পোষণ করে।

পুণ্যবান ব্যক্তির উপাখ্যান আলোচনা সে ব্যাক্তির জন্যেই কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে যে ব্যক্তি ইসলামকে একটি গতিশীল জীবন বিধান হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং অন্যকে সৎ ও পুণ্যবান করে গড়ে তুলতে চায়।

ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের মুলনীতি সেই ব্যক্তির জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বয়ে আনতে পারে, যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্যে চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও বিধি-বিধান বোঝার জন্যে সেই ব্যক্তিই চেষ্টা করবে যে ব্যক্তি ইসলামী সমাজ গঠন করে ইসলামী সমাজকে দুনিয়ার সামনে একটি জীবন্ত আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতে আগ্রহী।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী পথনির্দেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সেই ব্যক্তির জন্যেই প্রয়োজন যে ব্যক্তি নিজের জীবনের জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাকে ইসলামী নীতি ও আদর্শের ওপর অবিচল থাকতে হবে। এছাড়া দুনিয়ার সকল নীতি ও আদর্শের ওপর ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে।

মোনাফেকদের প্রসঙ্গ আলোচনায় সেই ব্যক্তির জন্যেই উপদেশ বিদ্যমান রয়েছে, যে ব্যক্তি সদা সঙ্কিত থাকে তার মধ্যে মোনাফেকদের মতো চিহ্ন ফুটে ওঠে কিনা অথবা কথা ও কাজে অনুরূপ চিহ্ন প্রকাশ পায় কিনা। উপরন্তু উম্মতে মোহাম্মদী থেকে মোনাফেকী অভ্যাস দূর করার জন্যে যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সচেষ্ট।

যুদ্ধ সম্পর্কিত পথনির্দেশ, যুদ্ধের চরিত্র এবং যুদ্ধের বিধি-নিষেধ ও রীতি-নীতির আলোচনা এমন ব্যক্তির জন্যেই কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ শুরু করেছে যার পরিণামে যুদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। পক্ষান্তরে যারা জেনে শুনে নিষ্কণ্টক পথে পা রেখেছে এবং প্রয়োজনে ইপ্সিত লক্ষ্য থেকে ফিরে আশার মতো মনোভাব পোষণ করে তাদের জন্যে যুদ্ধ সম্পর্কিত বর্ণনা রসালো গল্পের চেয়ে মোটেই বেশী গুরুত্ব বহণ করে না।



www.nagorikpathagar.org

মোট কথা, গভীরভাবে কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর প্রতি পৃষ্টা, প্রতিটি আয়াতের পটভূমি একটি সুসংগঠিত আন্দোলন, একটি স্বতন্ত্র দাওয়াতের কর্মসূচীর বাস্তব দৃষ্টান্ত দাবী করে। এছাড়া সকল কিছুকেই প্রায় নিষ্প্রাণ মনে হয়। বর্তমান কালের মুসলিম জাতি এর সবচেয়ে বড় ও বাস্তব উদাহরণ।

মুসলমানদের মনে এখনো এ বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে যে, তাদের বিপর্যয়কর অবস্থার প্রতিষেধক এখনো পবিত্র কোরআনে নিহিত রয়েছে। কিন্তু এ প্রতিশেধক তাদের জন্যেই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হতে পারে, যারা কোরআনের উপস্থাপিত আদর্শ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে জীবনপণ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আজকের মুসলমানদের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আল্লাহ প্রদত্ত এ হেদায়াতকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে দুনিয়ার সামনে তা তুলে ধরা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা না করুন, যদি তারা এ দায়িত্ব পালন না করে তবুও আল্লাহর দেয়া এই জীবন ব্যবস্থা একদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই। আপনি আমি সরে গেলে আল্লাহ তায়ালা অন্য কোনো দলের উত্থান ঘটাবেন যারা অকর্মন্য প্রমাণিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাঁর মনোনীত দ্বীন বাস্তবায়নের সৌভাগ্য দান করুন। এটাই ইহলৌকিক জীবনের সবচেয়ে বড় উপার্জন।❑



www.nagorikpathagar.org

১০

# কোরআনের শিক্ষা গ্রহণে সমস্যা

নঈম সিদ্দিকী

www.nagorikpathagar.org

কোরআনের শিক্ষাসমূহ যারা গ্রহণ করবে তাদের জন্যেই কোরআন 'মুসলিম' পরিভাষা ব্যবহার করেছে। মুসলিম তাকেই বলা হয় যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সর্বাত্মকভাবে আত্মসমর্পণ করে। মুসলিম হওয়ার পর একজন মানুষ নিজে যেমন শান্তি পায় তেমনি অন্যকেও শান্তির পথনির্দেশ দিতে পারে। কোরআনের সৃষ্ট 'মুসলিম' ব্যক্তি কখনোই শুধু মাত্র বস্তুর উপাসনায়-আত্মনিয়োগ করতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

বর্তমান কালে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণে কি ধরনের বাধা ও অন্তরায় রয়েছে, এটা আমাদের জানা দরকার। কোরআন আমাদের প্রিয় ও পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থ শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের দান করেছেন। কোরআন সমগ্র বিশ্ব মানবের কল্যাণের একটি সমন্বিত পয়গাম। কথা ও কাজের মাধ্যমে সকল মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌঁছানোর জন্যে আমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহে কোরআনের সাথে আমাদের বিশ্বাসের বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোরআনের অসাধারণ বরকত থেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে আমরা অনেকটা বঞ্চিত। কোরআনের পয়গাম অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে আমাদের আলস্যের শেষ নেই, বরং অনেক সময় এক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছি। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে কোরআন ও আমাদের মধ্যে একটি পর্দা অন্তরায় হয়ে রয়েছে। সে পর্দার কারণে হেদায়াতের এ আলোকশিখা থেকে আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারছি না।

কি সেই অন্তরায়? সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

১. প্রথমে বিজাতীয় ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আমাদের নযর দিতে হবে। বহির্বিশ্ব থেকে এই বিজাতীয় ধর্ম সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুদিন যাবত আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। এগুলো পাঠ করে একজন সাধারণ মুসলমানের ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি সন্দেহের বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহর অস্তিত্বে পর্যন্ত অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নড়বড়ে অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং দর্শন শাস্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব সন্ধানের প্রয়াস চলে। আমরা ভাবতে শুরু করি যে, প্রচীন কালের লোকদেরই শুধু ধর্মের প্রয়োজন ছিলো এখনকার সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত লোকদের জন্যে ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মের পথনির্দেশ এখন মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, আরো এক ধাপ এগিয়ে আমরা ভাবতে শুরু করি যে ধর্ম-পুরনো হয়ে গেছে, এবার যুগের চাহিদামাফিক তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বাস্তবতাসমূহের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করি, কারণ ধর্মকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কখনো মনে করি যে সব ধর্মেই কিছু না কিছু সত্যের নির্ণয় রয়েছে, কাজেই কোনো বিশেষ ধর্মের 'কম' গুরুত্বই বেশী' নয়।

এর সাথে সাথে খৃষ্টানদের গীর্জা ও শাসকদের সংঘাতে সৃষ্ট ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ প্রচেষ্টার মনোভাব গড়ে ওঠে। বর্তমান যুগের চিন্তাধায় এ মনোভাব এমন ব্যাপক জায়গা করে নিয়েছে যে, তা থেকে মানবতার পরিত্রাণ আশা করা যায় না। মোটকাথা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ব, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করেছে এবং মুখে কোরআনে বিশ্বাসীর দাবীদার মুসলমানেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু কে সর্বত্র এ বিষ পান করে চলেছি। বিষের নেশা যখন প্রকটরূপ ধারণ করে তখন মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠি, আল হামদুলিল্লাহ, আমরা মুসলমান।

২. মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের প্রতি ধর্মহীন আদর্শের এ ধরনের সয়লাবের প্রাক্কালে এক শ্রেণীর মুসলমান সে সয়লাবের মোকাবেলা করেছে এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয়



www.nagorikpathagar.org

দিয়েছে। অথচ অন্য একটি বিরাট অংশ ধর্মহীন আদর্শের প্রবক্তাদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে এ সমঝোতার কোনো কুফল দেখা যাক বা না যাক সর্বাবস্থায়ই এটা পরিপূর্ণভাবে আদর্শিক পরাজয়ের সূচনা। এ শ্রেণীর লোকেরা মুসলামনদের মধ্যে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের উন্নতি ও বিজয়ের রহস্য হচ্ছে তারা কোরআনের মূলনীতিসমূহের যথাযথ অনুশীলন করে সে অনুযায়ী কাজ করেছে। কাজেই তাদের অনুসরণ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপনেরই নামান্তর।

দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে নির্ভেজাল ধর্মীয় আন্দোলনকারীদের যাবতীয় কর্ম তৎপরতা এর মাধ্যমে নস্যাৎ করে দেয়া হয়। এ সময় সুযোগ বুঝে নামধারী মুসলিম দেশসমূহে সমঝোতা প্রিয় কিছু শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কোনো কোনো বিদেশী শক্তি তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানায় এবং সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা দিতে এগিয়ে আসে। ধীরে ধীরে তারা সহযোগীতাপ্রিয় লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। এতে মুল পরিচালিকা শক্তিরূপে তারাই সর্বত্র প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়।

বর্তমানে এরা একদিকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ফ্রন্টে কাজ করছে, অন্যদিকে তারা শিক্ষা ক্ষেত্রেও কাজ করছে। এদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার ফলে কোরআন ও মুসলমানদের মাঝখানে মোটা পর্দা অর্থাৎ বড় রকমের অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে গেছে।

৩. মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রথমে তারা রাজা বাদশাহদের শাসনাধীনে ছিলো, পরবর্তীকালে একনায়কত্বের অধীনে এসে পড়েছে। অনেক দেশে প্রায়ই রক্তাক্ত সাময়িক অভ্যুত্থানের খবর পাওয়া যায়। প্রতিশোধ গ্রহণের তৎপরতা, নিজেদের হাতে নিজেদের শক্তি ক্ষয়, করা দোদুল্যমান বর্তমান, অনিশ্চিত ভবিষ্যত, নৌকার টালমাটাল অবস্থা, এমনি পরিস্থিতিতে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ ও ষড়যন্ত্র কোরআনের সাথে এবং কোরআন গবেষণার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে।

ইসলামকে একটি গতিশীল আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিভিন্ন দেশে নানাভাবে উৎখাত করা হচ্ছে, নেতা ও কর্মীদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হচ্ছে। এতে বহির্বিশ্বের ইসলামবিরোধী শক্তি মদদ দিচ্ছে এবং সন্তোষ প্রকাশ করছে। ফলে সাধারণ মুসলমানরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কোরআনকে ভয় পেতে শুরু করেছে।

৪. জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে বিদেশী শক্তি ও সংশ্লিষ্ট দেশের শাসকবর্গ পশ্চিমা সেকুলার পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। এতে অনেক ক্ষেত্রে তারা পূর্ণ সফলতা পেয়েছে কোথাও আংশিকভাবে সফল হয়েছে। কোথাও দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে সংঘাত চলছে।

দ্বিতীয়ত কোনো কোনো দেশে খাঁটি সেকুলারিজম চালু করতে অসুবিধা দেখা দেয়ায় কোরআনের বাণী ও ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারায় কিছু রদবদল করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে কোথাও খতমে নবুওতের বন্ধ দরজা খোলা হয়েছে অর্থাৎ কেউ নবুওত দাবী করেছে। কোথাও নবুওতের সাথে কোরআনের সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন ধরনের ধর্ম বিশ্বাস চালু



www.nagorikpathagar.org

করতে চেয়েছে, কোথাও কোরআনের নতুন ব্যাখ্যা এবং ইজতেহাদের নামে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির ভাবধারা ও চিন্তাচেতনাকে কোরআনের শিক্ষার নামে চালিয়ে দিয়েছে।

আধুনিক যুগের এসব নৈরাজ্য চিন্তা ও আদর্শের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সে প্রকট সমস্যা মুসলমানদেরকে এক অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে এনে নিক্ষেপ করেছে।

সমঝোতাপ্রিয় লোকেরা কখনো ইসলামী সমাজতন্ত্রের, কখনো ইসলামী গণতন্ত্রের ধূয়া তুলছে কখনো অন্য কোনো আদর্শের গোঁজামিল পেশ করছে। এরা এক শ্রেণীর মুসলমানের সন্দেহপরায়ন মনোভাবের সুযোগ নিচ্ছে।

৫. মুসলমানদের নতুন মানসিকতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাহিত্যের ব্যাপারে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। আধুনিক সাহিত্য সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ধর্মহীনতার বিষ ছড়াচ্ছে। সেসব বিষ পান করে পাঠক রীতিমত গর্ববোধ করছে। এসব সাহিত্যের স্রষ্টারা কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে কোরআন সুন্নাহ এবং ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিষেদগার করছে। আলেম সমাজের প্রতি কটাক্ষ করছে। এদের এসব অপতৎপরতার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ধর্মবিমুখ করে গড়ে তোলা।

আধুনিক সাহিত্যে ধর্মভীরু লোকদের পাইকারীভাবে 'মোল্লা' উপাধি দিয়ে তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হচ্ছে। তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের সৃষ্ট সাহিত্যকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাদের এ ধরনের মনোভাব ও কর্মতৎপরতা ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে যারা ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করছে এসব তথাকথিত প্রগতিশীল সাহিত্যসেবীরা তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে বিদ্রুপ বানে জর্জরিত করছে। তাছাড়া ইসলামী সাহিত্যের প্রকাশনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে নানাভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করে সেগুলো কোণঠাসা করে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সাধারণ পাঠক শ্রেণী আধুনিক সাহিত্যের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব গড়ে তোলে। এমনি করে এ সাহিত্য কোরআনের সামনে বিরাট আকারের পর্দা টানিয়ে দেয়।

বস্তুবাদ ও দুনিয়াপূঁজার বিভিন্ন উপায় উপকরণের বিরুদ্ধে কোরআন রীতিমত আন্দোলন শুরুর তাকিদ নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু সেই আন্দোলনের সামনে বস্তুবাদ ও দুনিয়াপুঁজাই অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। শিল্প বিপ্লবের আগমনও জরুরী, বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং যন্ত্রপাতির সাদৃশ্য গ্রহণও জরুরী, কিন্তু একজন মুসলমান হিসাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যায়, অর্থ সম্পদ ও রকমারী বস্তুবাদের সয়লাব তার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যসমূহ সহ সর্বব্যাপী আসন গেড়ে বসেছে। এ পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। এ সয়লাবের প্রবণতা লক্ষ্য করেই আল্লামা ইকবাল একদিন মুসলিম জাতিকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি অবণত মস্তকে উক্ত সয়লাব মেনে নেয়ার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনে যুদ্ধ করারও পরামর্শ দেন। কিন্তু আমরা সতর্ক হতে এবং সে সয়লাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছি।

অর্থনৈতিক অসাম্য বর্তমান সমাজে একদিকে ধনস্ফীতি ঘটাচ্ছে অন্যদিকে বঞ্চনার ও দারিদ্রের চরম ভ্রুকুটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের মেশিনের চাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে



www.nagorikpathagar.org

পিষে ফেলেছে। এ বিপ্লবের ফলে শ্রেণীগত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দলে দলে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘাত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আরো বেশী অর্থ উপার্জনের জন্যে সবাই অন্ধের মতো ছুটছে। কারণ বর্তমানে অর্থই হলো সম্মান নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি। অর্থের সামনে সকল প্রকার চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবিকতা মাথা নত করে ফেলেছে। ব্যাংক, গাড়ী, বড় বড় কারখানা, বড় বড় হোটেল, উড়োজাহাজ, জাহাজ ইত্যাদির সামনে মানুষ নিজেকে অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র এবং মূল্যহীন ভাবতে শুরু করেছে। অধিকাংশ লোকের সময় ও শক্তি অর্থ সম্পদই এমনি করে গ্রাস করে ফেলেছে। মনে হয় যেন অর্থ সম্পদই তাদের মাবুদ, তাদের ধর্ম চরিত্র, এবং মানবতা দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে উন্নতি অগ্রগতির ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী চিন্তা মন থেকে মুছে গেছে। বর্তমানে সবখানে অর্থনৈতিক বিচারে উন্নতি অগ্রগতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থ সম্পদ যাদের রয়েছে এবং যারা নিজেদেরকে উন্নত ও প্রগতিশীল বলে দাবী করছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হয়ে উঠেছে যে, ঈমান আকীদা, ধর্ম আধ্যাত্মিকতা এবং চারিত্রিক মূল্যবোধ যেন উন্নতি অগ্রগতির পথে আন্তরায়। যারা বৈষয়িক উন্নতি অগ্রগতির সাথে সাথে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকৃষ্ট সাধনের চেষ্টা করে, উল্লিখিত উন্নত ও প্রগতিশীল লোকেরা তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীলতার রোগী বলে মনে করছে।

অর্থ সম্পদ ও বস্তুবাদের এসব উপাসকরা যা কিছু করে সব কিছুতে বিজ্ঞানের নাম ব্যবহার করে। এখন বিজ্ঞান কোনো জ্ঞান রূপে নয় বরং এমন অর্থে ব্যবহার করা হয় যেন এই বিজ্ঞানই ধর্ম এবং উন্নতি অগ্রগতির দেবতা।

এই দেবতা তার উপাসকদের সামনে নানারকম আবিষ্কারের কারিশ্‌মা দেখাচ্ছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রথমদিকে পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা যেভাবে বিজ্ঞানের উপাসকে পরিণত হয়েছিলো বর্তমানে আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও সেরকম অবস্থা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিজেরা আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হয়েও নিজেদের বিজ্ঞানের সেবক বা দাসের মতো মনে করি, বিজ্ঞানের উদ্ভাবনকে আল্লাহর নেয়ামত রূপে আখ্যায়িত করিনি এবং বিজ্ঞানের শক্তিকে কোরআন নির্দেশিত উপায়ে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। আমরা পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ধর্মহীন দর্শন বিজ্ঞান ও বস্তুবাদসহ নিজেদের একমাত্র চাওয়া পাওয়া গ্রহণ করেছি।

কোরআন ও আমাদের মধ্যে এযুগে এটাই সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের প্রতিবন্ধক হিসেবেও চিহ্নিত হয়ে আছে।

৭. অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে চারিত্রিক সীমারেখা এবং উচ্চতর মানবিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ থেকে পৃথক রাখার একটা ভয়ানক ফল হচ্ছে, তার সাথে দেহপূজার সংস্কৃতি আমাদের জাতি সত্তায় প্রবেশ করেছে। পশ্চিমা দেশসমূহে এই দেহপুজার সংস্কৃতি সমাজকে ঘুনে খাওয়ার মতো খোকলা অন্তসার শূন্য করে ফেলেছে। নোংরা ছায়াছবি, মদ, নাচগান, সহশিক্ষা, সহ অবস্থানের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, মন্দদৃষ্টি, বেলেল্লাপনা, নগ্নছবি, মেয়েদের পর্দাহীনতা, খাটো পোশাক, পোশাক ও চুলের রকমারি ফ্যাশনের তরঙ্গ, গোপনে বিক্রিত ও ভাড়া দেয়া অশ্লীল বই, পত্র-পত্রিকা, নেশাজাত ঔষুধ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্রেতা



www.nagorikpathagar.org

আকর্ষণের উদ্দেশ্যে যুবতী মেয়েদের লেলিয়ে দেয়া, পরিবার পরিকল্পনা জনপ্রিয় করার অভিযান ইত্যাদিকে কিছুতেই কোরআনের সংস্কৃতি বা ইসলামের সংস্কৃতি বলা যায় না। কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই এ অবস্থানকে 'সিবগাতুল্লাহ' বা আল্লাহর রঙ বলা যায় না, যে রঙে রাঙিয়ে তোলার জন্যে অসংখ্য নবী-রসূল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং ঐশী গ্রন্থসমূহ নাযিল করেছেন।

প্রবৃত্তি পূজার এ সরলতাকে কিছুতেই আল্লাহর গোলামীর সাথে সম্পৃক্ত সংস্কৃতির সাথে একাত্ম বলে অভিমত প্রকাশ করার উপায় নেই। কেননা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর যেকের অর্থাৎ স্মরণের শিক্ষা দেয় এবং সেই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে পারলৌকিক জীবনের জন্যে প্রস্তুত করে তোলা।

প্রবৃত্তি পূজা ও দেহ পূজার সংস্কৃতি যে সমাজে যতো বেশী জোরদার হয়ে ওঠে সেখানে ততো বেশী চারিত্রিক অধপতন, সামাজিক জীবনে নষ্টামি, মানসিক অস্থিরতা, আল্লাহর সান্নিধ্যে থেকে দূরত্ব এবং আখেরাত বিস্মৃতির প্রকোপ দেখা দেয়।

কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজ পাশ্চাত্যের অবাধ্য সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়ার পর কিছুতেই কোরআনের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। তাদের জন্যে আল্লাহর বিধি বিধানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

হায়রে দুর্ভাগ্য। এই সংস্কৃতিই কোরআনের কাছে পৌঁছার পথে আমাদের জন্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। অথচ আমরা মুসলমান দাবী করেই এগুলোর সযত্ন লালন পালন করছি।

৮. আরো একটা অন্তরায় হচ্ছে আলেমদের মতবিরোধ। আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে সীমিত সংখ্যক বাদে অধিকাংশকেই ছোট খাট বিষয়ে ফেকাহর মাসলা মাসায়েল সম্পর্কে পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি করতে দেখা যায়। মসজিদে মসজিদে নানা যুক্তির অবতারণা করে অনেকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কুফুরী ফতোয়া, জ্বালাময়ী বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলেন। অথচ এরাই কোরআন সুন্নাহর আলোকে সদ্ব্যবহার, মার্জিত কথা বার্তা, উন্নত জীবন পদ্ধতি শিক্ষা দেন। তাঁদের এধরনের অনাকাংখিত কাজ সমাজের মারাত্মক ক্ষতি করছে। ধর্মীয় বা অন্যান্য ছোট ছোট বিষয়ে তাঁদের অসহিষ্ণুতার পরিণামে সাধারণ মানুষ ধর্মের সহজ সরল শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, শিক্ষিত লোকেরা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্বীন থেকে দূরে চলে যায়। নিজেদের সরলতার কারণে কিছু কিছু আলেম অজ্ঞাতসারে ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। রাজনীতি সম্পর্কে এরা প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টি না করে ছোট খাট বিষয়ে তোলপাড় বাধিয়ে দেন। তবে সান্ত্বনার কথা যে তাদের মধ্যেকার ধীশক্তি সম্পন্ন সচেতন কিছু আলেমে দ্বীনরা বৃহত্তর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং কোরআনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করছেন।

৯. বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগেও কোরআনের প্রতি মুসলমানদের অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে। এটা আল্লাহর এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস ও ভক্তি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।



www.nagorikpathagar.org

আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে যে কোরআন আল্লাহর কেতাব, এই কেতাবের বাণী অনুযায়ী দোয়া করলে, ওযিফা হিসাবে ব্যবহার করলে বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। এছাড়া রেযেক বৃদ্ধি, মামলা মোকদ্দমায় সাফল্য, প্রতিপক্ষের ওপর জয় লাভ, প্রেমিক বা প্রেমিকার মন জয়, বিয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য, সন্তান লাভ, জান-মালের নিরাপত্তা, রোগ নিরাময়, দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণ, ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুফল লাভ করা যায়। এ ধরনের বিশ্বাস নিয়েই তারা কোরআনে চুমু খায়, রেশমী গেলাফে আবৃত করে উঁচু তাকিয়ায় তুলে রাখে, সৌভাগ্যবান কেউ কেউ তেলাওয়াত করে, অনেকে কিছু কিছু অংশ মুখস্থ করে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে যারা কোরআনকে আল্লাহর ফরমান হিসাবে মেনে কোরআনের বিধিনিষেধ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট।

উপরোক্ত অবস্থাও কোরআন এবং মুসলমানদের মধ্যে এক বিরাট অন্তরায়। কোরআন চায়না যে তার প্রতি অন্ধভক্তি পোষণ করেই মুসলমানরা দায়িত্ব থেকে মুক্তির কথা চিন্তা করবে; বরং কোরআন ঈমানের পর জ্ঞান, অনুশীলন, চিন্তা-ভাবনা এবং আমল দাবী করে।

উপরোক্ত ৯টি অন্তরায় কোরআনকে প্রাচীরঘেরা দুর্গের ভেতর বন্দী করে রেখেছে। কোরআনের কাছে যারা পৌঁছুতে চায় তাদেরকে উপরোল্লিখিত দেয়ালসমূহ অতিক্রম করতে হবে। কোরআনকে দেয়ালের ভেতর থেকে বের করে আনতে পারলেই কোরআন সকল শ্রেণীর জনগণের জন্যে সূর্যের আলোর মতো ঝলমল করবে।

আমাদের নিজেদের ও অন্যদের সৃষ্ট অন্তরায়সমূহ যদি না থাকতো তবে কোরআনের শিক্ষার সারমর্ম হতো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সাদাসিধে।

কোরআন আমাদেরকে তিনটি মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেয়। সেসব শিক্ষা মেনে নেয়ার পর জীবনের সমগ্র নকশা আপনা আপনি পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

প্রথমত: আল্লাহ রব্বুল আলামীনই এ বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক আইনদাতা এবং আমরা সবাই তাঁর বান্দা।

দ্বিতীয়ত: বান্দাদের জীবন যাপনের সেই পথ ও পদ্ধতিই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে, যে পদ্ধতি তাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা, রেযেকদাতা ও বিচারক স্বয়ং নির্ধারণ করে দেন।

তৃতীয়ত: আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছা সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি এবং তাঁর হুকুম আহকাম বা বিধি বিধান পৌঁছে দেয়ার জন্যে এবং সে অনুযায়ী আদর্শ জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে সকল যুগে পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন। যারা বন্দেগীর হক পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় তাদের অনুসরণ অনুকরণ করা তাদের সকলের অবশ্য কর্তব্য।

চতুর্থত: মরনের পর আমাদেরকে একটি নতুন ও চিরস্থায়ী জীবন যাপন করতে হবে। সেই জীবনে ইহলৌকিক কর্মফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভালো এবং মন্দ লোকদেরকে তাদের কর্মফল যথাযথভাবে প্রদান করা হবে।

পঞ্চমত: জীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চারিত্রিক নীতি ও মূল্যবোধ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বিষয় যেমন বৈষয়িক



www.nagorikpathagar.org

স্বার্থ, অর্থনৈতিক তৎপরতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্ম ইত্যাদি সবকিছুই চারিত্রিক নীতি মূল্যবোধের অধীনে সম্পন্ন করতে হবে।

চারিত্রিক মূল্যবোধ ও নীতিমালাকে অগ্রাধিকার দেয়া হলে সুস্থ ও পবিত্র জীবনের অধিকার লাভ করা সম্ভব হবে, পক্ষান্তরে দৈহিক চাহিদা ও বস্তু স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হলে অবাধ্য জীবনেরই বহিপ্রকাশ ঘটবে।

ষষ্ঠত: মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দৃশ্যমান ও আয়ত্বাধীন বিষয় বস্তুই সবকিছু নয় বরং বাস্তব সত্যের অনেকখানি আমাদের চোখ কানের বাইরে রয়েছে। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সমূদ্রে ভাসমান বরফখন্ডের একাংশে দেখা যায় না কিন্তু পানির নীচে ডুবে থাকা সেই বরফখন্ডের বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় কি? মানুষের বুদ্ধি বিবেক সামর্থ সবই সীমিত ও অপূর্ণ। অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ওহী ও এলহাম। ওহী ও এলহামের মাধ্যমে অদৃশ্য জগতের সাথে যোগসূত্র গড়ে তুলতে হলে ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ কারণেই কোরআন তার দেয়া দাওয়াতকে তাদের জন্যেই কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছে যারা অদৃশ্য বিশ্বাসের দ্বার রুদ্ধ করেনি? ধরা ছোঁয়া যায় এমন দৃশ্যমান বিষয়কেই যারা সর্বস্ব বলে মেনে নেয়নি।

মনে রাখতে হবে যে, 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্য বিশ্বাসের অর্থ অন্ধকারের জ্ঞান নয় বা অদৃশ্য আত্মসমর্পণ নয়, বরং এর সাথে চিন্তা-গবেষণা এবং অনুশীলনের সংযোগ রয়েছে।

সপ্তমত: এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সামনে মাথানত করার পর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথানত করার অবকাশ নেই। অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের অধীনতা বা গোলামীরও কোনো সুযোগ নেই, কেননা আল্লাহর সৃষ্টি সকল মানুষই সমান এবং খেলাফতের দায়িত্ব সকলের ওপরেই সমানভাবে অর্পিত হয়েছে।

কোরআনের উল্লিখিত শিক্ষাসমূহ যারা গ্রহণ করবে তাদের জন্যে কোরআন 'মুসলিম' পরিভাষা ব্যবহার করেছে। মুসলিম তাকেই বলা হয় যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সর্বাত্মকভাবে আত্মসমর্পণ করে। মুসলিম হওয়ার পর একজন মানুষ নিজে যেমন শান্তি পায় তেমনি অন্যকেও শান্তির পথনির্দেশ দিতে পারে।

কোরআনের সৃষ্ট 'মুসলিম' ব্যাক্তি কখনোই শুধু মাত্র বস্তুর উপাসনায়-আত্মনিয়োগ করতে পারে না। কোরআনের উল্লিখিত শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণের পর বস্তুবাদের খাঁচায় আবদ্ধ থাকার অনুরূপ মানসিকতা গড়ে উঠবে না। কেননা মুসলিমের কার্যকলাপ বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট জেহাদ।❑



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

১১

# কোরআন আমাদের কাছে কি চায়

মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

কোরআনের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও কোরআনের দাওয়াতের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়িত করার যথাসাধ্য চেষ্টা যদি আমরা না করি তবে কেয়ামতের দিন এই কোরআনই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। শুধু তাই নয় আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) সেদিন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবেন, হে আমার প্রভূ, এরা হচ্ছে আমার উম্মতের সেই সব লোক যারা তোমার কোরআনকে পরিত্যাগ করেছিলো।

www.nagorikpathagar.org

কোরআনের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও কোরআনের দাওয়াতের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়িত করার যথাসাধ্য চেষ্টা যদি আমরা না করি তবে কেয়ামতের দিন এই কোরআনই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। শুধু তাই নয় আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) সেদিন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবেন, হে আমার প্রভূ, এরা হচ্ছে আমার উম্মতের সেই সব লোক যারা তোমার কোরআনকে পরিত্যাগ করেছিলো। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

'আর রসূল বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যাজ্য বিষয় বানিয়ে নিয়েছিলো।' (সূরা আল ফোরকান, আয়াত ৩০)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা জাছিয়ায় বলেন,

'(ওদের তখন) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে (জেনে শুনেই) ভুলে যাবো-ঠিক যেভাবে তোমরা (দুনিয়ায় থাকতে) এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে, (আজ) তোমাদের ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) আগুন, (সে আগুন থেকে বাঁচার জন্যে এখানে) তোমরা কোনোই সাহায্যকারী পাবে না। এ কারণেই (তোমাদের এই শাস্তি দেয়া হলো) যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি তামাশা করতে। (তোমাদের) পার্থিব জীবন দারুণভাবে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিলো, (সুতরাং) আজ তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না- না (আল্লাহ তায়ালার দরবারে) তাদের কোনো রকম অজুহাত পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।' (সূরা জাছিয়া, আয়াত ৩৪-৩৫)

**কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য**

কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন,

'অবশ্যই আমি সত্যের সাথে তোমার ওপর এই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যা (জ্ঞানের আলো) দেখিয়েছেন তার আলোকে তুমি মানুষদের বিচার মীমাংসা করতে পারো, (তবে বিচার ফায়সালার সময়) তুমি কখনো বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করো না।' (সূরা আন নেসা, আয়াত ১০৫)

নবী করীম (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'আমরা আগেও আল্লাহ তায়ালাকে ডাকতাম, (আমরা জানতাম) তিনি অনুগ্রহশীল ও দয়ালু।' ( সূরা আল ফাতাহ, আয়াত ২৮)

শুধু একথাই নয় বরং কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অতিতের সকল নবীর আবির্ভাব, সকল আসমানী কেতাবের অবতরণের উদ্দেশ্য ছিলো কোরআন অবতরণ ও মোহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের অনুরূপ।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

'(এক সময়) সব মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, (পরে এরা নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে তাদের স্রষ্টাকেই ভুলে গেলো) তখন আল্লাহ তায়ালা (সঠিক পথের অনুসারীদের) সুসংবাদবাহী আর গুনাহগারদের জন্যে আযাবের সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠালেন। তিনি (তাদের সত্য) গ্রন্থও নাযিল করেছেন, যেন তা মানুষদের এমন পারস্পরিক বিরোধসমূহের চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে, যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ



www.nagorikpathagar.org

করে। যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করতো তা– সুস্পষ্ট হেদায়াত পাঠানো সত্ত্বেও তারা করেছে। এরা পরস্পর বিদ্রোহেরও আচরণ করে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে স্বীয় ইচ্ছায় সেই সঠিক পথ দেখালেন, যার ব্যাপারে ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা যাকে চান- তাকে তিনি সঠিক পথ দেখান।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২১৩)

নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'(হে মানুষ,) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সে 'দ্বীনই' নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি তোমাদের কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি, (উপরন্তু) যার আদেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম, (এদের সবাইকে আমি বলেছিলাম,) তোমরা এ জীবন বিধানকে (সমাজে) প্রতিষ্ঠিত করো এবং (কখনো) এতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না, আর তুমি যে (দ্বীনের) দিকে আহ্বান করছো এটা মোশরেকদের কাছে একান্ত দুর্বিসহ মনে হয়। (মূলত) আল্লাহ তায়ালা যাকেই চান তাকে বাছাই করে নিজের দিকে (নিয়ে আসেন) এবং যে ব্যক্তি তার অভিমুখী হয় তিনি তাকে (দ্বীনের পথে) পরিচালিত করেন।' (সূরা আশ শূরা, আয়াত ১৩)

দ্বীনের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করাই হচ্ছে দ্বীন। কিছুতেই অন্য কারো আনুগত্যের প্রভাব বান্দার জীবনে থাকতে পারবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

'(হে নবী) তুমি (লোকদের) বলো, হে মানুষ তোমরা যদি আমার (আনীত) দ্বীন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ করো, (তাহলে শুনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমরা অন্য যাদের এবাদাত করো, আমি তাদের এবাদাত করি না, আমি তো বরং তাঁর (সেই মহান সত্তার) এবাদাত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আমাকে আরো আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (আমাকে আরো বলা হয়েছে) তুমি আল্লাহর দ্বীনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে নিজের চেহারাকে (তাঁর জন্যেই) প্রতিষ্ঠা করো এবং কখনো তুমি মোশরেকদের দলে শামিল হয়ো না। (আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে) তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার কোনো কল্যাণ (যেমন) করতে পারে না, (তেমনি) তোমার কোনো অকল্যাণও সে করতে পারে না, (এ সত্তেও) যদি তুমি অন্যথা করো, তাহলে তুমি অবশ্যই যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউই নেই তা দূরীভূত করার, (আবার) তিনি যদি (মেহেরবানী করে) তোমার কোনো কল্যাণ চান, তাহলে তাঁর সেই অনুগ্রহ রদ করারও কেই নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের যার ওপর চান তার ওপরই কল্যাণ পৌছান। আল্লাহ তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (সূরা ইউনুস আয়াত ১০৪-১০৭)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরো বলেছেন,

'(হে নবী) তুমি বলো, হে মানুষ তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সত্য (দ্বীন) এসেছে। অতএব যে হেদায়াতের পথ অবলম্বন করবে, সে তো তার নিজের ভালোর জন্যেই হেদায়াতের পথে চলবে, আর যে গোমরাহ থেকে যাবে, সে তো গোমরাহীর ওপর চলার কারণেই গোমরাহ হয়ে যাবে। আমি তো তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই।' (সূরা ইউনুস আয়াত ১০৮)



www.nagorikpathagar.org

সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো লোক এটা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার আদেশই কার্যকর হবে। সৃষ্টি কর্তৃক স্রষ্টার প্রভাবমুক্ত হয়ে অন্য কারো গোলামী বা আনুগত্য করার বিবেক সম্মত কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না, নৈতিক কোনো বৈধতাও এ ব্যাপারে কার্যকর নয়। ইনসাফের দাবী হচ্ছে যিনি কোনো জিনিস তৈরী করেছেন এবং মালিকানা লাভ করেছেন তিনিই তা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

এ কারণেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্যকে যুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অনেক কারণ রয়েছে প্রথমত, সৃষ্টি বা মাখলুকের জন্যে তিনিই আইন বা বিধান তৈরী করতে পারেন যিনি খালেক অর্থাৎ স্রষ্টা। দ্বিতীয়ত, সুবিচারের দাবী বলতে যা বুঝায় আল্লাহ তায়ালা তা পরিপূর্ণভাবেই নিজের বিধানে সন্নিহিত রেখে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কারো গোলামী যুলুম বলে পরিগণিত হবে। যেমন আল্লাহ রব্বুল আলামীন আহকামুল হাকেমীন বলেন,

'আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না তারা (হচ্ছে সুস্পষ্ট) যালেম।

যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে এরূপ মানোভাব নিয়ে ফয়সালা করে যে, আল্লাহর নির্দেশ ভুল বা অযৌক্তিক এবং অন্য কারো নির্দেশ ও বিধানকে অধিক উপযুক্ত মনে করে সে শুধু মারাত্মক রকমের যালেমই নয় বরং সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য জীবও বটে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন বা বিধান সত্য বা হক বলে দাবী করার পরও তার বিরুদ্ধে ফয়সালা করে সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট অবাধ্য ও পথভ্রষ্ট। সূরা মায়েদাই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'(এরপর) জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামী লোকদের ডেকে বলবে, আমরা তো আমাদের মালিকের (জান্নাত সংক্রান্ত) ওয়াদাকে সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের মালিকের ওয়াদাসমূহকে সঠিক পাওনি? তারা বলবে, হাঁ। অতপর একজন ঘোষণাকারী এসে ঘোষণা করবে যে, যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার লানত হোক।' (সূরা আল আ'রাফ আয়াত ৪৪)

সূরা মায়েদায় আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

'অতপর যখন তাদের দৃষ্টিকে জাহান্নামের অধিবাসীদের আযাবের) দিকে ফিরিয়ে দেয়অ হবে (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, (তুমি) আমাদের এই যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।' (সূরা আল আ'রাফ আয়াত ৪৭)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কি উদ্দেশ্যে কোরআন নাযিল করেছেন এবং সকল মানুষের জন্যে সর্বশেষ রসূল প্রেরণের মিশনই বা কি সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আমাদের ওপর স্পষ্টতই কিছু দায়িত্ব আরোপিত হয়। সে দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা গবেষণার প্রয়োজন নেই; কারণ দায়িত্বের স্বরূপ কোরআন সুন্নায় সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

**মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য**

সূরা হজ্জ-এ আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা জেহাদ করো যেমনি তার জন্যে জেহাদ করা তোমাদের উচিত, তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদেরই মনোনীত করেছেন এবং (এই) জীবন বিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি, (তোমরা প্রতিষ্ঠিত



www.nagorikpathagar.org

থেকো) তোমাদের (আদি) পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর, সে আগেই তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলো, এই (কোরআনের) মধ্যেও (তোমাদের এই নামই দেয়া হয়েছে) যেন (তোমাদের) রসূল তোমাদের (মুসলিম হবার) ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে, আর তোমরাও (দুনিয়ার গোটা) মানব জাতির ওপর (আল্লাহর দ্বীনের) সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো। অতএব নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ তায়ালার রশিকে শক্তভাবে ধারণ করো, তিনিই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক, তিনি কতো উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)!' (সূরা হজ্জ আয়াত ৭৮)

ইতিহাস সাক্ষ্য রয়েছে যে, আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ (স.) শুধু ওয়ায নসিহত শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেননি। নবী করীম (স.) মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিদায় হজ্জে তিনি জাতির কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব ও মিশন বাস্তবায়নে তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের পরই আল্লাহ রব্বুল আলামীন দ্বীনের পূর্ণতার সনদ বা সার্টিফিকেট দিয়েছেন এবং আগামী দিনগুলোতে অনুরূপ জীবন যাপনের জন্যে মুসলমানদের তাকিদ দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন,

'মৃত জন্তু, রক্ত, শুয়োরের গোশত ও যে জন্তুকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে (তা সবই) তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে, গলা চেপে মারা, আঘাত খেয়ে মরা, ওপর থেকে পড়ে মরা, শিং-এর আঘাতে মরা, হিংস্র জন্তুর খাওয়া জন্তুও (তোমাদের জন্যে হারাম), তবে তোমরা তাকে যদি (জীবিত অবস্থায় পেয়ে) যবাই করে থাকো (তাহলে তা হরাম নয়), পূজার বেদীতে বলি দেয়া জন্তুও হারাম। (লটারী কিংবা) জুয়ার তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য জেনে লওয়া (হারাম), এর সব কয়টাই হচ্ছে বড়ো (বড়ো) গুনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন (-কে নির্মূল করার) ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতকেও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনের ব্যবস্থা হিসাবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম। (হারামের ব্যাপারে মনে রেখো) যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম খেতে) বাধ্য হয়, কিন্তু (ইচ্ছা করে) কোনো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়তে না চায়। (তার ব্যাপারটা আলাদা) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (সূরা আল মায়েদা আয়াত ৩)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা হচ্ছো উত্তম দল, যাকে মানবজাতির মঙ্গলের জন্যে আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এসকল বাণীর আলোকে সহজেই এটা বোঝা উচিত যে, সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে অধিষ্ঠিত থাকা মুসলিম জাতি আজ সমগ্র বিশ্বে কেন অবহেলিত,



www.nagorikpathagar.org

কেন তারা অধঃপতিত। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মৌলিক দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তি কিছুতেই তার সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত থাকার উপযুক্ত হয় না। দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে সে যোগ্যতা তার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। তাকে বরখাস্ত করা হলে অভিযোগ করার অধিকার এবং সুযোগও তার নেই এবং অভিযোগ তার জন্যে শোভনীয়ও নয়।

কোরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন বিধান বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার গুরুত্ব কতোটুকু এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজের মর্যাদা কতোটুকু সেটা জানা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কথা আল্লাহর প্রতি ঈমানে আনয়নের আগেই উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যেন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছাড়া ঈমানের কোনো অর্থই নেই।

উপরোক্ত আয়াতে মুসলিম জাতির দায়িত্বের আসল কাজের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, এ কাজের জন্যে বিশেষভাবে তাকীদ আদেশই শুধু দেয়া হয়নি বরং সে কাজকে মুক্তি ও কল্যাণের মাধ্যম বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। যারা একাজে কোনো মতবিরোধ বা বিচ্ছিন্নতার জন্যে দায়ী হবে তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

'তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকবে, যারা (মানুষকে সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে এবং অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে। (অতপর যারা এই দলে শামিল হবে) সত্যিকার অর্থে তারাই সাফল্যমন্ডিত হবে। তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতনৈক্য সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের মানুষদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান আয়াত ১০৪, ১০৫)

মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে প্রথমে ঈমান আনয়ন করা প্রয়োজন। ঈমান ব্যাতীত কোনো মানুষ ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করতে পারে না এবং তাদের জন্যে পরকালের জীবনে মুক্তির প্রশ্নই আসে না। এই ঈমান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'না, আমি তোমাদের মালিকের শপথ করে বলছি, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নেবে, অতপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না বরং তোমার সিদ্ধান্তকে তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।' (সূরা আন নেসা আয়াত ৬৫)

স্বয়ং নবী করীম (স.) এ আয়াতের ব্যাখা দান প্রসঙ্গে বলেছেন, তোমাদের কোনো ব্যক্তি ততোক্ষণ পর্যন্ত সঠিক অর্থে ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনের ইচ্ছা-আকাংখাকেও আমার আনীত বিষয়ের অধীনস্থ করে না দেয়। (মেশকাত)

নবী করীম (স.) আরো বলেছেন, 'সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হয়েছে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে আল্লাহকে নিজের মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে, ইসলামকে



www.nagorikpathagar.org

নিজের জীবন পদ্ধতি এবং মোহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহর প্রেরিত পথপ্রদর্শক রূপে মেনে নিয়েছে।' (মেশকাত)

ঈমানের পূর্ণতার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মহানবী (স.) আরো বলেন, 'যার বন্ধুত্ব শত্রুতা, কাউকে সাহায্য করা এবং কাউকে সাহায্য না করা সবই আল্লাহর জন্যে হয়ে থাকে সে ব্যক্তি নিজের ঈমানের পূর্ণতা বিধানে সক্ষম হয়েছে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূলকে এবং রসূলের মাধ্যমে সকল ঈমানদারকে এ শিক্ষাই প্রদান করেছেন।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

'তাদের কাছ থেকে সেই জনপদের কথা জিজ্ঞেস করো, যা ছিলো সাগরের পাড়ে (অবস্থিত)। সেখানকার মানুষরা শনিবারে (আল্লাহ তায়ালার বেধে দেয়া) সীমা লংঘন করতো। (আসলে) শনিবারেই (সাগরের) মাছগুলো তাদের কাছে উঁচু হয়ে পানির উপরিভাগে (ভেসে) আসতো এবং শনিবার ছাড়া অন্য কোনোদিন তা আসতো না। (বস্তুত) তাদের অবাধ্যতার কারণেই আমি তাদের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। (আরো স্মরণ করো) যখন তাদের একদল লোক এও বলছিলো যে, তোমরা এমন একটি দলকে কেন উপদেশ দিতে যাচ্ছো, যাদের আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করতে যাচ্ছেন, অথবা (গুনাহর জন্যে) আল্লাহ তায়ালা যাদের কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, তারা বললো, তোমাদের মালিকের দরবারে (নিজেদের) ওযর পেশ করে (আমরা বলতে পারবো যে, আমরা উপদেশ দিয়েছি) এবং হতে পারে যে, তারা এর ফলে সাবধান হবে।' (সূরা আল আ'রাফ আয়াত ১৬৩- ১৬৪)

**অন্যান্য ধর্ম প্রসংগে**

উপরোক্ত বর্ণনায় কারো যেন এমন ধারণা না হয় যে, আল্লাহর যমীনে অন্য কোনো ধর্মের লোকদের বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্যকারীদের জায়গা নেই। ইসলাম কখনো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে উৎখাত করার নির্দেশ দেয়নি। বরং সেসব ধর্মের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, অমুসলিমদের সাথে ইসলামী সমাজে যেরূপ উদার ব্যবহার করা হয়েছে তার উদাহরণ অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা ইসলাম তার সমাজে অমুসলিম নারী পুরুষের জান-মাল সম্মান রক্ষাকে মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেছে। এমনকি যুদ্ধরত শত্রুদের ন্যায় সঙ্গত মানবাধিকার রক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো মুসলমান ইসলামের সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত থেকে ওসব যুদ্ধরত অমুসলমানকে পয়মাল করতে পারে না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন,

'তোমরা যখন বলেছিলে, হে মূসা, আমরা আল্লাহকে নিজেদের চোখে না দেখলে কখনো তার ওপর ঈমান আনবো না। তখন (এ ধৃষ্টতার শাস্তি হিসেবে) মুহূর্তের মধ্যেই বজ্রের মতো এক গযব তোমাদের ওপর নিপতিত হলো, তোমরা তার দিকে চেয়ে থাকলে (কিছুই করতে পারলে না)। অতপর এই মৃত্যু (সম ধ্বংসের) পর তোমাদের আমি পুনরায় জীবন দান করলাম, যাতে করে তোমরা (আমার) কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত ৫৫-৫৬)



www.nagorikpathagar.org

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

'(হে নবী,) তুমি কি তাদের (অবস্থা) দেখোনি- যারা মনে করে যে, তারা সেই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং সেই (কেতাবের) ওপরও ঈমান এনেছে, যা তোমার আগে নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু (ফয়সালার সময় আমার কেতাবের বদলে) এরা মিথ্যা তাগুতের কাছ থেকেই সেই বিচার পেতে চায়, অথচ এদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তারা এসব (তাগুতদেরকে) অস্বীকার করবে, (আসল কথা হচ্ছে) শয়তান এদের সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।' (সূরা ৪ আয়াত ৬০)

আল্লাহর আনুগত্যই শুধু নয়, পবিত্র কোরআনে নবী করীম (স.)-এর আনুগত্যকে আল্লাহর বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অর্থাৎ আমি রসূলদেরকে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যেন তার আনুগত্য করা হয় আল্লাহর নির্দেশে।' (সূরা ৪ আয়াত ১৪)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন,

'অর্থাৎ হে নবী যদি তোমার কাছে মোমেন নারীগণ আগমন করে এসব বিষয় বয়াত করার জন্যে তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুতেই শরীক করবে না, চুরি জ্নো সন্তান হত্যা করবে না. অপরের গর্ভজাত বা ঐরশজাত সন্তানকে আপন স্বামীর ঐরশজাত বলে দাবী করে লইবে না এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাকে অমান্য করবে না তাদের তাদেরকে বয়াত করো।' (সূরা আল মোমতাহেনা, আয়াত ১২)

এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী মোহাম্মদ (স.) বলেছেন, 'শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজে আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু শরীয়তসম্মত কাজেই করতে হবে।'

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, প্রিয় নবী (স.) বলেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই।'

আনুগত্যের যে বিধিব্যবস্থা ইসলাম প্রবর্তন করেছে সেটা পবিত্র কোরআনের সূরা নেসায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন এভাবে উল্লেখ করেছেন,

'হে ঈমানদার মানুষরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসূলের এবং সে সব লোকদের- যারা তোমাদের মাঝে (বিশেষভাবে) দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর তোমাদের মাঝে যদি কোনো ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই বিষয়টিকে (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং পরিণতির দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা)।' (সূরা আন নেসা আয়াত ৫৯)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় আল্লাহর আনুগত্য ইসলামে অবশ্য কর্তব্য, কেননা তিনিই সমগ্র বিশ্বজাহানের একমাত্র স্রষ্টা প্রতিপালক। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম আল্লাহর বান্দা, অন্য সবকিছু তার পরে। মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের মূল দাবী আল্লাহর আনুগত্য। অন্যান্য আনুগত্য যদি আল্লাহর আনুগত্যের পথে প্রতিবন্দক না হয় বরং আল্লাহর আনুগত্যের অধীনস্থ হয় তবে তা পালন করা যেতে পারে। কোরআনের



www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টিতে আল্লাহর আনুগত্যের পরে পিতা-মাতার আনুগত্য করা প্রয়োজন। আল্লাহর হক্ এর পর পিতামাতার হক পালন করতে হবে। সুরা লোকমানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে বলেন,

'আমি মানুষকে (তাদের) পিতা-মাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি, (যেন তারা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে,) কেননা তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর পর সে বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে, তুমি (সৃষ্টির জন্যে আমার শোকর আদায় করো এবং তোমার (লালন পালনের জন্যে) পিতা-মাতারও কৃতজ্ঞতা আদায় করো, (অবশ্য তোমাদের সবাইকে) আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।' (সূরা লোকমান আয়াত ১৪)❑



www.nagorikpathagar.org

১২

# কোরআনের পটভূমি

সৈয়দ মারূফ শাহ সিরাজী

www.nagorikpathagar.org

কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কোরআনই মানব জাতির হেদায়াতের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু কোরআনের আসল উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্যে কোরআন নাযিলের পটভূমির প্রতি নযর দেয়া অপরিহার্য। কোরআন যাদের প্রতি প্রথমে নাযিল হযেছে, তাদের সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে হবে। কেননা যাদের প্রতি প্রথমে কোরআন নাযিল হয়েছে তারাই ছিলেন পরবর্তী কালের মানব সম্প্রদায়ের হেদায়াতের বাহক।

www.nagorikpathagar.org

কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কোরআনই মানব জাতির হেদায়াতের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু কোরআনের আসল উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্যে কোরআন নাযিলের পটভূমির প্রতি নযর দেয়া অপরিহার্য। কোরআন যাদের প্রতি প্রথমে নাযিল হয়েছে, তাদের সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে হবে। কেননা যাদের প্রতি প্রথমে কোরআন নাযিল হয়েছে তারাই ছিলেন পরবর্তী কালের মানব সম্প্রদায়ের হেদায়াতের বাহক। যে বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে তারা অতিক্রম করেছিলেন কোরআন অধ্যয়নকারীদের কোরআন উপলব্ধির প্রয়োজনেই সেই বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে, সেই সময় দুনিয়ার বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের বিশ্বাস কিরূপ ছিলো? কি কি ধর্মের মোকাবেলা কোরআনকে করতে হয়েছিলো এবং কোন ধরনের লোকদের কোরআন সম্বোধন করেছিলো? এসব প্রশ্ন এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়কে আমরা পটভূমি বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

**১. মক্কার পৌত্তলিক সম্প্রদায়**

মক্কার পৌত্তলিক অর্থাৎ মোশরেকদের দাবী ছিলো যে তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের অনুসারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দ্বীনে ইবরাহীম থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিলো। শুধু দ্বীনে ইবরাহীমের কয়েকটি নাম সর্বস্ব অনুষ্ঠান তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। যেমন হজ্জ, (যদিও হজ্জের রীতি নীতি তারা বিকৃত করে ফেলেছিলো) কেবলা, নিষিদ্ধ কয়েকটি মাস, খত্না প্রভৃতি। কিন্তু আল্লাহ, রেসালাত বা নবুওত এবং আখেরাত সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা দ্বীনে ইবরাহীম থেকে ছিলো যোজন যোজন দূরে। তারা শেরেক বা অংশীদারিত্বে লিপ্ত ছিলো। কেয়ামত সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিলো যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান কি করে সম্ভব? একইভাবে কোনো মানুষ আল্লাহর রসূল হতে পারেন এটাও তাদের বোধগম্য ছিলো না।

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে পৌত্তলিকদের যে বিশ্বাস ছিলো কোরআন তার প্রতিবাদ করেছে। কোরআন বলেছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শাহরগের (ঘাড়ের পাশের) চেয়েও বেশী কাছে এবং আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য একইসাথে পরিচালনা করেন। তিনি চিরঞ্জীব এবং চিরন্তন। নিজের কাজে তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হন্না এবং তিনি কখনোই ঘুমে কাতর হন্না, তাঁর বিশ্রামের কোনো প্রয়োজন হয় না। তিনি বিশাল ক্ষমতার অধিকারী। কোনো কাজেই কেউ তাঁর অংশীদার বা সমকক্ষ নেই। কোরআনে বারবার বলা হয়েছে, তিনি সর্ব শক্তিমান, তিনি সবজান্তা, তিনি তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। পৌত্তলিকরা মনে করতো যে, একজন বাদশাহর কাছে যেমন সুপারিশ করা যায় তেমনি আল্লাহর দরবারেও সুপারিশ করা যায়, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের জবাবে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। পৌত্তলিকদের হাতে গড়া উপাস্য মূর্তিসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা শুধু পাথরেরই উপাসনা করছো, কোনো ব্যাপারেই এ সব পাথরের কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ তায়ালা আরো জানিয়ে



www.nagorikpathagar.org

দিয়েছেন কেয়ামতের দিন তোমাদের তৈরী ও উপাস্য মূর্তিরাই সর্বপ্রথম তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে।

রেসালাত বা নবুওত সম্পর্কে তারা বলতো যে, রসূল মানুষ হয় কি করে? কোরআন জানিয়ে দিয়েছে যে, অতীতের সকল রসূলই মানুষ ছিলেন। ইতিহাস খুঁজে দেখো। যদি ফেরেশতা পাঠানো হতো তবে ওরা বলতো, এরা তো ফেরেশতা, তারা কি করে মানুষের জন্যে অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারে?

কেয়ামত সম্পর্কে কোরআন বলেছে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন নাকি প্রথমবার সৃষ্টি করা কঠিন? যিনি শূন্য থেকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? কোরআন আরো বলেছে, বসন্তকাল ও শীতকাল এবং তোমাদের দেহের ভেতরের প্রাণইতো এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

**২. আহলে কেতাব**

পৌত্তলিক ছাড়া কোরআনে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে তাদের মধ্যে ইহুদী নাসারা শীর্ষস্থানে রয়েছে। এই ইহুদী ও খৃস্টানদের সম্পর্কেও কোরআন অনেক বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেছে।

**ক. ইহুদী**

ইহুদীরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে শুধু বনি ইসরাঈলের আল্লাহ মনে করতো। তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে সম্মানিত জাতি মনে করতো এবং তাদের ধারণা ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা শুধু তাদেরই ভালোবাসেন এবং একমাত্র তারাই জান্নাত পাবে। যদি আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাঈলকে শাস্তিও দেন তবে সে শাস্তি অল্প দিনের জন্যে দেয়া হবে। তারপর তারা সবাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। নবুওতকে তারা নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি মনে করে রেখেছিলো। তারা এটা কল্পনাই করতে পারতো না যে, বনি ইসমাঈল অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে থেকে কোনো নবী আসতে পারে। তারাও শেরেক অর্থাৎ পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন, তারা হযরত ও ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করতো।

ইহুদীরা তাদের ওপর নাযিল করা আসমানী কেতাবের আয়াতসমূহে কিভাবে বিকৃতি ঘটাতো পবিত্র কোরআন সেটা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছে। তারা অনেক সময় পুরো আয়াতই গোপন করে ফেলতো। আবার অনেক সময় অর্থের বিকৃতি ঘটাতো।

মোটকথা পবিত্র কোরআন ইহুদীদের সমগ্র ইতিহাস বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছে। এবং বলেছে যে, এরা কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মোকাবেলায় অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করেছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মদীনার ইহুদীরা আখেরী নবীর প্রতীক্ষায় ছিলো। যারা ইহুদী নয় তাদের সামনে বনি ইসরাঈলের ইহুদীরা গর্ব করে বলতো যে, প্রতিশ্রুত নবী এলে তোমরা দেখবে কি হয়। প্রতিশ্রুত নবী যখন আবির্ভূত হলেন তখন ওরা সেই নবীকে ওদের কেতাবে বর্ণিত নিদর্শন অনুযায়ী ভালোভাবে চিনতে পেরেও কোমর বেধে তাঁর বিরেধিতা শুরু করলো।



www.nagorikpathagar.org

খ. নাসারা

নাসারা অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী। তারা তাওহীদের আকীদা পাল্টে দিয়েছিলো। তারা একজন মাবুদের তিন সত্তায় বিশ্বাস করতো। রেসালাত সম্পর্কে তারা বিশ্বাস করতো যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর রেসালাত শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ তিনিই ছিলেন শেষ নবী। তারা মনে করতো যে, 'ফারকালিত' সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তবরূপ হচ্ছে হযরত ঈসা (আ.)। তিনি পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন এবং তার অনুসারী উম্মতকে ইনজীলের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ উল্লিখিত ভবিষ্যৎ বাণীতে স্পষ্টত এটা বলা হয়েছিলো যে যিনি আসবেন তিনি হচ্ছেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.) আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

পবিত্র কোরআনে নাসারাদের সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং অতীতের সকল নবী মানুষ ছিলেন।

নাসারাদের বিশ্বাস ছিলো যে হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলী দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে তাদের এ ধারনার প্রতিবাদ করা হয়েছে। উপরন্তু পবিত্র কোরআন হযরত মারইয়াম (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে ইহুদীদের আরোপিত সকল অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইহুদীদের দাবীসমূহ কোরআন ডাহা মিথ্যা বলে সাক্ষ্য দিয়েছে।

কোরআন হযরত ঈসা (আ.)-এর মোজেযা অলৌকিক ঘটনাসমূহ সম্পর্কেও আলোকপাত করেছে এবং বলেছে যে, এসকল মোজেযা আল্লাহর ইচ্ছায়ই প্রকাশ পেয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মোজেযা দেখানোর মতো কোনো শক্তি হযরত ঈসা (আ.) ছিলো না।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইহুদীদের মধ্যে যারা অর্থহীন বিতর্কে অংশগ্রহণ করেনি এবং সত্যান্বেষন ছিলো যাদের মন ও বিবেকে সত্যপ্রীতি বিদ্যমান ছিলো, যারা সত্যের অনুসরণ করেছে পবিত্র কোরআনে তাদের যথাযথ প্রশংসা করা হয়েছে।

৩. 'সাবি' সম্প্রদায়

কোরআন নাযিলের সময় সাবিউনদের একটি ছোটো সম্প্রদায়ও বিদ্যমান ছিলো। এদের কথাও কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাদের বিলুপ্তি ঘটার কারণে কোরআনে তাদের সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত কিছু আলোচনা করা হয়নি। এদের সম্পর্কে একটি অভিমত হচ্ছে, এরা তাওরাতে বিশ্বাসী ছিলো। অন্য অভিমত হচ্ছে এরা ছিলো নাসারাদের একটি ক্ষুদ্র উপদল। তবে তারা যে নক্ষত্রের পূজা করতো এ ব্যাপারে সর্বসম্মত অভিমত পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানীফা (র.) মতে তারা নক্ষত্রকে পূজা করতো না বরং নক্ষত্রকে সম্মান করতো। এছাড়া তারা ফেরেশতা পূজা করতো বলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসীদের চেয়ে যেহেতু এরা পৃথক ছিলো এ কারণে প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর অপবাদ আরোপ করা হতো যে ওরা 'সাবি' হয়ে গেছে। বর্তমানে যেমন আমাদের সমাজে বলা হয় অমুক ওহাবী হয়ে গেছে অমুক বেদয়াতী হয়ে গেছে।



www.nagorikpathagar.org

**৪. সত্যান্বেষী সম্প্রদায়**

উপরোল্লিখিত সম্প্রদায় ছাড়া একটি সত্যান্বেষী সম্প্রদায়ের আবির্ভাবও সে সময় লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। তারা মক্কার পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকতার প্রতি কিছুতেই সমর্থন জানাতে পারেননি। কারণ বিবেকের কোনো সাড়া তারা পাননি। ইতিহাস থেকে জানা যায় মক্কার পৌত্তলিকরা মূর্তির সামনে নাচ গান করে যে সময় উল্লাস প্রকাশ করছিলো সে সময় চারজন সত্যান্বেষী পৌত্তলিকদের কাজের প্রতি খোলাখুলি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা একটি গোপন সভায় মিলিত হন। সেখানে ওরাকা ইবনে নওফেল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, ওসমান ইবনে হুয়াইরেস এবং যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল উপস্থিত ছিলেন। তারা গোপনীয়তা রক্ষা সাপেক্ষে নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর এ অভিমত ব্যক্ত করেন, আমাদের জাতি একটি ভিত্তিহীন বিশ্বাসের ওপর জীবন যাপন করছে। দাদা ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্ম বিশ্বাসকে তারা বরবাদ করে দিয়েছে। তারা পাথরের যে মূর্তির তওয়াফ করছে তারা দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। ভাইয়েরা, নিজেদের মনের গভীরে নযর দিয়ে দেখো, তোমরা অনুভব করবে যে তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াও এবং দ্বীনে ইবরাহীমের সত্যিকার অনুসারীদের খুঁজে বের করো। (সীরাতে ইবনে হেশাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪২)

ওরাকা ইবনে নওফেল এবং যায়েদ ইবনে আমরের রচিত কবিতা সংরক্ষিত রয়েছে। সে সব কবিতায় তাদের সত্যান্বেষণ প্রকাশ পেয়েছে। এদের কেউ কেউ সত্যের সন্ধানে অনেক চেষ্টা করেছেন।

দুনিয়ার অন্যান্য অনেক এলাকায়ও এ ধরনের অস্থির পবিত্র আত্মার সন্ধান পাওয়া যায়। তারাও সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলো। কেউ কেউ শেষ নবী (স.)- এর সন্ধান করেন। তাদের মধ্যেকার কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি নবী করীম (স.)-এর সান্নিধ্যে পৌঁছে ঈমান আনতেও সক্ষম হন।

কোরআন নাযিলের পটভূমি পর্যালোচনা করতে গিয়ে উল্লিখিত স্বল্পসংখ্যক সত্যান্বেষীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। কারণ তারা ছিলেন দুনিয়ার ও মানব সমাজের সত্যপ্রীতি সত্যতৃষ্ণার পবিত্র নিদর্শন। যারা কার্যত শেরেক বা অন্য কোনো ভ্রান্ত আদর্শে বিশ্বাসী ছিলো তাদের মনেও অস্থিরতা বিদ্যমান ছিলো না এমন বলা যায় না। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করা নানা কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমাদের মতে দাওয়াতে হক বা সত্যের দাওয়াত প্রকাশের জন্যে কোনো ঐতিহাসিক লগ্নে এ ধরনের অস্থিরতা ও সত্যতৃষ্ণা একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন।

**৫. মোনাফেক সম্প্রদায়**

ইহুদী নাসারাদের প্রসঙ্গ ছাড়াও পবিত্র কোরআনে মোনাফেক বা কপট বিশ্বাসীদের সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই সম্প্রদায় কোরআন নাযিলের পূর্বেকার পটভূমিতে বিদ্যমান ছিলো না। মক্কী যুগে এদের অস্তিত্বও ছিলো না। হিজরতের পর মদীনায় এদের আবির্ভাব ঘটে। মোনাফেক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সকল নবীর উম্মতদের



www.nagorikpathagar.org

মধ্যে এবং সকল জাতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এরা নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ইসলাম গ্রহণ করতো। এদের কেউ কেউ সন্দেহ বুকে চেপে রেখে ইসলাম গ্রহণ করতো। কেউ কেউ গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে ওঠাবসা করতো। কেউ কেউ জেহাদের কষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করে গনীমতের মালামালের ভাগ পাওয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমান হতো। কেউ কেউ ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে পুনরায় ইসলাম পরিত্যাগ করে ইসলামকে হেয় করতে চাইতো। তারা মনে করতো যে এ রকম করলে ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা বিনষ্ট হবে। অন্যরা মনে করবে যে ইসলাম কোনো উৎকৃষ্ট ও স্থিতিশীল ধর্ম নয়। কেউ কেউ ভরা মজলিসে নবী করীম (স.)-এর বক্তৃতায় হস্তক্ষেপ করতো এবং সঠিক কথা বিকৃত করতো। যেমন 'রা-এ-না' শব্দের উচ্চারণ তারা 'রায়ীনা' করতো। এতে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতো যে, বড় একটা কাজ করে ফেলেছে। পবিত্র কোরআনে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করে তাদের কার্যকলাপকে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে নিরর্থক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এছাড়া তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের পরিণাম হবে কাফেরদের চেয়েও ভয়াবহ, তাদের স্থান হবে দোযখের সর্ব নিম্ন স্তরে।

পবিত্র কোরআনে এদের কার্যকলাপ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেই সব আলোচনার প্রেক্ষিতে যুগে যুগে তাদের পরিচয় জানা সহজ হয় এবং আত্মানুশীলন ও আত্ম সমীক্ষণের পদ্ধতি কোরআন থেকে জেনে নেয়া যায়।❑



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

১৩

# কোরআনে শিক্ষার প্রসার

হাকীম মোহাম্মদ সাঈদ

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু প্রথমেই আমাদের নিজ দেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায় যে, সরকার কি কোরআনের শিক্ষাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছেন? শুধু মুখে মুখে আল্লাহর ও রসূলের এবং কোরআন সুন্নাহর বুলি আওড়িয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যদি কোরআন সুন্নাহর শিক্ষার প্রসারের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করেন, তাহলে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির জন্যে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

নবী করীম (স.)-এর মক্কায় অবস্থান কালেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কোরআনের শিক্ষাদান কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আকাবার প্রথম বাইয়াতের পর নবী (স.) হযরত মোসায়েব ইবনে ওমায়র (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে জনগণকে কোরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে মদীনায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হিজরতের পর মসজিদে নববীতে সুগঠিত একটি পৃথক শিক্ষা দান কেন্দ্র খোলা হয়, তখন আসহাবে রসূল সেখানে দিবারাত কোরআন শিক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। সুনানে ইবনে মাজায় উল্লেখ রয়েছে যে, একদিন নবী করীম (স.) হুজরা থেকে বেরিয়ে মসজিদে নববীতে দুটি পৃথক মজলিস লক্ষ্য করলেন, একটিতে মুসলমানরা কোরআন তেলাওয়াত এবং দোয়া করছিলেন অন্যটিতে কোরআন শিক্ষা চলছিলো। নবী করীম (স.) বললেন, উভয়েই পুণ্যকাজ করছে। একদল তেলাওয়াত ও দোয়া করছে অন্য দল কোরআনের শিক্ষা লাভ করছে। আমি শুধু শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি। একথা বলে নবী করীম (স.) শিক্ষা মজলিসে গিয়ে বসে পড়লেন। সেখানে শিক্ষা পদ্ধতি ছিলো এমন যে, একজন লোক কোরআন মজিদ পাঠ করতো অন্যরা তা শুনতো।

আসহাবে সুফফার সদস্যরা নিতান্ত দরিদ্র এবং দুঃস্থ ছিলেন। তাদের কেউ কেউ দিনের বেলা মিষ্টি পানি ভর্তি করে এবং বনে জঙ্গলে কাঠ কেটে সেগুলো বাজারে বিক্রি করতেন, তারপর সে অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ ব্যস্ততার কারণে দিনে তারা জ্ঞানার্জনের সময় পেতেন না। এ কারণে তারা রাতকে জ্ঞানার্জনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। মোসনাদে ইবনে হাম্বল নামক হাদীস সংকলন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন রাত হতো তখন এসব লোক একজন শিক্ষকের কাছে যেতেন এবং সকাল পর্যন্ত পড়াশোনা করতেন।

এমনিভাবে যারা জ্ঞানার্জনের এক পর্যায় যখন শেষ করতেন তাদেরকে কারী বলা হতো, বাইরের মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দিলে এদের সেখানে পাঠানো হতো। একবার বাইরে থেকে কিছু লোক এসে নবী (স.)-এর কাছে আবেদন জানালেন যে, আমাদের সঙ্গে এদের দিন, আমরা ওদের কাছ থেকে কোরআন হাদীস সুন্নাহ শিক্ষা করবো। নবী করীম (স.) কারী হিসেবে পরিচিত বিখ্যাত ৭০ জন মুসলমানকে তাদের সাথে দিলেন। কিন্তু লোকগুলো ছিলো প্রতারক, তারা ৭০ জন মুসলমানকেই প্রতারিত করে হত্যা করলো। এমনিভাবে মুসলমানদের একটি নিবেদিতপ্রাণ দল শাহাদাত বরণ করলেন।

বাইরে থেকে যোদ্ধা মোহাজেরীন আসলে তারাও আহলে সুফফার অন্তর্ভুক্ত হতেন এবং কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে যেতেন। আবু দাউদ শরীফে হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আসহাবে সুফফার কয়েকজন লোককে কোরআন পড়া এবং লেখা শিক্ষা দিয়েছি। তাদের একজন আমাকে একটি তীর উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন।

মোসনাদে আহমদে উল্লেখ রয়েছে যে, এ ব্যক্তি ছিলেন মোহাজের, তিনি দেশে গিয়ে একটি তীর উপহার পাঠান।



www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক আনসারের ঘরে অতিথি শালার সাথে সাথে একটি পৃথক মক্তবও গড়ে উঠেছিলো। বাইরে থেকে যেসব লোক আসতেন নবী করীম (স.) তাদেরকে আনসারদের দায়িত্বে ন্যস্ত করতেন। তারা আতিথেয়তার সঙ্গে সঙ্গে গভীর আন্তরিকতার সাথে অতিথিদের কোরআন শিক্ষা দিতেন। অতিথিরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফিরে যেতেন এবং বলাবলি করতেন যে, আনসাররা আমাদেরকে দ্বীনের কেতাব এবং নবী (স.)-এর সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছেন।

এমনিভাবে বনি তামিম প্রতিনিধিদল দীর্ঘকাল যাবত মদীনায় কোরআন শিক্ষা করেন।

অনেক সময় মোহাজেরীনদের এ খেদমত আনজাম দিতে হতো। যেমন একজন সাহাবী তায়েফ থেকে এসে নবী করীম (স.)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তাকে তিনি অন্য একজন সাহাবীর দায়িত্বে ন্যাস্ত করেন এবং বলেন সে তার আতিথেয়তা করবে এবং কোরআন শিক্ষা দেবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর নবী করীম (স.) যে সকল গভর্ণর ও আমীর নিয়োগ করেন তাদের প্রথম দায়িত্ব ছিলো কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষাদান করা।

হযরত মায়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের গভর্ণর হিসাবে নবী করীম (স.) প্রেরণ করেন এবং সেখানকার লোকদের কোরআন ও ইসলামের মুলনীতি শিক্ষার দায়িত্বের কথা তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। হযরত মায়ায (রা.) ইয়েমেনে পৌঁছে এক ভাষণে জনগণকে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, কোরআন পাঠের পর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন কে বেহেশতী আর কে দোযখী।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর শাসনামলে কোরআনের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়নি; কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে কোরআন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সমগ্র এলাকায় কোরআন শিক্ষা দেয়ার জন্যে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। যেমন আবু সুফিয়ান নামক এক ব্যক্তিকে বেদুইনদের মধ্যে কোরআন পাঠে সক্ষম লোকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। যারা কোরআন পাঠ জানে না তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যেও খলীফা নির্দেশ দেন। হযরত ওবাদা বিনে সামেত (রা.) নবী (স.)-এর জীবদ্দশায়ই কোরআন শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সিরিয়া বিজয়ের পর সেখানের মুসলমানদের কোরআন শিক্ষা দেয়ার জন্যে হযরত ওমর (রা.) হযরত ওবাদা (রা.)-কে মনোনীত করেন। তার সাথে সহকারী হিসাবে হযরত মায়ায ইবনে জাবাল (রা.) এবং হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-কেও সেখানে প্রেরণ করা হয়। হযরত ওবাদা (রা.) হামলে অবস্থান করেন। হযরত আবুদ্দারদা (রা.) দামেশকে চলে যান।

হযরত মায়ায (রা.) ফিলিস্তিনে যান। পরে হযরত ওবাদা (রা.)-ও ফিলিস্তিন চলে যান। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.)-কে গবর্ণর নিযুক্ত করা হলে তার সাথে হযরত এমরান ইবনে হোসাইনকে ফেকাহ এবং কোরআন শিক্ষা দানের জন্যে পাঠানো হয়।

হযরত ওমর (রা.) কোরআনের চর্চা ও শিক্ষা ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে আরো কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যেমন সূরা আল বাকারা, সূরা আন নেসা, সূরা আল মায়েদা, সূরা আল হজ্জ এবং সূরা আন নূর সম্পর্কে আদেশ দেয়া হয় যে, এ কয়টি সুরা প্রত্যেক মুসলমানকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা করতে হবে। কেননা এসব সূরায় ইসলামের



www.nagorikpathagar.org

মূলনীতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে। খলীফা গভর্ণরদের চিঠি লিখে পাঠান যে, যারা কোরআন শিক্ষা সম্পন্ন করেছে বেতন নির্ধারণের জন্যে যেন তাদের নাম পাঠিয়ে দেয়া হয়।

কোরআন শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সমগ্র মুসলিম জাহানে ব্যাপক ভাবে কোরআনের শিক্ষা প্রসার লাভ করে। একবার আদায়কৃত খাজনার অর্থ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয়ের পর কিছু উদ্বৃত্ত হলে গভর্ণর আবু মূসা আশয়ারী (রা.)-কে হযরত ওমর (রা.) সে অর্থ মদীনায় না পাঠিয়ে কোরআন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার অনুমতি দেন। পরের বছরও এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। আবু মূসা আশয়ারী (রা.) খলীফাকে লিখলেন যে, গত বছর যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো সাতজন, এবার সে সংখ্যা ৭০-এ উন্নীত হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) একবার গভর্ণর আবু মূসা আশায়ারী (রা.)-কে লিখেছিলেন যে, কোরআনের হাফেযদের মদীনায় পাঠিয়ে দাও, আমি তাদেরকে কোরআন শিক্ষার উপযোগী করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করবো। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) জানালেন যে, আমার সেনাবাহিনীতে তিনশতাধিক হাফেযে কোরআন রয়েছেন, সবাইকে পাঠাব কি?

কোরআন যারা শিক্ষা দিতেন তাদের উচ্চারণ এবং ব্যাকরনের জ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হতো।

হযরত ওসমান (রা.)-এর শাসনামলে মুসলমানরা দ্বিতীয়বার আজারবাইজান অধিকার করেন। হযরত ওসমান (রা.) সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্যে কিছু লোককে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে থেকে প্রেরণ করেন। এতে অত্যন্ত সুফল পরিলক্ষিত হয়। হযরত আলী (রা)-এর শাসনকাল পর্যন্ত তারা আজারবাইজানে কোরআন শিক্ষাদান কালে নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত আলী (রা.) দু'হাজার কোরআন শিক্ষার্থীর জন্যে ভাতা বরাদ্দ করেন। হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রা.) সাইপ্রাস জয় করার পর মোজাহেদদের কোরআন শিক্ষার কাজে নিয়োগ করেন, কোনো কোনো সাহাবা ব্যক্তিগতভাবেও বিভিন্ন লোককে কোরআন শিক্ষা দিতেন। হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে কোরআন ও হাদীস শিক্ষা দিতেন। কুফায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কোরআন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্র সিরিয়া গেলে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) তাদের কাছে কোরআন পাঠ শোনেন।

কোরআন শিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে ওপরে আমি যা কিছু আলোচনা করেছি এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোরআন মূলত একটি সমাজ বিধান। পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে কোরআন এক অপরিবর্তনীয় জীবন ব্যবস্থা। পৃথিবীর সকল অঞ্চল, বর্ণ, ভাষার মুসলমানরা এই বিধানের আওতাভুক্ত। এই বিধানের অনুসারী হয়েই সবাইকে জীবন যাপন করতে হবে। কাজেই কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শের প্রসার সার্বজনীন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমেই আমাদের নিজ দেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায় যে, সরকার কি কোরআনের শিক্ষাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছেন? শুধু মুখে মুখে আল্লাহর ও রসূলের এবং কোরআন সুন্নাহর বুলি আওড়িয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যদি কোরআন সুন্নাহর শিক্ষার প্রশারের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করেন, তাহলে আল্লাহর দরবারে অবশ্যই জবাবদিহির জন্যে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।❑



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

১৪

# কোরআনের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

আল্লামা শামসুল হক আফগানী

www.nagorikpathagar.org

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়েও মিসর, সিরিয়া, ইরান, লেবানন প্রভৃতি দেশের কবি সাহিত্যিকরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে, কোরআন এবং ইসলামের শত্রুতার জন্যে তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে, এখনো করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ চাঁদের দেশে পৌঁছুতে তারা সফল হয়েছে। কোরআনের এই যে স্বাতন্ত্র, এর সত্যিই কোনো তুলনা নেই।

www.nagorikpathagar.org

কোরআনে করীম সম্পর্কে আমরা মুসলমানরা দাবী করি যে, এটা আল্লাহর বাণী, কোনো মানুষের বাণী নয়। এ দাবী সুস্পষ্টভাবে বিবেকসম্মত। কোরআনের শব্দ, ভাষা এবং শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটা সত্য। কোনো বাণীর বা কোনো বস্তুর সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে, তা মানুষের সৃষ্টি না স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সৃষ্টি তা ধারণা করা যায়। বিশ্বজগতের ভেতরে বা বাইরে দু'প্রকারের সৃষ্টি বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি, যেমন চাঁদ, সূর্য, আকাশ ইত্যাদি, মানুষের সৃষ্টি যেমন মোটর গাড়ি, সাইকেল ইত্যাদি। এই দু'টি ধারার সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রয়েছে সেটা আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষের সৃষ্টি মানুষের বিবেক বুদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চাঁদ, সূর্য ইত্যাদিকে আমরা মানুষের সৃষ্টি বলি না এবং আল্লাহর সৃষ্টি বলেই উল্লেখ করি। কারণ আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ কলে-কারখানায় চাঁদ সূর্য প্রস্তুত করতে পারেনি, কিন্তু মোটর, সাইকেল ইত্যাদি জিনিস মানুষই সৃষ্টি করে। সৃষ্টির পর সেগুলো সৃষ্টিশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়, মানুষ হাজার বছর ধরে চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও দেড় হাজার বছর পরও আল্লাহর কথার অনুরূপ সামান্য কথাও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। কোনো দিন হবেও না। অথচ একটা কিছু সৃষ্টির জন্যে যা কিছু প্রয়োজন মানুষের কাছে তার সব কিছুই রয়েছে।

আরবী ভাষায় উনত্রিশটি অক্ষর রয়েছে। সেসব অক্ষরের সাহায্যে কোরআন তৈরি হয়েছে। এই অক্ষর কাঠামো চেয়ার টেবিল তৈরির জন্যে ব্যবহৃত কাঠের উপাদানের মতোই প্রয়োজনীয়। কারণ কাঠ ছাড়া চেয়ার টেবিল তৈরি হতে পারে না। একইভাবে আরবী বর্ণমালা জানা ছাড়া কোরআন সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ এসব বর্ণমালা আরবের লোকদের নিকট বিদ্যমান ছিলো তারা এসব বর্ণমালার দ্বারাই কথা বলতো, সাহিত্য রচনা করতো।

দর্জির কাছে প্রয়োজনীয় কাপড় থাকলেও একটি জামা বা শেরোয়ানীর নমুনা বা ডিজাইন যদি না থাকে তবে তা নির্মাণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আরবের লোকদের কাছে কোরআনের ভাষার নমুনা ছিলো, নবী (স.) তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তারা কোরআন সৃষ্টি করতে পারেনি।

আরেকটি জিনিস হচ্ছে, দক্ষতা বা যোগ্যতা। কোনো দর্জির কাছে প্রয়োজনীয় কাপড় এবং নমুনা বা ডিজাইন থাকলেও জামা, শেরোয়ানী তৈরির যোগ্যতা না থাকলে সেটা তৈরি করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আরবের লোকদের আরবী ভাষায় প্রয়োজনীয় এমনকি প্রয়োজনাতিরিক্ত দক্ষতা বা যোগ্যতাও ছিলো, দিন রাত তারা এ কাজেই নিয়োজিত থাকতো, তাদের মাঝে সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ছিলো। পক্ষান্তরে নবী করীম (স.) কোনো প্রকার কাব্য সাহিত্য চর্চার ধারে কাছেও ছিলেন না, তাঁর এ ধরনের কোনো ঝোঁকও ছিলো না।

তাছাড়াও রয়েছে অনুপ্রেরণার বিষয়টি। প্রয়োজনীয় উপাদান এবং যোগ্যতা থাকলেও অনুপ্রেরণা না থাকলে কোনো সৃজনশীল কাজ করা যায় না। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে এর প্রমাণের অভাব নেই। আরবের লোকদের কাছে এই অনুপ্রেরণাও কিন্তু ছিলো। কোরআন অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে চমৎকারভাবে সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলো। কোরআনের স্বাতন্ত্রের দলীয় মোকাবেলা করে, কৃতিত্ব অর্জন করতে কে না চাইতো। কারণ এই কোরআনই আরবের লোকদের পৌত্তলিক ধর্মের, পূর্বপুরুষের অনুসৃত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ



www.nagorikpathagar.org

ঘোষণা করেছিলো। তাদেরকে পরস্পরের বন্ধু কিংবা শত্রুতে পরিণত করেছিলো। এমন পরিস্থিতিতে সৃজনশীলতার অনুপ্রেরণা ছিলো অফুরন্ত, এমন কি পবিত্র কোরআনও তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলো যে 'অনুরূপ একটা সূরা তৈরী করে আনো দেখি!' কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে মক্কার মোশরেকরা সমর প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, যা কিনা বাক যুদ্ধের চেয়েও কঠিন, কারণ যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত, জানমালের দেদার ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, এমতাবস্থায় ঘরে বসে একটা সূরা, নিদেন পক্ষে একটা আয়াত তৈরি করে তারা চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারতো, কিন্তু তাতো পারেইনি বরং যুদ্ধক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়েছে। কোরআন মক্কার কাফেরদের যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে সে চ্যালেঞ্জ শুধু সে কালের জন্যেই নয়, সর্বকালের জন্যে ঘোষিত হয়েছে। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়েও মিসর, সিরিয়া, ইরান, লেবানন প্রভৃতি দেশের কবি সাহিত্যিকরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে, কোরআন এবং ইসলামের শত্রুতার জন্যে তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে, এখনো করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ চাঁদের দেশে পৌঁছুতে তারা সফল হয়েছে। কোরআনের এই যে স্বাতন্ত্র এর সত্যিই কোনো তুলনা নেই।

কোরআনের অনুবাদ শীর্ষক একটি গ্রন্থের ভূমিকায় খৃস্টান পন্ডিত ডক্টর শেল লিখেছেন, কোরআনের মতো স্বতন্ত্র বৈশিষ্টপূর্ণ কেতাব কোনো মানুষের কলম রচনা করতে পারে না। এটা এক পৃথক মোজেযা। মৃতকে জীবন্ত করার চেয়েও এ মোজেযা অধিক উচ্চতর।" (তারীখে ইসলাম, প্রথম খন্ড, আবদুল কাইউম নদবী, পৃষ্ঠা ২২৭-৩৩২)।

পাদ্রী কান্ডার এবং পাদ্রী স্কট বলেছিলেন যে, আরবের লোকেরা কোরআনের মতো গ্রন্থ তৈরী করতে পারতো; কিন্তু তৈরির প্রয়োজন তারা মনে করেনি। এসব পাদ্রী কোরআনের স্বাতন্ত্র স্বীকার করতো না, কিন্তু ডক্টর শেলের উপরোক্ত মন্তব্যে পাদ্রীদের বক্তব্য ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। পাদ্রীদ্বয় যে মন্তব্য করেছেন তার কোনোই যুক্তি নেই, কারণ কোনো মরুভূমিতে তৃষ্ণায় যদি কারো মৃত্যু ঘটে তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে সেখানে পানি ছিলো না, আরবের কাফেররা কোরআনের বিরোধিতার জন্যে জান-মাল ইত্যাদি কি না ব্যয় করেছে। যদি তাদের সত্যিই এমন ক্ষমতা থাকতো, কোরআনের চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার বিন্দুমাত্র যোগ্যতা তাদের থাকতো তবে তারা কি কোরআনের মতো বাণী তৈরি করে কোরআনের স্বাতন্ত্রের দাবী প্রতিহত করতো না? এ প্রশ্নের জবাব কি হবে একজন সাধারণ বুদ্ধিজ্ঞানের অধিকারী মানুষও বলে দিতে পারে, অথচ পাদ্রীদ্বয় কী বললেন। মতিভ্রম আর কাকে বলে?

কোনো ব্যক্তির বা জাতীয় সংসদের রচিত আইন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশে সকল কালে চলতে পারে না। স্থাল কাল পাত্রভেদে তার পরিবর্তন পরিবর্ধন, সংস্কার আবশ্যক। কেননা সে আইন মানবরচিত এবং মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। বহু কিছু তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। দেশে দেশে আইন সংস্কার এবং আইন সংশোধন একটা সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু কোরআনের আইনের প্রবর্তক হলেন আল্লাহ তায়ালা এবং বাহক হলেন হযরত মোহাম্মাদ (স.)। কোনো দল বা জাতীয় সংসদ কর্তৃক এ আইন ঘোষিত হয়নি। তাও হযরত মোহাম্মদ (স.) ছিলেন নিরক্ষর, তিনি কোনো মাদ্রাসা মক্তবে বা অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করার সুযোগ পাননি। কেননা সেকালে আরবে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো না। অথচ



www.nagorikpathagar.org

ইসলামের বিজয়ের পর সেই নবীর প্রচারিত কোরআনের আইন মরক্কো থেকে চীন পর্যন্ত সর্বত্র প্রসার লাভ করে এবং মানবজাতিকে এক চমৎকার জীবন বিধানের ছায়াতলে সমবেত করে। বিগত চৌদ্দশতাধিক বৎসর যাবত এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তার মধ্যে কোনো প্রকার রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংস্কার, পরিমার্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। অথচ আধুনিক বিশ্বের জাতীয় সংসদ সমূহ নিজেদের নতুন প্রণীত আইনের বদলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোরআনের শাশ্বত আইনকেই গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়িত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯২২ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে নারীদের অংশীদারীত্বের অধিকার ছিলো না, কোরআনের শিক্ষার প্রভাবে নারীদের অংশীদারিত্বের অধিকার প্রদান করা হয়। ১৯৩৭ সালে কোরআনের শিক্ষার প্রভাবেই আমেরিকা মদ নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করে এবং মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন বই পুস্তক প্রকাশ করে। অবশ্য চরম মাত্রার মদ্যপ হওয়ার কারণে তারা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সংশোধিত হতে পারেনি। তৃতীয়ত, ইউরোপে তালাককে এক সময় অপরাধ মনে করা হতো, কিন্তু স্বাভাবিক প্রয়োজনেই তারা কোরআনের বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য হয়। এসব উদাহরণ কি প্রমাণ করে না যে, কোরআন আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান থেকে তা উৎসারিত হয়েছে? এবং এ বিধান সকল দেশের সকল কালের মানুষের জন্যে প্রযোজ্য।

কোরআনের বিধান এতো ব্যাপক এবং সকল কালের ও দেশের উপযোগী যে, সময়ের দাবী তাতে চমৎকারভাবে পূর্ণ হয়। জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, কাল কোনো কিছুই এ ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করে না। ইংরেজ ঐতিহাসিক গীবন লিখেছেন, কোরআনে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপযোগী আইন বিদ্যমান রয়েছে। স্যার ড্যামেন্ডবার্গ লিখেছেন, কোরআনের আইন রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ একজন মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্যেই সমান উপযোগী, এতো উপযোগী যে তার কোনো তুলনা নেই।

কোরআন যে ধরনের বিশ্ব পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো তার চেয়ে অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ মানবেতিহাসে আর কখনো ছিলো না। আল্লাহর আইন বিধান এমনভাবে লংঘিত হয়েছিলো যে, সমগ্র বিশ্ব মূর্তিপূজার আখড়ায় পরিণত হয়েছিলো। আল্লাহর সৃষ্টি প্রতিটি বস্তুকেই মানুষ পূজা করতো। অথচ সেসব জিনিসের স্রষ্টার উপাসনা বা পূজাই করা হতো না। মানবাধিকার এমনভাবে নস্যাৎ করা হয়েছিলো যে, সবলেরা দূর্বলের ওপর অত্যাচার করতো এবং এতে গর্ববোধ করতো। তারপর কোরআন অবতীর্ণ হয় এবং তা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আরবদেশে অবতীর্ণ হয়। কোরআন প্রচারের ও প্রসারের জন্যে কোনো সরকারের শক্তি, সম্পদ প্রচারযন্ত্র কার্যকরী ছিলো না এবং কোরআন শিক্ষার জন্যে কোনো অনুকূল পরিবেশও পাওয়া যায়নি। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার এবং নবী (স.)-এর নবুওতের মেয়াদ ছিলো মাত্র তেইশ বৎসর। এর মধ্যে মক্কী জীবনের তেরো বৎসর মক্কার কাফেররা মুসলমানদের কোরআন প্রচারে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তারা মুসলমানদের ওপর অবর্ণনীয় যুলুম নির্যাতন চালায়। হিজরতের পর দশ বৎসর সময়ের মধ্যে আট বৎসর সময়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত কোরআনের বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। এ সময়ে প্রায় চল্লিশটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কোরআনের প্রভাবের প্লাবন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই বাধানো হয়েছিলো। যুদ্ধ এমন একটি ব্যাপার যার প্রতিশোধ স্পৃহা



www.nagorikpathagar.org

দীর্ঘকাল পর্যন্ত মনে জাগরুক থাকে। মক্কা বিজয় থেকে নবী (স.)-এর ওফাত পর্যন্ত প্রায় দু'বছর সময় কোরআন তার প্রভাব বিস্তারের জন্যে স্বাধীন কর্মক্ষেত্র লাভ করে। কিন্তু সেটা এমন এক জাতির মধ্যে ছিলো যাদের মন-মগজ কোরআনের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের কারণ ছিলো ক্ষতবিক্ষত। সে ক্ষত এখনো মুছে যায়নি, কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কোরআন আরবের জনগণের ওপর এতো প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, বিদায় হজ্বে আটশ হাজার বাহ্যত তারা যদিও মানুষ ছিলেন কিন্তু অন্তরের পবিত্রতায় তারা ছিলেন ফেরেশতা। এটা ছিলো কোরআনেরই সৃষ্টি। এই দুবছরের মধ্যে দশ লক্ষ বর্গ মাইলের আরব ভূখন্ড তাওহীদের আলো এবং সচ্চরিত্রের আলোয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। পৃথিবীতে কোনো গ্রন্থ কোনো দল বা কোনো সরকার সম্পর্কে কি এরূপ স্বল্প সময়ে এতো বিরাট বিপ্লবের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়? এতেই বোঝা যায় যে, কোরআন আল্লাহর কেতাব এবং আল্লাহর কুদরতের অভিব্যক্তি, কুদরতের নিদর্শন কোরআনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। আর এ কারনেই কোরআন এমনি মহাবিপ্লব সাধনে সক্ষম হয়েছিলো।

কোরআন নাযিলের পূর্বের এবং পরবর্তীকালের আরবের মধ্যে তুলনা করুন। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরব জাতি ছিলো সকল জাতির চেয়ে দূর্বল, কোনো জাতিই তাদের পাত্তা দিতো না, কিন্তু কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর আরব জাতি পৃথিবীর দুই বৃহৎশক্তি রোম এবং ইরানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং অধিকৃত দেশের ভূখন্ডই শুধু নয় বরং তাদের মনের উপরও অধিকার বিস্তার করেছিলো। শুধু রোম এবং ইরানের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য সকল অধিকৃত দেশের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য মুসলমানদের বিজিত সকল ভূখন্ডেই মুসলমানরা ভূখন্ড এবং অন্তকরণ দুটোর ওপরই অধিকার বিস্তার করেছিলো। এই বিজয়ের কারণ কী ছিলো? বস্তুবাদী কোনো কারণ ছিলো– না অদৃশ্য ও আধ্যাত্মিক উপাদান ছিলো? বস্তুবাদী শক্তির দিক থেকে আরবের লোকদের কিছুই ছিলো না, সে শক্তি ছিলো তাদের প্রতিপক্ষ রোম ও ইরানের, কেননা রাজনৈতিক বিজয়ের বস্তুগত উপাদান, সৈন্য সংখ্যা, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অর্থ, সম্পদ, রসদ সামগ্রী, শারীরিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এসব কিছুই রোমক এবং ইরানীদের ছিলো। পক্ষান্তরে আরবের লোকেরা ছিলো সংখ্যায় কম, তাদের অস্ত্রবলও তেমন ছিলো না, শারীরিক দিক থেকেও ছিলো অপেক্ষাকৃত দূর্বল, তবুও তারাই জয়লাভ করেছে। এতেই বুঝা যায় যে, কোরআন ছিলো আল্লাহর বাণী এবং আরবদের বিজয় কোরআনেরই সৃষ্টি। এই আধ্যাত্মিক শক্তির কাছেই শত্রুরা পরাজিত হয়েছে, কেননা জনবল অস্ত্রবলের দিক থেকে তারা তো তাদের চেয়ে এগিয়ে ছিলো না। আত্মিক শক্তি ও আল্লাহর সাহায্যই আসলে মীমাংসাকারী। যুদ্ধাস্ত্র স্বয়ং যুদ্ধ করে না বরং মানুষ তাদের ব্যবহার করে, আত্মিক শক্তির প্রাচুর্যই মুসলমানদের বিজয়ের পথ খুলে দিয়েছিলো।

মক্কা এক উষর মরুভূমির দেশ, কাবাঘর মক্কায় অবস্থিত হওয়ার মধ্যেও আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছা কার্যকর রয়েছে। যদি মক্কা ফুলে ফলে ঝর্ণধারায় সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরম কোনো জায়গা হতো তাহলে হজ্জযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিধর্মীরা বলে বেড়াতো যে, ওরা তো বৎসরান্তে বনভোজন করতে যায়, আনন্দ করতে যায়; কিন্তু এখন কেউ তা বলে না। কারণ সবাই জানে যে, মক্কায় যারা যায় তারা পরম করুনাময় আল্লাহর প্রেমে



www.nagorikpathagar.org

মাতোয়ারা হয়েই যায়, বনভোজন বা প্রমোদ ভ্রমণে যায় না। পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে এতো বেশী সংখ্যক মানুষ সমবেত হয় না। একইভাবে যদি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা, অর্থ সম্পদ বৈভব দ্বারা প্রচার করা হতো যে, এটাতো সরকারের ক্ষমতা এবং অর্থ সম্পদের কারণেই হয়েছে, এর মধ্যে নিবেদিত চিত্ততার কোনো অভিব্যাক্তি নেই। কোরআনের হেফাযতের দায়িত্ব নিজের ওপরে রেখে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিসন্দেহে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার হেফাযত করবো।

সমগ্র ইউরোপ মিলে বাইবেলের পৃষ্ঠপোষকতা করছে কিন্তু বাইবেলের একজন হাফেয কোথাও নেই, এমনকি এমন কোনো সংস্করণ নেই যার ওপর সমগ্র খৃস্টানরা একমত। এটা আজকের সবারই জানা কথা যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর কিছুকাল পর থেকেই বাইবেলের বহু সংস্করণ বিকৃতভাবে তৈরী হয়েছে। চারটি বাইবেল একত্রিত করে একটার সাথে আরেকটার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা সবারই জানা কথা যে, অনুসারীরা অদ্ভুত কায়দায় একটি বাইবেল বাছাই করেছিলো। একটি টেবিলে চার প্রকারের চারটি বাইবেল রেখে টেবিল ধরে নাড়া দিয়েছিলো, যেগুলো নীচে পড়ে গেছে সেগুলো পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটা হাস্যকর ব্যাপার নয় কি? এমনি একটি গ্রন্থ কোরআনের সাথে কিছুতেই তুলনীয় হতে পারে না। পক্ষান্তরে কোরআনের একই অবিকৃত রূপ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এবং যে কোনো ইসলামী সমাবেশে বহু সংখ্যক হাফেয পাওয়া যায়। এটা এ কারণেই সম্ভব হয়েছে যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই কোরআনের হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহর সৃষ্টি আসমান যমীন, চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্রের মোকাবেলা করা কোনো মানুষের পক্ষে যেমন সম্ভব নয় তেমনি আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যের মোকাবেলাও কেউ করতে পারে না। চৌদ্দশতাধিক বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু কোরআন এখনো সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, নবী করীম (স.)-এর ইন্তেকালের পর একটি আয়াতও বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়নি যা দেখিয়ে বিধর্মীরা কোরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেভাবে কোরআন নাযিল করেছেন এখনো তা তেমনি রয়েছে।

পৃথিবীতে কতো বিপ্লব কতো ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এরই মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, চেঙ্গিস খান হালাকু খান ইসলামের অনুসারীদের পাইকারীভাবে হত্যা করেছে, ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলতে চেয়েছে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ লক্ষাধিক আলেম, কোরআনের হাফেয নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে, ইংরেজ জাতি প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করেছে, কিন্তু এরা কেউই কোরআনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি, আল্লাহ তায়ালা সর্বতোভাবেই কোরআনের হেফাযত করেছেন। আর কোরআনে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন, 'আল্লাহর চেয়ে কথার দিক থেকে কে অধিক সত্যবাদী হতে পারে?'

আজ মুসলমানরা কোরআন থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের উন্নতি অগ্রগতির চিন্তা করছে, অথচ তারা জানেনা সাময়িক উন্নতি লাভ হলেও প্রকৃত উন্নতি কোরআনের



www.nagorikpathagar.org

অনুসরণ ছাড়া সম্ভব নয়। সব কাজ, সব আমোদ-প্রমোদ করার জন্যে আমরা সময় পাই কিন্তু কোরআনের প্রসঙ্গে অনেকেই নিবৃত মনোভাব প্রকাশ করি। কেউ কেউ তো এমনও বলে ফেলে যে, কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এসব তো মৌলভীদের কাজ, তারা ওসব করলেই পারে। নাউযুবিল্লাহ! যদি মহানবীর দোয়া না থাকতো তবে এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিদ্রুপের শাস্তি স্বরূপ এসব লোকের চেহারা শুকর বানরের মতো হয়ে যেতো' কিন্তু পৃথিবীতে তা হয় না। কারণ নবী করীম (স.) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, ইয়া আল্লাহ, আমার উম্মতকে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করো। দুঃখের বিষয়, মুসলমানরা কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করেই বেধড়ক এসব কথা বলে ফেলে, ইমাম বোখারী তার হাদীস গ্রন্থে 'সৎ কাজ বিনষ্ট হওয়া শীর্ষক' একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। কিরূপ কাজ করলে এবং কিরূপ কথা বললে অতীতের নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। সে অধ্যায়ে তার উল্লেখ রয়েছে, হযরত হাসান কারখী সব সময় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকতেন যে, বেফাঁস কথা বলে ফেলে অতীতের পূন্যসমূহ নষ্ট করে দিয়ে রিক্ত না হয়ে পড়েন। এমন অনেক কথা রয়েছে যা বললে ঈমান আমল নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য ও কুদরত চিরন্তন ও শাশ্বত যেসব মানুষ আল্লাহর রঙে নিজেদের রঙিন করে তিনি তাদেরকেও অবিনশ্বর করে রাখেন। আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়ার জন্যে আল্লাহর কোরআনকে ভালোবাসতে হবে, তার শিক্ষা ও আদর্শ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে হবে। আর এটাই মুসলমানদের ঈমানের দাবী।

হযরত শাহ আবদুল কাদের দেহলবী (র.) প্রায় সারা জীবন কোরআনের তাফসীর করে, শিক্ষা দিয়ে কাটিয়েছেন। জনাব ফজলুর রহমান সাহেব কাশফের অধিকারী একজন বুযুর্গ ছিলেন, তিনি শাহ সাহেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, জীবনের শেষ সময়ে হাদীস তেলাওয়াত করবেন। ফজলুর রহমান নিজেও হাদীসে নবীর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি শাহ সাহেবের ইন্তেকালের পর জানিয়েছিলেন যে, শাহ আবদুল কাদেরের দাফনের সময় চারিদিকের চৌদ্দবর্গ মাইল এলাকায় কবর আযাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এক জনের জন্যে প্রজ্জলিত বৈদ্যুতিক বাতি বা চালু করা বৈদ্যুতিক পাখায় অনেকেই যেমন উপকৃত হতে পারে এটাও ঠিক তেমনি।

শায়খুল হিন্দ (র.) সারা জীবন কোরআন হাদীসের তথা আল্লাহর দ্বীনের সেবা করে গিয়েছেন অথচ তাকে সর্বোৎকৃষ্ট দ্বীনী খেদমত সম্পর্কে বিজ্ঞাসা করলে অশ্রু সজল চোখে তিনি বলেছিলেন, আমি শাহ আবদুল কাদেরের তরজমা সহজভাবে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেছি, কেয়ামতের দিন এই খেদমত নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবো। অথচ আমাদের স্বাধীনতা লাভের পেছনে শায়খুল হিন্দ (র.)-এর অবদান পরিমাপ করার মতো নয়। ইংরেজ সরকার তার সম্পর্কে বলেছিলো, যদি আমরা তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেই, তার ছাই থেকেও বৃটিশ বিরোধিতার আওয়ায উত্থিত হবে। রোলেট কমিটির রিপোর্ট ভারতের ইংরেজ বিরোধী সমগ্র তৎপরতার জন্যে শায়খুল হিন্দকে দায়ী করা হয়েছিলো।

লাহোরের মাওলানা আহমদ আলী চল্লিশ পঞ্চাশ বছর একাধারে পবিত্র কোরআনের দরস দিয়েছিলেন, ইন্তেকালের পর তার কবরের মাটি থেকে অত্যন্ত মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে



www.nagorikpathagar.org

পড়ছিলো। হাজার হাজার মানুষ সে মাটির সুঘ্রাণ আহরণ করেছেন। ইমাম বোখারী (র.) সারা জীবন হাদীসের সেবা করে গিয়েছিলেন, তার ইন্তেকালের পর ছয় মাস পর্যন্ত তার কবর থেকে সুবাস ছড়িয়ে পড়েছিলো।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে তার সবই আল্লাহর পবিত্রতা প্রকাশ করে।' আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার দোষমুক্ত। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য, চাঁদ, সূর্যের আলো, নক্ষত্রের মিটিমিটি হাসি সৌন্দর্য সবই তাঁর সৃষ্টি। যারা আল্লাহকে প্রতিটি কথা ও কাজে আস্বীকার করে তারাও স্বীকার করে যে এ সব কিছু আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওই মোশরেকদের যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো যে, এই যমীন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে? তারা জবাব দেবে যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন।

বর্তমান বিশ্বের দিকে দিকে ইসলামী আদর্শবিরোধী হাজারো মতবাদ কালো হাত বিছিয়ে দিয়ে যায়, মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, অথচ একদা যখন সকল মানবাত্মাকে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমিই কি তোমাদের একমাত্র প্রভু নই? সবাই জবাব দিয়েছিলো হাঁ। ফেরাউন সারা জীবন নিজেকে খোদা বলে দাবী করেছিলো, কিন্তু মৃত্যু মুহূর্তে বলেছিলো, আমি মূসা ও হারুনের প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম, কিন্তু তার সে সময়ের ঈমান কোনো কাজে আসেনি। সব কিছুর একটা সময় আছে। আসুন, আমরা নিজেদের জীবনের সুবর্ণ সময়ে পবিত্র কোরআনের ভালোবাসায় আল্লাহর রঙে নিজেদের রঙিন করে তুলি।❑



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

১৫

# কোরআনের চরিত্র গঠন পদ্ধতি

মাওলানা সামিউল হক

www.nagorikpathagar.org

অধ্যাপক আর্নল্ড লিখেছেন, রাশিয়ার জার ইসলাম গ্রহণ করতে রাযি হয়েছিলেন, তবে তিনি শর্ত দিয়েছিলেন মদ্যপান ত্যাগ করতে পারবেন না। সমকালীন আলেম সমাজ এ শর্ত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে জার খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু যদি এতো কঠোর না হয়ে নবী (স.)-এর সহনশীল আচরণের অনুসারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন তাহলে বর্তমানে রাশিয়ার অবস্থা হয়তো ভিন্নরকম হতো।

www.nagorikpathagar.org

চরিত্র গঠন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, অসহায়তা দূরীকরণের জন্যে কোরআন মানুষের মন মানসিকতা সামাজিক পরিবেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক তাগিদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে। যে ক্ষেত্রে কঠোর হওয়া প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে কঠোর হয়েছে, আর যে ক্ষেত্রে নরমভাবে কথা বলা প্রয়োজন সে, ক্ষেত্রে তাই করেছে। কোরআনের প্রতিটি আদেশ-উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রেই মানুষের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ঘৃন্য স্বভাবের মানুষকে ধীরে ধীরে পবিত্রতার প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। এতে করে হঠকারি, অবাধ্য মানুষ সচ্চরিত্রের মুর্তমান প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী ইসলামী শরীয়তের এ সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ এবং আভিজাত্যের সব কিছুই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রতি চারিত্রিক মূল্যবোধসমূহ একই সাথে একই সময়ে আরোপ করেননি বরং ধীরে ধীরে করেছেন।

অন্যান্য আসমানী কেতাবের চেয়ে কোরআনের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হলো কোরআন একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি এরং দীর্ঘ তেইশ বছরে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। পারস্পরিক শত্রুতা, ক্রোধের অভিব্যক্তি সকল প্রকার চারিত্রিক অধপতনের মূল। কোরআন শিক্ষা দিয়েছে যে, ভালোবাসা, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তোমার শত্রুদের দুর্ব্যবহার ভালোবাসা ও সহৃদয়তায় পরিবর্তিত হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, মন্দের জবাব মন্দ দ্বারা দিয়ো না, বরং যা তার চেয়ে ভালো তা দিয়ে জবাব দাও। এতে তুমি দেখতে পাবে, তোমার এবং তোমার শত্রুর মধ্যেকার শত্রুতা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে।

চরিত্র গঠনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং পর্যায়ক্রমিক যে সংস্কার পদ্ধতি কোরআন গ্রহণ করেছে, মদ নিষিদ্ধকরণের ঘটনা পর্যালোচনা করলে তার কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। মদ পান সকল অপকর্ম ও দুস্কৃতির মুল। মদ পানের কারণে মানুষ মিথ্যাবাদী হয়ে পড়ে, তার বিবেক বুদ্ধির ভারসাম্য নষ্ট হয়; পারস্পরিক শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, মানসিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে যায়, সামাজিক জীবন ও দাম্পত্য জীবনে ধ্বংস নেমে আসে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসার ঘটে। নৈতিক চরিত্রসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। শুধু যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা অর্থাৎ ব্যভিচারের কথাই ধরুন। বৃটেনের সামাজিক গবেষণা পরিষদ অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যভিচার এবং সামাজিক দুর্নীতির প্রধান কারণ হিসেবে বেপরোয়া মদ্যপানের কথা উল্লেখ করেছে।

এই মদ্যপানকে কোরআনে হঠাৎ করে একটি অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং মদ্যপানের অপকারিতার প্রতি প্রথমে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মদ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে চারটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, আরবের লোকেরা দীর্ঘকাল থেকে মদ্যপানে অভ্যস্ত, হঠাৎ করে মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া মদ নিষিদ্ধ করলে তাদের পক্ষে নিষেধাজ্ঞা মেনে চলা কষ্টকর হবে। এ কারণে পর্যায়ক্রমে মদ্যপান করাকে মহাপাপ, অপবিত্র কাজ, শয়তানী তৎপরতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানদের বুঝানো হয়েছে যে, মদ পান করিয়ে জুয়া খেলায় লিপ্ত করিয়ে, শয়তান তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর স্মরণ



www.nagorikpathagar.org

থেকে তোমাদের গাফেল করে দিতে চায়। পর্যায়ক্রমিক এ শিক্ষা পদ্ধতির চমৎকার সুফল ফলেছে। মুসলমানরা মদের অপকারিতা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হওয়ার পর মদ স্পর্শ করাও গর্হিত কাজ মনে করেছে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখতে পাই? কোনো ধর্ম বা কোনো সংস্কারকরাই মদ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ফলে ভারতীয়, মিশরীয়, গ্রীক, রোমক, ইসরাইল ও খৃষ্ট ধর্মেও মদ নিষিদ্ধ নয়। খৃস্টান ধর্মে তো মদকে তাদের উপাসনার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। গীর্জায় দাঁড়িয়ে মদ পান করা তাদের দৃষ্টিতে পুণ্যের কাজ। হিন্দুধর্মে দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্যে মদের প্রসাদ দান করা হয়। এতে পবিত্রতা আরোপের জন্যে তারা মদকে গঙ্গাজল নামেও অভিহিত করে।

আমেরিকা আইন করে মদ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছে, কিন্তু মদপান হ্রাস পাওয়ার বদলে বরং আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। মদ তৈরির জন্যে লক্ষ লক্ষ্য বেআইনী কারখানা গড়ে উঠেছে, আইন ভাঙ্গার জন্যে মদ্যপায়ীদের যেন জেদ চেপে গিয়েছিলো, ফলে সরকারকে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে। কোরআনের মদ্যপান নিষিদ্ধকরণের পদ্ধতিতে, তার সুফলে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজি ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মূর বলেছেন, ইসলাম এটা গর্বের সাথে বলতে পারে যে, মদ নিষিদ্ধ করণে তার যে সাফল্য অন্য কোনো ধর্মেই তা লক্ষ্য করা যায় না। ডক্টর বিটুম, অধ্যাপক টয়েনবী প্রমুখ ইংরেজ মনীষীও কোরআনের এ অনুপম শিক্ষার উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন।

পর্দার বিধান আরোপের ক্ষেত্রেও পবিত্র কোরআন এমনি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। নবী করীম (স.) এর জীবনে এমনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতির অসংখ্য চমৎকার উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। মসজিদে নববীতে একবার এক বেদুইন প্রস্রাব করতে শুরু করেছিলো, সাহবায়ে কেরাম লোকটিকে ভর্ৎসনা করতে চাইলেন, নবী (স.) বললেন, না ওকে ওর কাজ শেষ করতে দাও। প্রস্রাব শেষ করার পর নবী (স.) লোকটিকে ডেকে বললেন, ভাই এটা মসজিদ, এবাদাত করার জায়গা, এখানে ও ধরনের কাজ করা ঠিক নয়। লোকটি মাথা নুইয়ে ফেললো। নবী করীম (স.) প্রস্রাবের জায়গায় পানি ঢেলে ধুয়ে দেয়ার জন্যে সাহবাদের আদেশ দিলেন।

এক ইহুদী একবার এসে নবী করীম (স.)-কে অন্যায়ভাবে কোনো এক ব্যাপারে কটুকথা বলতে শুরু করলো। হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে সমুচিত জবাব দিতে চাইলেন। কিন্তু নবী (স.) তাকে বারণ করলেন, বললেন, ওকে কঠোর ভাষায় শাসন না করে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্যে নমনীয়ভাবে উপদেশ দিলেই ভালো হয়। কঠোরতার চেয়ে উদারতা উত্তম। নবী করীম (স.) বিভিন্নভাবে সাহাবাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন। একবার এক যুবক নবী করীম (স.) এর কাছে এসে ব্যভিচারের অনুমতি চাইলো। সাহাবায়ে কেরাম খুবই বিরক্ত হলেন, তারা যুবকটিকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, কিন্তু নবী (স.) সাহাবাদের বারণ করলেন এবং যুবকটিকে তাঁর কাছে ডেকে ব্যভিচারের কুফল তার মনে বদ্ধমূল করার জন্যে বললেন, তুমি যে দুষ্কৃতির অনুমতি চাইছো, তোমার মা, বোন, খালা ফুফু বা কন্যার সাথে কেউ এ কাজ করতে চাইলে তুমি তা পছন্দ করবে? যুবক বললো, কিছুতেই নয়। নবী (স.) তখন যুবকের মাথায় হাত বুলিয়ে রাব্বুল আলামীন আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ওর গুনাহ মাফ করে দাও এবং ওর লজ্জাশীলতাকে হেফাযত করো। একবার কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণের



www.nagorikpathagar.org

জন্যে শর্ত দিলো যে, তারা শুধু দু'ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। নবী (স.) তাদের জন্যে সাময়িকভাবে এ শর্ত অনুমোদন করলেন এই ভেবে যে, কাফের থাকার চেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে দু'ওয়াক্ত নামায আদায় করাও উত্তম। বনু সাকিফ গোত্রের এক প্রতিনিধিদলও এ ধরনের একটি শর্ত দিয়েছিলো। নবী (স.) এই ভেবে মেনে নিয়েছিলেন যে, ইসলামের প্রভাবে এরা ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের বিধি বিধান মেনে চলবে। এখন এরা ঈমানের তাৎপর্য বুঝতে না পারার কারণেই এরূপ শর্ত দিচ্ছে। অবশেষে তাই হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর ওরা ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সকল এবাদতই করতে শুরু করেছিলো। এ সকল উদাহরণ দ্বারা ইসলামের সহনশীলতার নীতি ও আদর্শ সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু এ আদর্শের যথাযথ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই ইসলামের দাওয়াতী অভিযানগুলো যথাযথ সুফল দানে সক্ষম হয় না।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সহনশীলতার এই নীতি মানা ও এর যথাযথ প্রয়োগে ব্যর্থ হওয়ায় মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধ্যাপক আর্নল্ড লিখেছেন, রাশিয়ার জার ইসলাম গ্রহণ করতে রাযি হয়েছিলেন, তবে তিনি শর্ত দিয়েছিলেন মদ্যপান ত্যাগ করতে পারবেন না। সমকালীন আলেম সমাজ এ শর্ত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে জার খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু যদি এতো কঠোর না হয়ে নবী (স.)-এর সহনশীল আচরণের অনুসারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন তাহলে বর্তমানে রাশিয়ার অবস্থা হয়তো ভিন্নরকম হতো। তবে আল্লাহর যা করণীয় তা তিনি ঠিকই করতেন। তবে সহনশীলতার অর্থ এটা কিছুতেই নয় যে, ইসলাম কোনো ধর্মদ্রোহী কাফেরের সবকিছুকে সমর্থন করে, বরং এর তাৎপর্য হলো কুফুর, শেরেক, মূর্খতা ইত্যাদি মৌলিক নষ্টামীসমূহ প্রতিরোধ করা, এতে অন্যান্য দুষ্কৃতিসমূহ আপনা থেকেই শুধরে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একব্যক্তি নবী করীম (স.)-এর দরবারে এসে বললো, আমার অনেক দোষ রয়েছে। আমি মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী। আমি ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক তবে আপাতত একটা অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারবো। নবী (স.) তাকে সকল পাপের মূল মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানালেন। লোকটির কাছে এটা খুবই সহজ মনে হলো। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, মিথ্যা বলতে না পারার কারণে তার অন্যসব স্বভাবও ধীরে ধীরে শুধরে গেল।

নবী করীম (স.) হযরত আবু মুসা আশয়ারী এবং হযরত মায়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে তাদের ইয়েমেন যাত্রার সময়ে বললেন, জনগণকে সুসংবাদ দেবে, তাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করবে না, সহনশীলতা অবলম্বন করবে, কঠোরতার আশ্রয় নিবে না, পরস্পর সহযোগিতা করবে, আনুগত্যের পরিচয় দেবে, বিভেদ সৃষ্টি করো না। প্রথমে ঈমান ও ইসলাম তারপর নামায, তারপর যাকাত, তারপর রোযা শিক্ষা দেবে।

নবী করীম (স.)-এর এ উপদেশ সাহাবায়ে কেরাম যথাযথ পালন করেছিলেন, ফলে তারা চমৎকার সাফল্যও অর্জন করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-এর এ পদ্ধতির প্রসংশা করে বলেন, সুতরাং আল্লাহর পরম অনুগ্রহ যে, তুমি ওদের প্রতি দয়াদ্র রয়েছো। যদি তুমি রূঢ় মেযাজ ও কঠিন হৃদয় হতে তবে অবশ্যই ওরা তোমার কাছ থেকে সরে যেতো। সুতরাং ওদের দোষ ক্ষমা করো এবং আল্লাহর কাছে তাদের গুনাহের ক্ষমা চাও। (আলে-ইমরান)



www.nagorikpathagar.org

কোরআনে করীম এবং ইসলামের চরিত্র গঠন পদ্ধতির আর একটি বিশেষত্ব হলো তার ব্যাপকতা। শুধুমাত্র নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন এবং দুশ্চরিত্রতা প্রতিরোধের মধ্যেই ইসলাম তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখেনি। নৈতিক চরিত্র গঠনকে ইসলাম শুধু ব্যক্তির জন্যেই অপরিহার্য করেনি, বরং যে গুনবৈশিষ্ট্য ইহকালীন, পারলৌকিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। নৈতিক চরিত্রের শিক্ষাকে পাড়া প্রতিবেশী, অনাথ, অসুস্থ, শাসক-শাসিত, চেনা-অচেনা সবার ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত করেছে। এমনি করে সমগ্র মানবজাতি তো বটেই পশু-পাখি জীবজন্তুর ক্ষেত্রেও তার প্রয়োগ ঘটিয়েছে। জীবনের সকল দিক ও বিভাগে, ওঠা, বসা, চলা-ফেরায়, পানাহার, শয়ন বিশ্রাম, পায়খানা প্রসাব, মোসাফের থাকা অবস্থায়, মুকিম থাকা অবস্থায় আনন্দে-বেদনায় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই নৈতিকতার এ শিক্ষা প্রসারিত।

পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মে নৈতিকতাকে মনে করা হয় ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্ম, রাজনীতি শাসন কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এই নীতি-নৈতিকতাকে অচল বলে উড়িয়ে দেয়া হয়। খৃস্টানদের একটি প্রসিদ্ধ কথা হলো, রাজ্য আল্লাহর আর রাজত্ব বাদশাহর। আরো বলে যে, পোপের অংশ পোপকে দাও, বাদশাহর অংশ বাদশাহকে দাও। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবিক মুল্যবোধকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করে এবং মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনকে নীতি-নৈতিকতার বালাই মুক্ত বলে মনে করে। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো আদর্শেরই সর্বব্যাপী হওয়ার যোগ্যতা নেই এবং সেসব আদর্শের অনুসরণে একটি পবিত্র ও আদর্শ সমাজ গঠন অসম্ভব।

নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের অন্যান্য শিক্ষাদাতারা বিশেষ কোনো দেশ বা জাতি বা গোত্রের মধ্যেই তাদের শিক্ষা সীমিত রেখেছেন। তারা সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে হেদায়াত করার চিন্তা করেননি। এরিস্টেটলকে নৈতিকতার এক বড় শিক্ষাগুরু মনে করা হয়, কিন্তু তিনি তার সমগ্র তৎপরতা গ্রীক এবং যারা গ্রীক নয় তাদের পার্থক্যের মধ্যে সীমিত রেখেছেন। যারা গ্রীক নয় তাদের সাথে পশুসুলভ আচরণকেও এরিস্টেটল সঙ্গত মনে করতেন। এরিস্টেটলের অনুসরণে গ্রীক দার্শনিকরা নৈতিকভাবে যে তালিকা তৈরী করেছেন তার মধ্যে প্রথম হলো দেশপ্রেম। কিন্তু এই দেশপ্রেমের সংজ্ঞাও এতো সীমিত পরিসরের মধ্যে কার্যকরী ছিলো যে, কেউ যদি বলতো, আমি শুধু আমার দেশ নয় সমগ্র গ্রীসকে ভালোবাসি তবে তাকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখা হতো। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার অবস্থাও একই রকম, এ সভ্যতার ভিত্তিই হলো জাতীয়তাবাদ ও দেশ প্রেমের আদর্শের ওপর। আমেরিকা নিজেকে মানবাধিকার বিধি প্রণেতা বলে গর্ব করে কিন্তু সেখানে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে যে ব্যবহার করে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের পরিচয় দেয় তা সত্যিই অমানবিক! শিক্ষা ও সংস্কৃতির কোনো ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে একত্রিত হতে পারে না। ফ্লোরিডা রাজ্যে তো শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের পাঠ্য সূচীতেও পার্থক্য রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের পথ ও পদ্ধতি কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে নিষিদ্ধ।

আমেরিকার কোনো রাজ্যেই শ্বেতাঙ্গদের সাথে কৃষ্ণাঙ্গদের বিবাহ স্বীকৃত নয়, যদি কৃষাঙ্গের গায়ে এক অর্ধমাংশ শ্বেতাঙ্গ রক্তের ধারা থাকে তবুও নয়। চৌদ্দটি রাজ্যে রেলগাড়ী, বাস, মোটর হাসপাতাল, টেলিফোন কক্ষেও এ বর্ণবৈষম্য অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের অবস্থা দেখুন, সেখানেও জাতিভেদ প্রথারই প্রাধান্য। ইরান এবং জাপানের প্রাচীন সভ্যতায় সম্রাট এবং তার পরিবার সকল নীতি নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলো। সম্রাট এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেকার এ বৈষম্য বৃটেন এবং জাপানে এখনো প্রচলিত রয়েছে। ইংল্যান্ডের আইন উল্লেখ রয়েছে যে, বাদশাহ সকল প্রকার আইনের শাসন থেকে মুক্ত। কিন্তু ইসলামী আইনে সকল মানুষের সাথে একই রকম ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামে সকল মানুষকে, বিশ্বের সকল সৃষ্টিকে আল্লাহর পরিবার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে করে সকল মানুষের প্রতি চারিত্রিক ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সমান ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বংশ বর্ণ, দেশ, জাতি বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণেই কোনো মানুষ শ্রেষ্ঠ নয় বরং শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হলো তাকওয়া বা পরহেযগারী। আল্লাহকে ভয় করেই, আল্লাহর বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করেই এই তাকওয়া বা পরহেযগারী অর্জন করা যায়। সমাজের উচুঁ নীচু, বড় ছোট সকল শ্রেণীর মানুষের ওপরই ইসলামের নৈতিকতার বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তারপর তোমাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। আল্লাহর কাছে তোমাদের সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।'

বস্তুগত কোনো উপায় উপকরণ, বৈষয়িক কোনো শ্রেষ্ঠত্বই আল্লাহর কাছে কাজে আসবে না, পারলৌকিক মুক্তির জন্যে শুধু সৎ কাজই কাজে আসবে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন, অতপর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন কোনো সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং একে অন্যকে জিজ্ঞাসাও করবে না।

আল্লাহ তয়ালা কোরআনে আরো বলেন, কেয়ামতের দিন তোমাদের গোত্র-পরিচয় এবং তোমাদের সন্তান কিছুতেই কাজে আসবে না। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন এবং তোমরা যা করছো আল্লাহ তায়ালা তা দেখতে পাচ্ছেন।

উল্লিখিত আয়াতসমুহ ব্যতিত কোরআনে আরো অনেক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে যে, কেয়ামতের দিন শুধু ঈমান এবং সৎকাজই কাজে আসবে।

এবাদাতের দ্বারাও ইসলামে সাম্যবাদের শিক্ষা প্রচার ও প্রয়োগ করা হয়েছে। নবী (স.)-এর মাধ্যমে সকল প্রকার জাতি-বর্ণ-গোত্রীয় বৈষম্যের অবষাণ ঘটানো হয়েছে। নবী (স.) ঘোষণা করেছেন, অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হলো জ্ঞান এবং তাকওয়া।

চরিত্র গঠনের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোরআনে করীমে কারো প্রতিই কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব করেনি, বরং পরিপুর্ণ সাম্য রক্ষা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, হে ঈমানদাররা, তোমরা ইনসাফের ওপর অটল থাকো, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের বা তোমাদের পিতামাতা বা নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে যায়।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, কোনো জাতির শত্রুতা যেন তোমাদের সুবিচার পরিত্যাগের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। সুবিচার করো নিসন্দেহে এটা তাকওয়ার সবচেয়ে বেশী কাছাকাছি।



www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, আমি আমার রসূলকে নিদর্শনসমুহসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে কেতাব ও মীযান অবতীর্ণ করেছি যেন লোকেরা সোজা পথে সুবিচারের ওপর থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা দাঁড়িপাল্লা এজন্যে রেখেছেন যে, ওযনে কারচুপি করো না এবং সঠিকভাবে সুবিচারের সাথে ওযন করো এবং ওযনে কম করো না।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন এবং সঠিকভাবে দাঁড়িপাল্লায় ওযন করো, এটা উত্তম কেননা এর ফলাফল কল্যাণকর।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা সুবিচার এবং কল্যাণের আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, সুবিচার করো এটা পরহেযগারীর কাছাকাছি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি বলো, আমি আল্লাহর অবতীর্ণ সকল কেতাবের ওপর ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে সুবিচার করার জন্যে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।

নবী করীম ইসলামের সাম্যনীতি এবং সীমারেখা প্রণয়নের ও তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতার উদাহরণ পরিবার ও সমাজ জীবন থেকেই শুরু করেছিলেন। বিদায় হজ্জের খোতবায় নবী করীম (স.) সকল প্রকার জাহেলী রেওয়ায পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর পরিবারের জাহেলী যুগের হত্যার প্রতিশোধ, সূদ ইত্যাদি রহিত বলে জানিয়ে দিয়েছেন। চুরি একটা নৈতিক অপরাধ। একবার চুরির অপরাধে কোরায়শ বংশের একজন মহিলা দোষী সাব্যস্ত হয়। তাকে চুরির যথার্থ শাস্তি না দেয়ার জন্যে কয়েকজন সাহাবা নবী (স.)-এর কাছে সুপারিশ করেন। নবী (স.) বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা তাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিদের অপরাধ প্রমাণিত হলে গুরুত্ব দিতো, কিন্তু সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা অপরাধ করলে তাদের কিছুই বলা বা করা হতো না। আল্লাহর কসম, আমার কন্যা ফাতেমাও যদি এ অপরাধ করে তবে আমি আল্লাহর আইন অনুযায়ী তার হাত কেটে দেবো।

নবী করীম (স.) একবার বলেছেন, হে লোক সকল, তোমরা শোনো, কেয়ামতের দিন সেই সব লোকই আমার প্রিয় হবে যারা জীবদ্দশায়-আল্লাহকে ভয় করেছে। আত্মীয়-স্বজন হওয়া সত্ত্বেও তোমরা আমার প্রিয় হবে না। তোমরা আমার নাম উচ্চারণ করে করে সেদিন বলবে, হে মোহাম্মদ (স.) আমরা অমুকের সন্তান, কিন্তু আমি বলবো, তোমাদের পরিবার কি তা তো শুনলাম কিন্তু তোমাদের আমল কোথায়? তোমরা আল্লাহর কেতাবকে উপেক্ষা করেছো, এখন যাও তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

কোরআনের চরিত্রগঠন পদ্ধতির এই সাম্য ও সমতার কারণেই ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, সমকালীন খলীফা বা শাসনকর্তা একজন দরিদ্র প্রজার অভিযোগের জবাবদিহির জন্যে তারই সাথে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন, তারপর কাযী বিচারের যে রায় দিয়েছেন সে রায় মাথা পেতে নিয়েছেন।

গভীর অভিনিবেশ সহকারে কোরআনের চরিত্র গঠন পদ্ধতি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, তাতে মানুষের স্বভাব প্রকৃতির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোরআন মানবচরিত্রকে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো গড়ে তুলতে চায় একজন মানুষের বাহ্যিক



www.nagorikpathagar.org

কাজ কর্মেই তার অন্তর্গত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। এটাই কোরআনের শিক্ষা। এখানে একটি উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিসন্দেহে মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার নারী, এবাদতকারী পুরুষ এবং এবাদতকারিনী নারী, সত্যবাদী পুরুষ এবং সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ এবং ধৈর্যশীল নারী, আল্লাহভীরু পুরুষ এবং আল্লাহভীরু নারী, সদকা-খয়রাতকারী পুরুষ এবং সদকা-খয়রাতকারিনী নারী, আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ এবং আল্লাহকে স্মরণকারিনী নারী, আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে ক্ষমা এবং বিরাট সওয়াব রেখেছেন।

এ আয়াতে দশটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। ইসলাম, ঈমান, এবাদত, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, আল্লাহভীতি, দান-খয়রাত রোযা, লজ্জাস্থান হেফাযত, আল্লাহর স্মরণ। এগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চরিত্র এবং এবাদাতের মূল উৎসধারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস, এর প্রথম স্থানে ঈমান, দ্বিতীয় স্থানে ইসলাম রয়েছে। তারপর আল্লাহর বন্দেগী বা এবাদতের স্থান। আল্লাহভীরুতা সৃষ্টির পর মানুষের কথা ও কাজে সত্যতার প্রকাশ ঘটে। উল্লিখিত গুণাবলীর মধ্যে চারটি বিষয়, যথা ঈমান, বন্দেগী, ধৈর্য, অন্তকরণের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া ইসলাম সত্যবাদিতা, দান-খয়রাত, রোযা এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত বাহ্যিক আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথমোক্ত চারটি পরবর্তী চারটির পরিপূরক। ঈমানের জন্যে ইসলাম, এবাদত-বন্দেগীর রোযা ও আল্লাহর স্মরণের জন্যে লজ্জাস্থানের হেফাযত প্রকাশ্য দলিল বা অভিব্যক্তি। পাশবিক কার্যাবলী এবং রিপু তাড়িত কার্যাবলী থেকে বিরত থাকার জন্যে কোরআনে নানাভাবে আল্লাহ তায়ালা আদেশ উপদেশ দিয়েছেন। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সুবিচার ও অনুগ্রহশীলতার আদেশ দিচ্ছেন এবং মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিচ্ছেন।

কোরআনের চরিত্র গঠন পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, কোরআনে এ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের কথা আল্লাহ রব্বুল আলামীন বারবার উল্লেখ করেছেন। শুধু রসমীভাবে চারিত্রিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেই কোরআন বিরত থাকেনি বরং যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের মন-মগজে সে বিধানের গুরুত্ব বিশেষভাবে খোদাই করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাকওয়া বা খোদাভীতি ইসলামের চারিত্রিক গুণাবলীর মূলমন্ত্র।

কোরআনে করীমে 'ইত্তাকু' 'মোত্তাকীন', 'ইত্তাকুন' 'ইত্তাকা' অর্থাৎ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি সম্পর্কিত এহসান বা অনুগ্রহশীলতার কথা ৯৪ জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাকাব্বুর বা অহংকার না করার উপকারিতা এবং অংহকারের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে ৩০ বার উল্লেখ করা হয়েছে। ধৈর্যশীলতা সম্পর্কে ৪৬ বার উল্লেখ করা হয়েছে। তাওয়াক্কুল সম্পর্কে ২৩ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যুলুম অত্যাচার সম্পর্কে বিভিন্নভাবে ১১৯ বার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রসঙ্গেও এসব বিষয়ে আরো আলোচনা সন্নিবেশিত রয়েছে। চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কিত এসব বিষয় এতো বেশী আলোচনার কারণ হলো মানুষের মনে এসব গুণবৈশিষ্টের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তাদের অন্তরে গেঁথে দেয়া।

কোরআনের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহের কিছু কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। এবার কোরআনের একটি বিশেষ বৈশিষ্টের প্রতি আলোকপাত করবো।



www.nagorikpathagar.org

কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো এ পবিত্র গ্রন্থ নবী করীম (স.)-এর জীবনাদর্শের মধ্যদিয়ে বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছে। অন্য কোনো গ্রন্থ বা কোনো চরিত্র গঠন নীতির এমন সম্পর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন পৃথিবীতে ইতিহাসের কোনোকালেই খুঁজে পাওয়া যায় না। নবী করীম (স.) ব্যতীত অন্যান্য নবীদের জীবনাদর্শ তাদের আনীত কেতাব সমূহে উল্লেখ তো নেই-ই; উপরন্তু সেসব নবীর অনুসারীরা তাদের নবীর শিক্ষাকে নানাভাবে বিকৃত করে দিয়েছে। সেসব নবীর অনুসারীরা তাদের নবীর শিক্ষাকে নানাভাবে রদবদল করে নবীদের সাথে বিশ্বাসঘাকতার পরিচয় দিয়েছে। একমাত্র কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শই অবিকৃত অবস্থায় বাস্তবায়িত হয়েছে। কোরআন অন্য সব নবীদের এবং তাদের আনীত ধর্ম গ্রন্থসমূহের প্রতিও যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেছে। কোরআন শিক্ষা দিয়েছে যে, সকল নবীই সম্পূর্ণ দোষমুক্ত এবং উন্নত স্বভাবচরিত্রের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু সেসব নবীদের জীবনের কোনো অনুসরণযোগ্য আদর্শ তাদের উম্মতদের নিকট বিদ্যমান নেই। শুধু তাই নয়, এরিস্টেটল, প্লেটো ও কৃষ্ণ প্রমুখ সমাজ-সংস্কারকের জীবনের যে আদর্শ আমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে সেসব শিক্ষাও কিছুতেই নিষ্কলুষ নয়। সেসব আদর্শ দেখে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা যায় না। সমগ্র বিশ্বে একমাত্র মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর জীবনের সকল দিকই বিশ্ববাসীর সামনে উন্মুক্ত ও উন্মোচিত রয়েছে এবং তার জীবনের আদর্শে শুধু আলোকের সমাহারই রয়েছে। তিনি ছিলেন 'সিরাজুম মুনীর' বা আলোকোজ্জ্বল সূর্য। নবী (স.)-এর ঘৃণ্য দুশমনও তাঁর জীবনের কোনো কথা কোনো কাজের বিরূপ সমালোচনা করতে পারেনি। কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শের দর্পন ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী, তিনি ছিলেন উন্নত ও প্রশংসনীয় চরিত্রের অত্যুজ্জল আদর্শ। নবী করীম (স.)-এর চরিত্রই ছিলো কোরআনের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। মানবজাতির জন্যে ইসলামের মহান অবদান হলো ইসলাম শুধু নীতি কথা বা তত্ত্ব কথাসমৃদ্ধ জীবন ব্যবস্থা নয়, বরং এর বাস্তব উদাহরণও বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। নবী করীম (স.)-এর পবিত্র জীবনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে এমন মহান ও নন্দিত আদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে, যে আদর্শ সামনে রেখে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে। নবী (স.)-এর জীবনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে একটি স্বচ্ছ দর্পণ রয়েছে, সেই দর্পণে কোরআনের সমগ্র নীতিমালার বাস্তবায়ন রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-এর আদর্শকে সর্বোত্তম আদর্শ বলে সম্মানিত করেছেন। তার চরিত্রের রুপরেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) প্রশ্নকারীকে বলেছিলেন, তুমি কি কোরআন পড়োনি? কোরআনই তো ছিলো নবী (স.)-এর চরিত্র। নবী করীম (স.) বলেছেন, আমাকে কেতাব দেয়া হয়েছে এবং তার অনুরূপ অন্য কিছুও। এই অন্য কিছু হলো তাঁর পবিত্র চরিত্র। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

কোরআনের শিক্ষার যে নমুনা বা আদর্শ মহানবী (স.) উপস্থাপন করেছেন ইতিহাসে তার কোনো উপমা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু নবী (স.) নিজেই কোরআনের আদর্শে গড়ে উঠেননি একটি সম্প্রদায়কেও সেই মহান আদর্শে গড়ে তুলেছেন। তারা ছিলেন নবী (স.)-এর আদর্শের মূর্ত প্রতীক। সূরা 'ফাতাহ'তে আল্লাহ রব্বুল আলামীন চমৎকারভাবে এ সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন,



www.nagorikpathagar.org

'মোহাম্মদ আল্লাহ তায়ালার রসূল, অন্য যে সব লোক তার সাথে আছে তারা (নীতির প্রশ্নে) কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, (আবার) তারা নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল, তুমি (যখনই) তাদের দেখবে, (দেখবে) তারা রুকু ও সেজদাবনত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার সন্তুষ্টি কামনা করছে, তাদের (বাহ্যিক) চেহারায়ও এই (আনুগত্য ও) সেজদার চিহ্ন (রয়েছে)। তাদের উদাহরণ হচ্ছে-যেমন (বর্ণিত হয়েছে) তাওরাতে, (তেমনি) তাদের উদাহরণ (রয়েছে) ইঞ্জিলেও, (আর তা হচ্ছে) যেমন একটি বীজ-যা থেকে বেরিয়ে আসে একটি (ছোট্ট) কিশলয়, অতপর তা শক্ত ও মোটা তাজা হয় এবং (পরে) স্বীয় কান্ডের ওপর তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, (চারাগাছটির এ অবস্থা তখন) চাষীর মনকে খুশীতে উৎফুল্ল করে তোলে। (এইভাবে একটি মোমেন সম্প্রদায়ের পরিশীলনের ঘটনা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মনে (হিংসা ও) অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, (আবার) এদের মাঝে যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তাঁর ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

মানব ইতিহাসে একমাত্র কোরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সাধন করেছে এবং কোরআনের সেই মহান শিক্ষা সকল যুগে সকল পরিস্থিতিতে নতুন করে মানব জাতির প্রয়োজনের সাথে খাপ খেয়ে সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আজকের অশান্ত বিশ্বের মানুষ শান্তির জন্যে দিশেহারা, এমনি পরিস্থিতিতে একমাত্র পবিত্র কোরআনই মানবজাতিকে দিতে পারে ইপ্সিত অনাবিল শান্তি ও অপরিমেয় কল্যাণ।❑



www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

১৬

# কোরআন ও আধুনিক যুগের দাবী

মোহাম্মদ আইয়ুব খান চুগতাই

www.nagorikpathagar.org

আমরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, যতোদিন চোখে দৃষ্টিশক্তি, কানে শোনার ক্ষমতা রয়েছে, মুখে কথা বলার সামর্থ রয়েছে, পায়ে চলার শক্তি রয়েছে ততোদিন নিজেরা কোরআন পড়বো অন্যকে পড়াবো, নিজেরা কোরআন বুঝবো অন্যকে বোঝাবো, কোরআনকে ভালোবাসবো অন্যদের কোরআনের প্রতি ভালোবাসাবো তবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে আমাদের কল্যাণ ও মুক্তি হবে নিশ্চিত।

www.nagorikpathagar.org

কোরআনের ব্যবস্থা আধুনিক যুগের দাবী ও প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও ভবিষ্যতের সকল যুগের দাবী ও প্রয়োজন মেটানোর পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। কোরআনের সত্যতায় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ গ্রন্থ মানুষের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি একটি এমন গ্রনন্থ যা আজকের আণবিক যুগের যাবতীয় দাবী ও প্রয়োজন পূরণের পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। সুতরাং সফলতা পেতে হলে কোরআনের মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা আমাদের যথাযথ উপলব্ধি করতে হবে। এমন যেন না হয় যে 'খোদ বদলতে নাহি কোরআনকো বদল দেতে হ্যাঁয়।' অর্থাৎ নিজে বদলাইনা কিন্তু কোরআনকে বদলে ফেলি।

**কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য**

এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, আধুনিক যুগের মুসলমানরা জাতিগতভাবে কোরআন থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গেছে। বিশেষত প্রত্যেকে জাতির প্রধান শক্তি, উজ্জ্বল নক্ষত্র যুব সমাজ কোরঅনের সাথে পরিচিত হতে পারেনি বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। তারা নিজেরা ধর্মহীনতার শিকার হয়ে অন্যদেরও দলে টানার চেষ্টায় নিয়োজিত। জনসাধারণের একাংশ হেদায়াত ও আমলের জন্যে নয় বরং বরকত লাভের জন্যেই কোরআন তেলাওয়াত করে। আলেম সমাজের একাংশ কোরআনকে মাসলা-মাসায়েল সমস্যার সমাধান রূপে তুলে ধরেন। অথচ কোরআনেই এ গ্রন্থ নাযিলের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

আমি এ মোবারক গ্রন্থটি তোমার ওপর নাযিল করেছি, যাতে করে মানুষ এর আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানবান লোকেরা (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৩৯)

এ আয়াতে বরকতসম্পন্ন আল্লাহর কেতাবকে গভীর অভিনেবেশ সহকারে পাঠ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর উপায়, মৃত্যু কষ্ট দূর করার উপায়, বিতর্কিত মাসায়েলের সমাধান রূপে গ্রহণ করতে বলা হয়নি। কোরআনের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে, এর ভাব ভাষা বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তবে কি এরা কোরআন সম্পর্কে (কোনোরকম চিন্তা) গবেষণা করে না! না কি এদের অন্তরসমূহের ওপর তালা ঝুলে আছে। (সূরা মোহাম্মদ আয়াত ২৪)

উপরোক্ত আয়াতে পবিত্র ও বরকতসম্পন্ন বলে উল্লেখ করে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র এ গ্রন্থকে ঈমানদারদের জন্যে শেফা ও রহমত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে নসীহত (বিশিষ্ট কেতাব) এসেছে, মানুষের অন্তরে যে সব ব্যাধি রয়েছে, (এটা) তার প্রতিকার এবং মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত। (হে নবী) তুমি বলো, মানুষের উচিত আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের কারণে আনন্দ প্রকাশ করা, কারণ তারা যা কিছু (জ্ঞান ও সম্পদ) জমা করেছে তার চাইতে এটা অনেক ভালো। (সূরা ইউনুস আয়াত ৫৭-৫৮)



www.nagorikpathagar.org

আমাদের সৃষ্টিকর্তা বলেছেন কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্যে রহমত, মোমেনদের জন্যে প্রতিষেধক এবং কোরআন অবতরনে আনন্দ প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আমরা মুসলমানরা অনেকে বলার সাহস দেখাচ্ছি যে, কোরআন সেকেলে হয়ে গেছে এখন আর এ গ্রন্থের কোনো প্রয়োজন নেই। এ গ্রন্থ আধুনিক যুগের দাবী ও প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। বর্তমান যুগের সমাস্যার সাথে এ গ্রন্থকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে।

এসব লোকের কথা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে এটাও বলতে হবে যে, আল্লাহর প্রয়োজন (নাউযুবিল্লাহ) এখন আর অবশিষ্ট নেই, আল্লাহ তায়ালা সেকেলে হয়ে পড়েছেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা চিরজীবী, চিরস্থায়ী। শুধু তাই নয়, আমাদের প্রিয় নবীর প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে হবে এবং বলতে হবে যে তিনি এবং তার নবুওত এযুগের জন্যে প্রযোজ্য নয়। কাজেই এযুগের প্রয়োজন পূরণের জন্যে মোহাম্মদ (স.) হায়াতুন নবী নন বরং এখন নতুন কোনো নবী প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ চিন্তা করা সুস্পষ্ট কুফুরী ও গোমরাহী। কেননা নবী করীম (স.)-এর পবিত্র সত্তা 'সিরাজুম মুনীর' অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা। সেই আলোকবর্তিকার উদয়েরও প্রয়োজন নেই অস্ত যাওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। কাজেই 'খাতামুন নবী'র আনীত কোরআন উজ্জ্বল, তার শিক্ষা উজ্জ্বল তার দেহ পবিত্র উজ্জ্বল এবং জীবন্ত ও সম্মানিত। আল্লাহর পবিত্র সত্তাও সেকেলে নয়, তাঁর প্রেরিত নবীও সেকেলে নয়, কোরআনের শিক্ষা নবীর শিক্ষাও সেকেলে নয়।

কেয়ামত পর্যন্ত কোরআনের শিক্ষা উজ্জ্বল থাকবে এবং বিশ্বমানবতার সকল প্রয়োজন ও তাকিদ, বিজ্ঞানের নতুন নতুন উন্নতি আবিষ্কার ও সাফল্য সব কিছুই কোরআনের শিক্ষার অধীনেই সম্ভব হয়েছে।

**কোরআনের আমানত**

এটা মনে রাখতে হবে যে, কোরআনের এই মূল্যবান আমানত মানবজাতির কাছে এমন ব্যক্তি নিয়ে এসেছেন যিনি ছিলেন মানবকুল শিরোমনি, যাকে খলীফাতুল আরদ বলা হয়েছে। এ আমানতের দায়িত্ব ছিলো আল্লাহর ভালোবাসার বহিপ্রকাশ। কাজেই বস্তুতপক্ষে আল্লাহর ভালোবাসাই মানুষের ওপর ন্যাস্ত হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাই ঘোষণা করেছেন, নিসন্দেহে আমি মানুষকে সবচেয়ে উত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি।

কোরআন অবতরণের মাধ্যমে মুসলমানদের খেলাফতের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমান হয়েও আমাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে আমরা কোরআনের আদর্শ ও শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছি এবং ইসলামী শরীয়ত নিয়ে রশিকতা করতে শুরু করেছি। কোরআন সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলতে শুরু করেছি। এ কারণেই আমাদের দুঃখ ও দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখনো সময় আছে, আমরা সত্যিকার অর্থে কোরআনের ওয়ারিশ হতে পারি। আমরা ইকবালের ভাষায় এমন হতে পারি-

'কি মোহাম্মদ চে ওফা তুনে তো হাম তেরে হ্যাঁয়
ইয়ে জাহাঁ চিজ হায় কেয়া লওহে কলম তেরে হ্যাঁয়।'

অর্থাৎ তোমরা যদি মোহাম্মদের আনুগত্য করো তবে হে বান্দা স্বয়ং আমি তোমার হয়ে যাবে এ দুনিয়া তো তুচ্ছ ব্যাপার লওহ কলম সবাই তোমার।



www.nagorikpathagar.org

আমরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, যতোদিন চোখে দৃষ্টি, কানে শোনার ক্ষমতা রয়েছে, মুখে কথা বলার শক্তি রয়েছে, পায়ে চলার শক্তি রয়েছে ততোদিন নিজেরা কোরআন পড়বো অন্যকে পড়াবো, নিজেরা কোরআন বুঝবো অন্যকে বোঝাবো, কোরআনকে ভালোবাসবো অন্যদের কোরআনের প্রতি ভালোবাসাবো তবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে আমাদের কল্যাণ ও মুক্তি হবে নিশ্চিত।

**তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল**

'তোমরাই (এ দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, নিজেরাও তোমরা আল্লাহর ওপর (পুরোপুরি) ঈমান আনবে। আমি (তোমাদের আগে) যাদের কাছে কেতাব পাঠিয়েছি, তারা যদি (সত্যি সত্যিই) ঈমান আনতো তাহলে এটা তাদের জন্যে কতোই না ভালো হতো! তাদের মধ্যে কিছু ঈমানদার ব্যক্তিও রয়েছে, তবে এদের অধিকাংশই হচ্ছে খারাপ প্রকৃতির লোক।' (সূরা আলে ইমরান আয়াত ১১০)

কথা হলো অন্যকে মন্দ কাজের ব্যাপারে কিভাবে নিষেধ করবো, আমরা নিজেরাই মন্দ কাজে জড়িয়ে আছি, সৎকাজের আদেশ দেয়ার প্রবণতা ও সৎসাহস দিনে দিনে লোপ পাচ্ছে। অন্যের দুয়ারে আমরা শক্তি ও সাহস খুঁজে বেড়াচ্ছি। অথচ দুনিয়ার একশত কোটি মুসলমান যদি আজ মাথা উচু করে কালেমা তাওহীদের তাকবীর নিয়ে উঠে দাঁড়ায় তবে তারা যে অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

কোনো জাতি যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মূলমন্ত্র উচ্চারণের পর এ পবিত্র কালেমার দাবী অনুযায়ী কাজ করে তাহলে তারা নিজেদের মধ্যেকার নিহিত সুপ্তশক্তি সাহস জাগ্রত করে তুলতে পারে। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের কারণে এ জাতির অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বের জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। পরাধীন হওয়ার পরিবর্তে এ জাতি নেতৃত্ব কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে। ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্ব তাদের পদানত হতে পারে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ সত্যের সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আজ আমরা নিজেদের শক্তি সাহস হারিয়ে ফেলেছি, ইসলামের প্রাণশক্তি এখন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। বিশ্ব নবীর উন্নত আদর্শ আমরা বিস্মৃত হয়েছি, ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ আমাদের জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে আমরা যে শ্রেষ্ঠ দল এবং বিশ্ব মানবের কল্যাণেই যে আমাদের আবির্ভাব সে সত্য ও বাস্তবতা থেকে আমরা যোজন যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। এ অবস্থার অবসান দরকার।

**মূর্খতার একটি নিদর্শন**

জেহালত বা মুর্খতার একটা নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের কোনো নিদর্শনের কথা বলা হলে প্রাচীন রসম-রেওয়ায এবং বাপদাদার রীতি-নীতির উদাহরণ দেয়া হয়। যেমন ইসলামের শত্রুরা কোরআন নাযিল হওয়ার পর ইসলামের দাওয়াত পেয়ে বলতো, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসৃত রীতি-নীতি অনুযায়ীই জীবন যাপন করবো, কখনো বলতো, ওসব তো অতীতের লোকদের কেসসা-কাহিনী।



www.nagorikpathagar.org

তবে জাহেলিয়াত বা মূর্খতা বলতে শুধু ইসলাম পূর্ব আরবের অনৈসলামী জীবনকেই বোঝাবে না বরং কোরআন সুন্নাহ পরিপন্থী যে কোনো জীবন ব্যবস্থাই জাহেলীয়াত বা মূর্খতা, সে মূর্খতা দ্বারা আরবের ইসলাম- পূর্ব জীবন ব্যবস্থা, ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদ, প্রাচীন মিসরের ফেরাউনী জীবনধারা, গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এবং কম্যুনিজমের আদর্শও বোঝাবে। মোটকথা বিশ্বজাহানের একক সার্বভৌম মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া জীবন ব্যবস্থার পরিপন্থী জীবন যাপন, সেটা প্রাচীন হোক বা আধুনিক কালের হোক সবই মুর্খতা বা জেহালতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা যে জীবন ব্যবস্থা কোরআনের তাকিদ ও দাবীর পরিপন্থী এবং কোরআনের প্রাণশক্তির পরিপন্থী, এ ধরনের জীবন ব্যবস্থাকেই কুফুরী বলা হয়।

আল্লাহর দ্বীন অস্বীকার করাকেই কুফুরী বলে না বরং কুফুরী ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক সকল ক্ষেত্রেই একটি স্বতন্ত্র জীবন ধারার প্রচারক। কাজেই ইসলাম ও কুফুরীর সহ অবস্থান কখনোই সম্ভব নয়। একজন মানুষ একই সময়ে মুসলমান এবং কাফের হতে পারে না, ইসলাম ও কুফুরী উভয় জীবন ধারার অনুসরণ একই সময় সম্ভব নয়। একারণেই পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।'

মুসলমান দাবী করা সত্ত্বেও যারা অন্যান্য মতাদর্শ ইযমের ও মূর্খতার চর্চা করছে, ইসলামের আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যান্য আদর্শের মধ্যে কল্যাণ খুঁজছে এখানে তাদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা ইসলাম গ্রহণের পর অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা বা আদর্শের দ্বারস্থ এবং মুখাপেক্ষী হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, এধরনের পরমুখাপেক্ষিতা আত্মপ্রতারণা বৈ কিছু নয়।

**কোরআন শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা**

কোরআন শব্দ 'কারাআ' শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ জমা করা, পাঠকরা এবং ঘোষণা করা। কোরআন এমন ঘোষণা যা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা ও আদর্শের ঘোষণা হিসেবে স্বীকৃত। কোরআন শব্দের অর্থ এটাও বলা হয়েছে, যে গ্রন্থ সকল আসমানী গ্রন্থের সারনির্যাস, সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মুলমন্ত্র। সূরা ইউসুফের শেষাংশে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন,

'অবশ্যই (অতীতের) জাতিসমূহের কাহিনীতে জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে। (কোরআনের) এসব কথা কোনো মনগড়া গল্প নয়, বরং এ হচ্ছে তারই স্পষ্ট সমর্থন যে আসমানী কেতাব তাদের কাছে আগে থেকেই মজুদ রয়েছে, বরং (তাতে রয়েছে) প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত (ও সঠিক) ব্যাখ্যা। (সর্বোপরি এতে রয়েছে) ঈমানদার মানুষদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।'

এতে বোঝা যায় কোরআনে অন্য কোনো নবীর সুসংবাদ দেয়া হয়নি, যেমন নাকি পূর্বে আসমানী কেতাবসমূহে নবী করীম (স.) সম্পর্কে সুসংবাদ রয়েছে। এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী সকল নবীর সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং ঈমানদারদের জন্যে রহমত ও হেদায়াতের সুসংবাদ রয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

অনুগ্রহ ও পথনির্দেশ সম্বলিত বাণী কোনো বিশেষ যুগের সীমারেখায় আবদ্ধ নয় বরং সকল যুগের ও সকল মানুষের জন্যে তা প্রযোজ্য। এ পবিত্র বাণী যিনি প্রচার করেছেন তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'সিরাজুম মুনির' বা উজ্জল আলোকবর্তি বলে। পবিত্র কোরআন নিজেই এ সাক্ষ্য দিয়েছে। বস্তুত কোরআন উজ্জল, মহান ও অনস্বীকার্য আয়াতের সমষ্টি, যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে এ আয়াত তাদের দারাই বোঝা সম্ভব।

কোরআনে তাওহীদ তথা ইসলামী শরীয়ত এবং অনেক ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় কোরআন অবতরণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা হামীম সাজদায় বলেন,

'এবং যদি কোরআন 'আজমী' (অনারব) ভাষায় অবতীর্ণ করতাম তবে নিশ্চয়ই তারা বলতো যে, কেন তার আয়াতসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়নি? আজমী (অনারব) কেতাব কি আরববাসীর জন্যে? তুমি বলো, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্যে এই কোরআন পথপ্রদর্শক ও মহৌষধ এবং যারা ঈমানদার নয় তাদের কানে বধিরতা বিদ্যমান, এটা তাদের জন্যে অন্ধকার। (পর্দা, এ কারণেই সত্যকথা শোনা সত্তেও) তারা এর সাথে এমন আচরণ করে) যেন তাদের অনেক দূর থেকে ডাকা হচ্ছে (তাই কিছুই বুছতে পারছে না)

সূরা শূরার প্রথম রুকুতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এবং এভাবেই আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মক্কাবাসী ও তার আশপাশের লোকদের ভয় প্রদর্শন করতে পারো। আরো তুমি ভয় প্রদর্শন করবে সে হাশরের দিনের, যে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একদল বেহেশতবাসী হতে অন্যদল যাবে জাহান্নামে।'

**একটি প্রশ্ন ও তার জবাব**

যারা বলে যে কোরআন সেকেলে গ্রন্থ, নবুওতের প্রয়োজন এখন আর নেই তারা বিতর্ক তোলে যে, কোরআন যদি সত্যি সত্যি আধুনিক যুগের দাবী ও প্রয়োজন পূরণে সকক্ষম হয়ে থাকে তবে নবী করীম (স.) এটম বোমা ও এধরনের অন্যান্য বিষয়ে কেন কোনো কথা বলেননি? তবে কি তিনি ভবিষ্যতের বাস্তবতা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না? এ ধরনের বিতর্ক তোলা লোকদের উদ্দেশ্যে বলছি, শুধু শেষ নবী হযরত মোহাম্মদই নন সকল নবীই এ ধরনের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কেননা বিশেষজ্ঞদের মতে আল্লাহ তায়ালা সকল নবীকেই অদৃশ্য অনেক কিছু দেখিয়েছেন। আমরা যা কিছু না দেখে বিশ্বাস করি আম্বিয়ায়ে কেরাম সেসব কিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

নবী করীম হযরত মোহাম্মদ (স.) বিজ্ঞানের খুটিনাটি এ কারণেই ব্যাখ্যা করেননি যেহেতু যুগের দাবী তা ছিলোনা। সূরা নাহলে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা প্রথমে তোমাকে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখাবেন এবং তুমি সেসব দেখে চিনতে পারবে। ওরা যা করে তোমার প্রতিপালক সে সম্পর্কে বে খবর নন।'

নবী করীম (স.) যদি আজকের এসব বাস্তবতা সম্পর্কে সেই যুগে মন্তব্য পেশ করতেন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশ করতেন, তবে সে সময়ের লোকেরা কিছুতেই সঠিকভাবে তা বুঝতে পারতো না বরং বিশ্রান্ত হয়ে পড়তো। এতে দাওয়াতের মুল উদ্দেশ্যই ব্যাহত



www.nagorikpathagar.org

হতো। শরীয়তি কার্যাবলী এবং তাওহীদী আদর্শ সম্পর্কে কারো মনোযোগ থাকতো না। যে ঈমান বিল গায়েবের প্রতি দাওয়াত দেয়া হয়েছে তাতে সঙ্কট সৃষ্টি হতো। একারনেই নবী করীম (স.) পরবর্তীকালের এসব বিষয় সম্পর্কে কোনো বক্তব্য রাখেননি।

হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা প্রথম শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীতে আল্লাহর প্রথম খলীফা বা প্রতিনিধি। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। শুধু নামই নয় বরং সেসব জিনিসের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে কেয়ামত পর্যন্ত যতো জিনিস ব্যবহার হবে সকল জিনিসের নাম শেখাননি। বরং সেকালের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নামই শিখিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.)-কে জাহাজ তৈরীর বিষয়ে, হযরত দাউদ (আ.)-কে বর্ম-তৈরীর বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আকাশ ও পৃথিবী বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়েছে। এছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করা হয়েছে। যেমন চারটি ঘটনা সূরা বাকারায় বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ওযায়ের (আ.)-কেও মৃতকে জীবিত করার জ্ঞান দেয়া হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-কেও অনুরূপ জ্ঞান দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর 'ইয়াদে বাইযা' অর্থাৎ হাত সাদা করার কৌশল এবং অলৌকিক লাঠি দেয়া হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আ.)-কে শূন্যে উড্ডয়নের জ্ঞান দেয়া হয়েছে। এছাড়া তিনি জীবজন্তু ও পাখীদের ভাষা বুঝাতেন। জ্বিনদের ওপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো। বাতাসে উড্ডয়নকারী পিপীলিকা হযরত সোলায়মান (আ.)-কে শত্রু সৈন্যের আগমন সম্পর্কে খবর দেয় এবং তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

মোট কথা আল্লাহ তায়ালা সকল নবীকেই শিক্ষক রূপে প্রেরণ করেছিলেন, তারা মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তার সবই ছিলো সীমিত পরিসর, সীমিত এলাকায় বসবাসকারী লোকদের জন্যে এবং সীমিত কালের জন্যে, অবশেষে এমন এক সময় এলো যখন সীমারেখা তুলে দিয়ে জ্ঞানকে কালের যুগের ভৌগলিক সীমারেখার গন্ডি ভেংগে সার্বজনীন করা হলো। হযরত মোহাম্মদ (স.) ছিলেন বিশ্ব মানবের নবী। তাঁর সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন, আপনাকে বিশ্ব জাহানের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হেয়েছে। নবী করীম (স.) ছিলেন আঠার হাজার মাখলুকাতের জন্যে রহমত ও কল্যাণ স্বরূপ। সূরা নেসায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, বস্তুত তারা নিজেরাই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং তারা তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, কারণ আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি কেতাব ও হেকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে অতিতের না জানা অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমার ওপর আল্লাহর অপরিসীম কৃপা রয়েছে।

কাজেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিশ্বজগতের অনেক জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর নবুওত কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে প্রযোজ্য। কোরআনের শিক্ষাও চিরন্তন। নবী করীম (স.) বিশ্বজগতের জন্যে যেহেতু ভয় প্রদর্শক ছিলেন একারণে তাকে এমন কেতাব দেয়া হয়েছে যে কেতাব সমগ্র বিশ্বের জন্যে সুবিন্যস্ত বিধি-বিধান সম্বলিত। নবী করীম (স.) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এ সাক্ষও



www.nagorikpathagar.org

দিয়েছেন যে, তিনি লোকদের পাক পবিত্র করেছেন এবং তাদেরকে বাতেনী অর্থাৎ অপার্থিব জ্ঞান শিক্ষা দেন।

কোরআনের শিক্ষা চিরন্তন ও কালজয়ী। কাজেই কোরআনের অনুসারীদের জন্যে অন্য কোনো জ্ঞানের কোনোই প্রয়োজন নেই। নবী করীম (স.) ছিলেন হায়াতুন নবী। তাঁর প্রচারিত শরীয়ত পবিত্র ও জীবন্ত। আমাদেরকে সর্বতোভাবে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। কারণ এতেই আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হবে। নবীজীর শিক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠবে। তবে তার আগে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি আমাদের অন্তরে গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে।

প্রিয় নবীর প্রতি যথার্থ ভালোবাসা সৃষ্টি না হলে আনুগত্য ও অনুকরণের প্রেরণা পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন, ভালোবাসা পেতে হলে অবশ্যই তাঁর প্রেরিত রসূলকেও ভালোবাসতে হবে। এই ভালোবাসা না থাকলে আনুগত্যের স্বাদ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। রসূলের প্রতি যথার্থ আনুগত্য থাকলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল পাপ মার্জনা করে দেবেন। কাজেই নবীজীর সুন্নাহ আমাদের ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। এতেই আমাদের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। এই ভালোবাসার জন্যে এবং নবীজীর সুন্নাহর অনুসরণের জন্যে অন্য সব ইযম ও মতবাদ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নবীজীর আনীত আদর্শের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে সমর্পিত হতে হবে। দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে সেরাতুল মোস্তাকীম অর্থাৎ সরল সঠিক মযবুত পথ প্রদর্শন করেন এবং মহানবী মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি যথোচিত ভালোবাসা দান করেন।



www.nagorikpathagar.org

## একটি কৈফিয়ত

'মনীষীদের কোরআন গবেষণা' মূল বইটির আলোচনা এখানেই শেষ। এ অমূল্য গ্রন্থটি পড়ে যারা কোরআনের জন্যে নিজেদের নিবেদিত করতে চাইবেন তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্যে বিচ্ছিন্ন কিছু পরামর্শ সম্বলিত আমার একটি প্রবন্ধ, 'কোরআনকর্মীদের দিক নির্দেশনা' আমি এই বইর শেষের দিকে জুড়ে দিচ্ছি, এই লেখাটিকে কোনোক্রমেই 'মনীষীদের কোরআন গবেষণা' বইর অংশ মনে করা যাবে না।

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

# কোরআন কর্মীদের দিক নির্দেশনা

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

www.nagorikpathagar.org

যে পরিবেশে আপনি কোরআনের কাজ করবেন, আগে সে যমীন, সে দেশ, সে দেশের মানুষদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস তাকে জানতে হবে, কোরআনের কাজের পথে একে অবহেলা করার কোনো উপায় নেই। যে মানুষের কাছে আপনি কোরআনের কথা বলবেন তাদের পক্ষ বিপক্ষ উভয় শক্তির ধ্যান ধারণা, জীবন পদ্ধতি ও কর্মকৌশলও আপনাকে জানতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

'কোরআন পড়া, কোরআন বুঝা ও কোরআন অনুযায়ী জীবন গড়া' বিষয়টি মানুষের জন্যে এমনি একটি মৌলিক বিষয় যে, এটা নিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠার সাথে ভাবতে হবে, তাও আবার ভাবতে হবে এখনি! কারণ অনেকগুলো সময় এমনিই অতিবাহিত হয়ে গেছে! বিষয়টি আরো বেশী জরুরী তাদের জন্যে, যারা সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কোরআনের দিকে ডাকছেন, বাইরের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদের কোরআনের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিতে বলছেন।

আমাদের প্রতিষ্ঠান 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' বিশ্বব্যাপী কোরআনের অনুরাগীদের জন্যে কোরআন, কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পর্যায়ে যুগোপযোগী কিছু সাহিত্য প্রকাশ করেছে। গত কয়েক বছরে আমরা বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীর সাইয়েদ কুতুব শহীদের কালজয়ী গ্রন্থ ৮ হাজার পৃষ্ঠার তাফসীর 'ফী যিলালিল কেরআন'-এর ২২ খন্ডে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছি। শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ ওসমানীর ৭ খন্ডে সমাপ্ত 'তাফসীরে ওসমানী' ও আবু সলিম মোহাম্মদ আবদুল হাই-এর 'আসান তাফসীর' প্রকাশ করেছি। প্রায় হাজার বছর ধরে নির্ভরযোগ্যতার শীর্ষে অবস্থানকারী আল্লামা এমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীরের 'তাফসীর ইবনে কাসীর' ও পাশ্চাত্য দুনিয়ার নির্ভরযোগ্য তাফসীর আল্লামা ইউসুফ আলীর 'দি হোলি কোরআন' এর অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ আল্লাহর রহমতে শেষ হয়ে এখন প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এ যামানার আরো দু'টো বিখ্যাত তাফসীর আল্লামা মোহাম্মদ আসাদের 'ম্যাসেস অব দি হোলি কোরআন' ও শীর্ষ মানের কোরআনের পন্ডিত মওলানা আবুল কালাম আযাদের 'তরজুমানুল কোরআন'-এর কাজও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ তায়ালার বিশাল অনুগ্রহ ও এদেশের সুধী চিন্তাবিদদের অশেষ দোয়ায় ধীরে ধীরে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন বাংলাদেশ সেন্টার একটি 'তাফসীর হাউসে' পরিণত হতে যাচ্ছে। এর সাথে আরো রয়েছে বিশ্ব সীরাত প্রতিযোগিতার প্রায় বারো শত পান্ডুলিপির মাঝে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থ আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরীর 'আর রাহীকুল মাখতূম', মিসরীয় নাট্যকার তাওফীকুল হাকীমের 'দ্যা ম্যাসেজ' ছবির কাহিনী 'মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' ও খাদিজা আখতার রেজায়ীর 'তিনি চাঁদের চেয়ে সুন্দর'। আরো রয়েছে আমার নিজস্ব প্রয়াস 'কোরআনের অভিধান', 'কোরআনের সাথে পথ চলা' ও ওমর তেলমেসানীর 'শহীদুল মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব'-এর বাংলা অনুবাদসহ অনেকগুলো পরিশীলিত গ্রন্থ। এগুলো ও দেশের অন্যান্য সাংস্কৃতিমান সাহিত্য দিয়ে আমরা সবাই মিলে আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে দেশে কোরআনের পক্ষে একটি ব্যাপক আন্দোলন শুরু করতে পারি, আর এ আন্দোলনের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা একদিন আমাদের দেশটাকে কোরআনের উপযোগী ভূখন্ডে পরিণত করতে পারবো। এদিক থেকে আপনি ও আমি আমরা সবাই এক, আমরা সবাই কোরআন বুঝার আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী। কোরআনের কাংখিত সে পাঠশালার বিনির্মাণে আমরা সবাই এখানে সমপর্যায়ে অংশীদার।



www.nagorikpathagar.org

কোরআন নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের সবার এবং ভাবতে হবে এখনি! এ বিষয়টি নিয়ে আসলেই কোনো রকম বিলম্বের সুযোগ নেই, এমনি বড়ো দেরী হয়ে গেছে, আরো দেরী হলে চরম মূল্য দিয়ে একদিন আমাদের এর দায়ভার শোধ করতে হবে। স্পেনে আমরা মূল্য দিয়েছি, বোসনিয়া চেচনিয়ায় মূল্য দিয়েছি, মাত্র সেদিন আফগানিস্তান ও ইরাকে মূল্য দিয়েছি, ভারতে মূল্য দিয়ে যাচ্ছি প্রতিদিন, আর কতো মূল্য আমাদের পরিশোধ করতে হবে সে সিদ্ধান্ত আমাদের এখনি গ্রহণ করতে হবে।

গোটা জনগোষ্ঠীকে এ দায়ভার থেকে মুক্ত করার জন্যে সমাজের অন্য মানুষদের তুলনায় আমরা যারা বিভিন্নভাবে কোরআনের কাজের সাথে জড়িত তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই একটু বেশী। কোরআনের প্রচার ও প্রসারে নবীর অবর্তমানে সাহাবায়ে কেরামরা যে মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন আমাদেরও আজ গোটা উম্মতের সামনে সেই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সত্যিকার অর্থে এখান থেকেই একজন সফল কোরআন কর্মীর কার্যকরী ভূমিকা শুরু হয়। ময়দানের একজন সিপাহী যদি যুদ্ধের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, প্রতিভা ও অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করতে না পারে তাহলে মোকাবেলায় বিজয় তো দূরের কথা পালানোর ক্ষমতাটুকুও সে এক সময় হারিয়ে ফেলবে।

কোরআন নিয়ে যারা ভাববেন, কোরআন নিয়ে যারা কাজ করবেন, তাদের কোরআন সম্পর্কিত দু'টো বিষয় জানতে হবে, একটা হচ্ছে যে বিষয়ের দিকে তারা দুনিয়ার মানুষদের আহ্বান জানাবেন সে বিষয়টা সম্পর্কে তাদের যথাসম্ভব পূর্ণাংগ জ্ঞান। এটা কিছুটা পণ্য দ্রব্যের মার্কেটিং এর মতো, যে দ্রব্যটাকে আমি মানুষদের কাছে পরিচিত করাতে চাইবো সে সম্পর্কে আমি যদি নিজে বিস্তারিত না জানি তাহলে কোনো অবস্থায় তাকে অন্যের কাছে পরিচিত করাতে পারবো না। দ্বিতীয় হচ্ছে যাদের সামনে সে পণ্যটি নিয়ে আমি হাযির হবো তাদের শক্তি সামর্থ ক্ষমতা সম্পর্কেও একটা পরিষ্কার ধারণা আমার থাকতে হবে, তাদের জ্ঞানগত কৌশল ও মানসিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে ময়দানে বিজয় অর্জিত হলেও কৌশলগত দিক থেকে আমরা দারুণভাবে পর্যদুস্ত হয়ে যাবো।

কোরআনের এই থিউরিগত জিনিসের মধ্যে রয়েছে কোরআনের যাবতীয় পরিসংখ্যান, কোরআনের নোকতা, হারাকাত, অক্ষর, শব্দ, আয়াত, রুকু, পারা, মানযিল ইত্যাদি জানা। এ পরিসংখ্যানের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক আয়াতসমূহ জেনে নেয়া। কারণ কোরআন নিয়ে কাজ করার জন্যে আয়াতের আলোচ্য বিষয়টি জানা একান্ত জরুরী, এরপর রয়েছে কোরআনের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ, ওহীর নযুল, ওহীর লিপিবদ্ধকরণ, কোরআনের অভিনব সংরক্ষণ পদ্ধতি, ওহী লেখক সাহাবীদের নাম ও ইতিহাস, কোরআনের মুদ্রণ প্রক্রিয়া, প্রাচীন হস্তলিপি থেকে আধুনিক কম্পিউটার পর্যন্ত গোটা ব্যবস্থা জানাও একান্ত জরুরী। কোরআনে বর্ণিত নবীদের ইতিহাস, কোরআনের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ, কোরআনের বর্ণিত সৌভাগ্যবান নারী পুরুষের বিবরণ জানাও এ জ্ঞানের অন্তর্গত। কোরআনের কেন্দ্রীয় চরিত্র, নুযুলে কোরআনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ইত্যাদিও কোরআনের একজন 'কর্মীকে জানতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

কোরআনের এই থিউরিগত জ্ঞান অর্জনের পর এবার যারা ময়দানে কোরআনের কাজ করবেন তাদের কয়েকটা প্র্যাকটিক্যাল বিষয় ভালো করে জেনে নিতে হবে। এর প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, যে যমীনে যে পরিবেশে তিনি কোরআনের কাজ করবেন, আগে সে যমীন, সে দেশ, সে দেশের মানুষদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস তাকে জানতে হবে, কোরআনের কাজের পথে একে অবহেলা করার কোনো উপায় নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে যে মানুষের কাছে আপনি কোরআনের কথা বলবেন তাদের পক্ষ বিপক্ষ উভয় শক্তির ধ্যান ধারণা, জীবন পদ্ধতি ও কর্মকৌশল আমাকে জানতে হবে।

তৃতীয়ত এ যমীনে যারা কোরআনের পরিকল্পনাকে নস্যাত করে দিতে চায় তাদের শক্তি ক্ষমতার কখনো অবমূল্যায়ন করা চলবে না। কোন্ মোক্ষম অস্ত্র দিয়ে তারা কোরআনের পথে কাঁটা বিছিয়ে দিচ্ছে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং সে আলোকে প্রয়োজনে নিজেদের কর্মকৌশলে নিত্য নতুন টেকনিক সংযোগ করে যেতে হবে।

এগুলো হচ্ছে কোরআনের পথে একজন সাধারণ মানুষের ভূমিকা। কিন্তু একজন কোরআন কর্মীর আরো কয়েকটি বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত জ্ঞান শিখতে হবে। এ পর্যায়ে তার প্রথম কাজ হবে তাফসীর শাস্ত্র সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা রাখা।

মুসলিম মিল্লাতের খ্যাতনামা তাফসীর বিশেষজ্ঞ আল্লামা জালালুদ্দীন সায়ূতী তার তাফসীর শাস্ত্রের নীতিমালার ওপর প্রণীত 'আল ইতকানু ফী উলুমিল কোরআন' গ্রন্থে তাফসীর শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কি লিখেছেন তা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তিনি বলেছেন, তাফসীর-এর অর্থ হচ্ছে কোনো বিষয়কে মানুষের সামনে খোলাখুলি প্রকাশ করা, এ কারণেই আরবী ভাষায় 'আসফারাস সোবহো' এমন সময়কে বলা হয় যখন উষার লগ্নটি ভালোভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আল্লামা সায়ূতী তার এই গ্রন্থে এ পর্যায়ে আরেকটি কথাও লিখেছেন যে, এ তাফসীর শব্দটি হচ্ছে আরবী 'তাফসেরাতুন' শব্দের মার্জিত রূপ, এর অর্থ হচ্ছে ডাক্তারের রোগী দেখার যন্ত্র।

আল্লামা সায়ূতী তার 'আল ইতকানু ফী উলুমিল কোরআন' গ্রন্থে দুনিয়ার সকল তাফসীরকারকের এই আদি পুরুষ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন,

একবার নাহেক বিন আজরক নামের একজন আরবী ভাষাবিদ তার আরেকজন ভাষাবিদ বন্ধু নাজদা বিন উমায়রকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের প্রসংগে বললেন, 'চলো আমরা সে লোকটির কাছে যাই যে ব্যক্তি কোরআনের তাফসীরের বাহাদুরী দেখায়, অথচ তার সে বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই।' অতপর তারা উভয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাকে বললো, আমরা আপনাকে আল্লাহর কেতাবের কয়েকটা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, আপনি আরব জাতির ভাষা ও সাহিত্য থেকে আমাদের জবাব দেবেন যে, আল্লাহর কেতাবের কথাগুলো সত্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তিনি তার কেতাবকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, হাঁ আপনাদের যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আরবী ভাষার পন্ডিত নাকেহ বিন আজরক এক এক করে কোরআনের ১৯০টি শব্দের অর্থ ও সেগুলোর ভাষাগত প্রয়োগ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলেন।



www.nagorikpathagar.org

রাইসুল মোফাসসেরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরবী সাহিত্যের ১৯০টি বিরল কবিতার পংতি পড়ে আল্লাহর কেতাবের শব্দগুলোর অর্থ ও এর ভাষাগত প্রয়োগ তাদের দেখিয়ে দিলেন। একেই পরে ঐতিহাসিকরা 'নাকেহ বিন আজরকের প্রশ্ন' নাম দিয়েছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই প্রশ্নগুলোর সব কয়টাই ছিলো বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ বিশিষ্ট শব্দ।

দ্বিতীয়ত একজন কর্মীকে কোরআনের ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। একটা কথা মনে হয় কোনো রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব না রেখেই আমাদের বুঝতে হবে যে, আল্লাহর এই কেতাবটি নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়, তাও আবার বিশুদ্ধ আরবী ভাষায়, সুতরাং আববী ভাষায় স্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া কোরআনের তাফসীর বলা ও লেখা ও চর্চা করাটা অত্যন্ত জঘন্য একটি অপরাধ। ইদানিং আমাদের সমাজে এমন সব লোকের মনে কোরআনের তাফসীর লেখার শখ জেগেছে যাদের অনেকেরই আরবী ভাষার কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। হাওলাত করা ভাষা দিয়ে 'কাইফা হালুকা আনা বেখায়রিন' ইত্যাদি বলা যায়, কিন্তু এ দিয়ে কোরআনের অনুবাদ কিংবা তাফসীর করা বা লেখা যায় না।

এ পর্যায়ে একজন ভাষা শিক্ষার্থীই আরবী ভাষা, ভাব শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে।

হিজরী অষ্টম শতকের শুরুর দিকের ভাষাবিদ জামাল উদ্দীন ইবনে মনযুর আনসারী খাযরাজী 'লিসানুল আরব' নামে আরবী ভাষার ওপর একটি দুর্লভ অভিধান গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বমোট বিশ খন্ডে সমপ্ত এই বিশাল গ্রন্থে ৮০ হাজারের চাইতে বেশী আরবী শব্দ স্থান পায়। এতে তিনি কোরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি আরবী শব্দের বিষদ ব্যাখ্যা পেশ করেন। এই অভিধান গ্রন্থটিকে আরবী ভাষাবিদরা তার সময় পর্যন্ত প্রকাশিত আরবী ভাষার অভিধানসমূহের সার সংক্ষেপ রূপে অভিহিত করেছেন।

ভাষাবিদ জামাল উদ্দীন ইবনে মনযুর ছিলেন আফ্রিকার লোক। তিনি তার সময় পর্যন্ত প্রকাশিত আরবী অভিধানগুলোকে সামনে রেখে আরবী ভাষার সাথে কোরআনের ব্যবহৃত ভাষায় এক অপরূপ সমন্বয় করে এটা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআনে ব্যবহৃত প্রতিটি আরবী শব্দই হচ্ছে আরবী ভাষার সাহিত্য ও শিল্পমানের সর্বোচ্চ মানের প্রতীক।

আরবী ভাষায় অভিধান রচনাব কাজটি সম্ভবত শুরু করেছিলেন সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তিনিই প্রথম কোরআনে ব্যবহৃত অব্যয়, ক্রিয়া ও বিশেষ্য ইত্যাদিকে প্রাচীন আরবী কবিদের কবিতায় ব্যবহৃত আরবীর পাশে রেখে কোরআনে ব্যবহৃত শব্দশৈলীর মাহাত্ম প্রমাণ করেছেন।

বাগদাদের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন হযরত হাসান বসরী, হযরত ইয়াহয়িবা বিন ইয়াসার ও নাসের বিন আসেম লাইসীকে কোরআনের অক্ষরে নোকতা ও শব্দে হারাকাত দানের জন্যে নিয়োজিত করেন তখন তারাও কোরআনের বর্ণিত প্রতিটি শব্দকে আরবী ভাষার প্রচলিত শব্দের সাথে মিলিয়ে কোরআনের শব্দ গঠন প্রক্রিয়ায় এক অবিশ্বাস্য ভাষাশৈলীর প্রমাণ দেখতে পান। পরবর্তীকালে রচিত আবু আবদুর রহমান বিন আহমদ ফারাহেদীর অভিধান গ্রন্থ 'কেতাবুল আইন' স্পেনবাসী পন্ডিত আবু বকর মোহাম্মদ বিন হাসান জুবায়দীর 'মোখতাসার কেতাবুল আইন' আবু বকর মোহাম্মদ বিন দারিদ এর



www.nagorikpathagar.org

'কেতাবুল জামহারা' আবুল মানসূর মোহাম্মদ বিন আহমদ আযহারীর 'কেতাব তাহযীবুল লোগাত' আবু নসর ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ জাওহাবীর 'কেতাবুস সিহাহ' স্পেনবাসী আবুল হাসান আলী বিন সাইইদীর 'কেতাবুল হেকাম' নিশাপুরের আবুল মানসূর সালাবীর 'ফেকহুল লোগাত' সহ আবুল কাসেম মাহমুদ বিন ওমর জামাখশারীর 'আসাসুল বালাগাত' এর মূল প্রতিপাদ্যও ছিলো এই একটি এবং তা হচ্ছে প্রচলিত আরবী ভাষার ওপর কোরআনে ব্যবহৃত বিশুদ্ধ আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

আরব শব্দের আভিধানিক অর্থ সাহারা। বিশুষ্ক প্রান্তর, অপর কথা অনুর্বর যমীন। আরব উপদ্বীপের বালিয়াড়ী যমীন ও পাথুরে পাহাড় ইত্যাদির কারণেই গোটা এলাকাকে প্রাচীনকালে 'আরব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর আরবী হচ্ছে এই বিশুষ্ক প্রান্তরের অধিবাসীদের মুখের ভাষা। সভ্যতা সংস্কৃতির হাজার বছরের বিবর্তনের ফলে সেই অনুর্বর যমীনের ভাষাই এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ভাষায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ হেদায়াতের গ্রন্থ আল কোরআন যখন এ ভাষায় নাযিল হয়েছে তখন এই ভাষাই রাতারাতি বিশুস্ক প্রান্তরের অধিবাসী বেদুইনদের ভাষা থেকে সভ্যতর সংস্কৃতির এক উৎকৃষ্ট বাহনে পরিণত হয়ে গেছে।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তার কেতাবের শব্দ ও বাক্য গঠন ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত ভাষাকে 'বিশুদ্ধ আরবী ভাষা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি তার কেতাবকে পরিষ্কার আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন। পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষা বলতে আরব জাতির প্রচলিত সাহিত্যিক মানের আরবী ভাষাকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ প্রত্যেকটি দেশে ও অঞ্চলে ভাষার মধ্যেই ক্রমবিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট ধারা অব্যাহত থাকে। এ কথা শুধু যে আরবীর ক্ষেত্রে সত্য তাই নয়—পৃথিবীর সব কয়টি ভাষার ক্ষেত্রেই এটা সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য- সুলতানী আমলের বাংলা ও পুথি সাহিত্যের বাংলার সাথে এ কালের বাংলার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজী সাহিত্যে তো এ বিবর্তন আরো বেশী প্রকট। সেকসপিয়ারের যামানার ইংরেজীর সাথে ইদানিং কালের ইংরেজীর অনেক ক্ষেত্রেই কোনো মিল নেই। আরবী ভাষার ক্ষেত্রে এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, বিশুদ্ধ আরবী ভাষা বলতে কোনো অঞ্চলের আরবী বুঝায় না। যেমন বিশুদ্ধ বাংলা দ্বারা আমরা কোনো অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বুঝাই না। আজ যদি কেউ মিসর, লিবিয়া কিংবা লেবাননের আরবী ভাষাকে কোরআনের উচ্চাংগের সাহিত্যমা[illegible] সাথে মিলিয়ে দেখতে চায় তাহলে সে মারাত্মক ভুল করবে। এ কারণেই বলে[illegible] [illegible] লোক যদি জীবনের একশ' বছরও কোনো একটি আরব জনপদে বসবাস করে সে দেশের গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে পারদর্শী হলেও তার পক্ষে এ দাবী করা ঠিক হবে না যে, সে কোরআনের আরবীতে পারদর্শী হবে। কারণ কোরআনের আরবী শুধু ভাষাই নয়, কোরআনের আরবী একটি জীবন্ত জীবনদর্শনের বাহন। এই ভাষার নিজস্ব রীতিনীতি ব্যাকরণশৈলী ও উচ্চাংগের ভাষাতত্ত্ব রয়েছে। প্রচলিত আরবী ভাষার জ্ঞান দিয়ে তাই সব সময় কোরআনের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হয় না। আর তাই যদি সম্ভব হতো, তাহলে কোরআনের আরবীকে বুঝানোর জন্যে আরবী ভাষায় শতশত তাফসীর গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন হতো না। সাইয়েদ কুতুব শহীদকেও দশ বছর কারার নির্মম প্রকোষ্টে বসে হাজার হাজার পৃষ্ঠার আরবী কোরআনের আরবী ব্যাখ্যা করার দরকার পড়তো না।



www.nagorikpathagar.org

এ কাজ করতে গিয়ে আরব জনপদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে কোরআনের উপস্থাপিত ভাষা ও সংস্কৃতির মাঝে যে মৌলিক পার্থক্য রেখা রয়েছে তা যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। আমাদের মাঝে আজো হাজারো মানুষ এমন রয়েছে যারা আরবের আরবীর সাথে কোরআনের আরবীর মাঝে একটা তালগোল পাকিয়ে ফেলে। এরা আরবদের সংস্কৃতিকে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মকে মনে করেন এটাই বুঝি কোরআনের শিক্ষা।

বছর কয়েক আগের কথা। মিসরের সরকারী ট্যাক্স বিভাগের এক নিম্ন কর্মচারী আলা হামিদ আরবী ভাষায় একটি উপন্যাস তৈরী করে। ১৯৯২ সালের ১৬ই জানুয়ারী লন্ডনের দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা সে বইর ওপর একটি ছোট্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। সে প্রবন্ধে বইটির নাম দেয়া হয়েছে 'দি ডিসটেন্স ইন এ ম্যানস মাইন্ড'। এই বইতে বিতর্কিত লেখক আল্লাহর নবীর ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করায় মিসরীয় উচ্চ আদালত তাকে ৮ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। আশ্চর্য মিসরের সরকারী প্রশাসন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ হয়েও এ রায় কার্যকরণের তারা সময় কোনো রকম প্রভাব বিস্তার করতে চাইনি। বেশ কয়েক বছর আগে সুইডিস একাডেমী কর্তৃক সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিলো আরেকজন মিসরীয় লেখক নাজিব মাহফুজকে। যে বইটির জন্যে তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিলো তাকে ইসলাম বিদ্বেষীতার কারণে এক সময়ে মিসরের ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার বেআইনী ঘোষণা করেছিলেন। নাজিব মাহফুজ নিজে যে প্রচুর কিছু লিখেছেন তা নয়, তবে তার রচনাগুলো বেশীর ভাগই পশ্চিমী দুনিয়ার খ্যাতি পেয়েছে তার ক্ষমাহীন ইসলাম বিদ্বেষীতার কারণে। অথচ কে না জানে যে, এ দু'জন লেখকের লেখার ভাষাই ছিলো আরবী। সিরিয়া, ইরাক লেবানন সহ আরব দেশগুলোতে এমন বহু কুফরী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে যাদের ভাষা আরবী। আসলে এই সমগ্র আলোচনায় আমি যে কথাটাকে হাই লাইট করতে চাই তা হচ্ছে আরবী ভাষা ইসলামের প্রাথমিক বাহন হলেও গোটা আরবী সাহিত্যই ইসলাম নয়। তা সব সময় কোরআনের প্রতিপাদ্যের সাথেও খাপ খায়না। এ কারণেই এটা ব্যাপক ভাবে বলা হয় যে, আরবী ভাষা শিখলে কিংবা আরবী ভাষার পারদর্শী হলেই কোরআন বুঝা যায় না। কোরআন বুঝার জন্যে আরবী ভাষার বিপুল জ্ঞান থাকতে হবে এটা ঠিক; তবে তা-ই কিন্তু একমাত্র বিষয় নয়।

আমরা যারা কোরআন বুঝার জন্যে আরবী ভাষা শিখতে চাই তাদের সর্বপ্রথম আরবী সংক্রান্ত এই দৃষ্টিভংগীটা বদলাতে হবে। আমাদের দেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন বহুলোককেই আরবীর পাঠ দিচ্ছে। কিন্তু এদের মধ্যে কতোজন লোক এমন আছেন যারা কালামুল্লাহর ভাষা আয়ত্ব করতে পেরেছেন। এ কারণেই আমি মনে করি আরবী ভাষা শেখা বা শেখানোর এই পরিমন্ডলের বাইরে এসে আজ আমাদের কোরআন ষ্টাডির কথা ভাবতে হবে এবং এ জন্যে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভংগী নিয়ে দেশের নতুন প্রজন্মকে কোরআনের ভাষার সাথে পরিচিত করাতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আরবী ভাষার বিশালতা ও প্রশস্ততা সম্পর্কে যারা জানেন তারা সবাই এ কথার সাথে একমত হবেন যে, আরবী শব্দভান্ডারে তিন অক্ষরের একটি মূল ধাতু আক্ষরিক বিবর্তনের পাশাপাশি তার মধ্যে অর্থের একটা বড়ো ধরনের পরিবর্তন এসে যায়।



www.nagorikpathagar.org

আরবী ভাষায় কোনো কাজ করার জন্যে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে, 'ফে'ল' এর মূল ধাতু হচ্ছে ৩ অক্ষর বিশিষ্ট একটি শব্দ 'ফা আইন লাম', একে বিভিন্ন (বাব) পর্যায়ে রাখলে এর অর্থ পরিবর্তিত হতে থাকে। 'এফয়াল' ও 'তাফয়ীল' মানে অন্যকে দিয়ে কাজ করানো। 'ইসতেফয়াল' মানে কাজ করতে চাওয়া। 'তাফাউল' মানে দু'জন মিলে কাজ করা, 'মোফায়ালাতু' মানে কাজটি অধিক পরিমানে করা। 'ফায়ালা' সে করলো 'ইয়াফআলু' সে করে, 'এফয়াল' তুমি করো 'লা তাফয়াল' তুমি করো না, 'মেফয়াল', যা দিয়ে কাজটা করা হয়। 'মাফয়াল' যেখানে কাজটা আঞ্জাম দেয়া হয়। এখানে সহজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে একটি শব্দ বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে কিভাবে তার অর্থ পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

আরবী ভাষায় নুন্যতম জ্ঞানের জন্যে এই বিষয়টি সম্পর্কে সবাইকেই সজাগ থাকতে হবে। একথা ঠিক যে, কোরআন বুঝার জন্যে একজন ব্যক্তিকে আরবী ব্যাকরণে পন্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আরবী গ্রামারের কয়েকটি নির্দিষ্ট পাঠ তাকে অবশ্যই শিখতে হবে, সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখতে হবে যেন গোটা শিক্ষা কার্যক্রমটি ব্যাকরণ নির্ভর না হয়ে পড়ে। আমাদের শিক্ষার্থীরা ঠিক সে পরিমাণ আরবী গ্রামারই শিখবেন– যতোটুকু কোরআন শেখার জন্যে তার প্রয়োজন হবে। সেখানেও আমাদের পদ্ধতি হবে হামেশা কোরআন নির্ভর। মনে রাখতে হবে কোরআনের ভাষাকে সামনে রেখেই আরবী ব্যাকরণের যাত্রা ও বিন্যাস সাধন করা হয়েছে। এখানে কোরআন হচ্ছে মূখ্য, ব্যাকরণ হচ্ছে গৌন। এ পর্যায়ে সূরা আয যুমার থেকে আমি একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। এই সূরার ৭১ ও ৭৩ তম আয়াত দুটিতে নেককারদের জান্নাত ও পাপীদের জাহান্নামের সামনে উপনীত হবার ঘটনা বলা হয়েছে। বল হয়েছে, 'যখন তারা সেখানে পৌঁছবে তখন তার দরজা খুলে যাবে'। কথাটি দু'বার বলা হয়েছে, কিন্তু পরের আয়াতে 'তার দরজা খুলে যাবে' এর আগে এমনিই একটা (ওয়াও) 'এবং' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরবী ব্যাকরণে এখানে এবং 'শব্দটির' ব্যবহারের যুক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোরআনে আছে, তাই ব্যাকরণবিদরা এর একটা যুক্তিকতা খুঁজে বের করেছেন। এটাই শেষ নয়—এমনি উদাহরণ কোরআনের পাতায় ভূরি ভূরি রয়েছে।

পৃথিবীর আধুনিক ভাষাসমূহের শব্দভান্ডারের সাথে আরবী ভাষার শব্দসমূহকে মিলিয়ে দেখলে এই ভাষার বিশালতা ও ব্যাপকতা আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। বাগদাদের রাজ্য সভার মহাকবি কারাযদাক এক বার আরবী 'দারবুন' শব্দের ১৮৩টি অর্থের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন আরবী কবিতার অমূল্য সংস্করণ 'সাবয়া মোয়াল্লাকায়' কবিরা 'প্রিয়ার গালের তিল' এ জন্যে নাকি ১৪৫টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ কারণে প্রাচ্যের ভাষাবিদরা বলেন, আপনি যদি কোনো লোকের তারিফ করতে চান তাহলে এর জন্যে আপনাকে আরবী ভাষার দ্বারস্থ হতে হবে কেননা তারিফের জন্যে কমপক্ষে এখানে শতাধিক শব্দ মজুদ রয়েছে। আবার কাউকে গালি দিতে চাইলেও আপনাকে আরবীর কাছে আসতে হবে, কেননা সে ভালো কাজটার জন্যে, এ ভাষার ভান্ডারে শতাধিক শব্দ পাওয়া যাবে।



www.nagorikpathagar.org

কোরআন বুঝার জন্যে যারা আরবী শিখবেন তাদের আরবী ভাষার এই বিশাল ভান্ডার মুখস্ত করার কথা আমি বলবো না। হাঁ আরবী ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের ওপর যারা 'থিসিস' করবেন তাদের হয়তো সে প্রয়োজন আছে, কিন্তু কোরআন বুঝার জন্যে আরবীর এই বিশাল তেপান্তর পাড়ি দেয়ার কোনো দরকার নেই। আমাদের আরবী হবে কোরআনের প্রয়োজনে। তাই এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আরবীর ক্ষেত্র একটু ছোটো হয়ে আসবে। কারণ এখানে আরবী ব্যাকরণ ও ভাষা রীতির অসংখ্য জিনিসই তেমন একটা প্রয়োজন হবে না। আবার প্রচলিত আরবী শেখার পরিমন্ডলে কোরআনের প্রয়োজনে দু'একটি জিনিস তাকে বেশীও শিখতে হতে পারে। আমার মতে এ কাজের জন্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি আমাদের মূল্যবান একটা সিলেবাস উপহার দিতে পারেন। আমি নিজে ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত খুলনা শহরে এ ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছি। আমার সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনে আমি লন্ডনেও এ ধরনের কিছু কিছু ক্লাশ পরিচালনা করেছি। তাই প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সামনে আমিও আমার সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা পেশ করতে পারবো।

কোরআনের জন্যে যে আরবী শেখা হবে, সে আরবীর জন্যে ভাষার পাশাপাশি তাকে নির্দিষ্ট কিছু শব্দের ব্যাখ্যার জন্যে ইসলামী নীতিমালার মূল সূত্র রসূলের হাদীসের দিকে তাকাতে হবে। যেমন আরবী শব্দ 'আল্লাহ' এ শব্দটির ধাতু তিন অক্ষর বিশিষ্ট 'আলিফ লাম হা'। একে যে কোনো প্রকরণেই ফেলা হোক না কেন তার সাথে জড়িত সব কয়টি বিষয়কে কোনোদিনই এ দ্বারা বুঝানো যাবে না। তাই এ শব্দটির ব্যাপকতা বুঝতে হলে কোরআন ও হাদীসের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া একজন শিক্ষার্থীর কোনোই উপায় থাকে না। একই ভাবে আরেকটি শব্দ হচ্ছে, তিন অক্ষর বিশিষ্ট একটি শব্দ 'দ্বীন'। এই শব্দটির ধাতু হচ্ছে 'দাল ইয়া নূন' এই তিনটি অক্ষরকে আপনি যে আরবী ব্যাকরণের যে প্রকরণেই ফেলুন না কেন এ থেকে 'আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টিকূলের জন্যে জীবনের একটি পূর্ণাংগ বিধান' এ অর্থ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। এ কারণেই কোরআন বুঝার জন্যে যারা আরবী শিখবেন তাদের আরবী ভাষার নিজস্ব ভান্ডার ছাড়া আরেকটি অপরিহার্য সূত্রের দ্বারস্থ হতে হবে এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কোরআনে বর্ণিত সে শব্দের বিশেষ প্রয়োগ ও সে সম্পর্কিত কোরআনের আসল ব্যাখ্যাতা রসূলের নিজস্ব ব্যাখ্যা। কোরআনের পাতায় এমন আরো অসংখ্য শব্দ আছে যেগুলোকে কোরআনের পরিমন্ডল থেকে বের করে আনলে তা বড়োই বেমানান হয়ে যায়। অথচ আবার তাকেই যখন কোরআনের পাতায় বসিয়ে দেখা হয় তখন তাই একান্ত বাস্তব সম্মত বর্ণনা মনে হয়।

আমি একথা বলি না যে, কোরআনের প্রত্যেক কর্মীরই বিশুদ্ধ আরবী ভাষার বিপুল জ্ঞান অর্জন করতে হবে; কিন্তু যিনি কোরআনের কাজে হাত দেবেন তার জন্যে তো আরবী ভাষায় পর্যাপ্ত জ্ঞান প্রয়োজন। এই জিনিসটা ছাড়া আল্লাহর কেতাবের অনুবাদ ও তাফসীর লেখায় মনোনিবেশ করা একটি ক্ষমাহীন অপরাধ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করুন!

কোরআনের শব্দসমূহের জ্ঞান অর্জনের জন্যে 'মোফরাদাতুল কোরআন', 'কোরআনের অভিধান', 'লোগাতুল কোরআন', 'কামুসুল কোরআন' ও 'ডিকশনারী অব হোলি কোরআন' গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।



www.nagorikpathagar.org

কোরআনের ভাষা জানা একজন সাধারণ গবেষকের জন্যে যথেষ্ট হতে পারে কিন্তু কোরআনের অধিক চর্চার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট নয়– এর জন্যে প্রয়োজন তাফসীরশাস্ত্রের ইতিহাস, তাফসীরশাস্ত্রের মৌলিক নীতিমালা জানা। তাফসীরে তাবারী (৩১০ হিঃ) থেকে তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন (১৩৮৭ হিঃ) পর্যন্ত এই হাজার বছরের তাফসীর শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে প্রত্যেক কোরআন কর্মীরই একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। উসুলে তাফসীরের ওপর আল্লামা জালালউদ্দিন সায়ূতীর 'আল ইতকানু ফী উলুমিল কোরআন', শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভীর 'আল ফাউযুল কবীর'- কমপক্ষে এই দুটো বই সবাইকে পড়তে হবে। তাফসীরশাস্ত্রের নুন্যতম জ্ঞানের জন্যে এ দুটো বই পড়া একান্ত জরুরী।

উলুমে তাফসীর ও তাওয়ারীখে তাফসীর পর্যায়ে আমাদের ইতিহাসের প্রধান প্রধান কয়েকটি তাফসীর তাদের পড়া একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাংগ তাফসীর ইমাম আবু জাফর বিন জরীরের (৩১০ হিঃ) 'তাবারী জাওয়ামেউল কোরআন আন তাওয়ীলিল কোরআন' প্রথম ফেকার তাফসীর হিসেবে 'জাওয়ামেউল আহকাম' ইমাম আহমদ বিন আলী রাযীর 'আহকামুল কোরআন' ও হাদীস ভিত্তিক বিশাল সংগ্রহ হাফেজ এমাদ উদ্দীনের 'তাফসীরে ইবনে কাসীর' (৭৭৪ হিঃ)। ইমাম রাযীর 'তাফসীর আল কাবীর' (বৃহত ১৬ খন্ডে সমাপ্ত) আল্লামা জামাখশারীর 'আল কাশশাফ' (৫২৮ হিঃ), 'জামে আল কুরতবী' আল্লামা আলুসীর 'রুহুল মাআনী'। মাওলানা আব্দুল হক হাককানীর 'তাফসীরে হক্কানী' (৮ খন্ডে সমাপ্ত ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এর প্রাকাশিত সংস্করণ ১১), মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর 'বয়ানুল কোরআন'। (উর্দূতে ১২ খন্ডে সমাপ্ত) .

আধুনিক তাফসীরসমূহের মধ্যে আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় যেগুলো আমাদের সামনে আছে তার মধ্যে রয়েছে, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর 'তাফহীমুল কোরআন', (বাংলা ১৯ খন্ডে সমাপ্ত), আবুল কালাম আযাদের 'তরজুমানুল কোরআন' (লেখকের মৃত্যু পর্যন্ত প্রকাশিত খন্ড ৪, (সূরা আল মোমেনুন পর্যন্ত) মাওলানা আমীন আহসান এসলামীর 'তাদাব্বুরে কোরআন' (১১ খন্ডে সমাপ্ত), হামিদ উদ্দীন ফারাহীর 'মাজমুয়ায়ে তাফসীরে ফারাহী' আল্লামা রশিদ রেজার 'আল মানার' (প্রকাশিত খন্ড ১২, প্রকাশনা অসমাপ্ত), শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ ওসমানীর 'তাফসীরে ওসমানী'। (বাংলা ৭ খন্ডে সমাপ্ত), আবু সলিম মোহাম্মদ আব্দুল হাই-এর 'আসান তাফসীর' (এক খন্ড আমপারা), সদ্য প্রকাশিত আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বাংলা তাফসীর 'তাফসীরে সাঈদী' (এ যাবৎ প্রকাশিত খন্ড ৩), আল্লামা আসাদের 'ম্যাসেজ অব দি হোলি কোরআন' আল্লামা ইউসুফ আলীর 'দি হোলি কোরআন' (১ খন্ড) সর্বশেষ সাইয়েদ কুতুব শহীদের কালজয়ী তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' (বাংলা ২২ খন্ডে সমাপ্ত)। একজন সফল কোরআন কর্মীর এর সবকয়টি তাফসীর পড়তে হবে এটা জরুরী নয়, তবে একথাটা ঠিক যে, যতো বেশী প্রাচীন ও বর্তমান কালের তাফসীর আমরা পড়বো ততোই আমরা ভালো মানের কোরআন কর্মী হিসেবে সমাজে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারবো।



www.nagorikpathagar.org

এ পর্যায়ে কোরআন অধ্যয়নের একটি মৌলিক কথা মনে হয় অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দেয়া প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে, তাফসীরের বিশাল ময়দানে পা রাখার আগে কোরআনকে কোরআন দিয়েই বুঝার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে নবীর যুগে, খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ও সাহাবাদের গোটা সময়টাতে কোনো মানুষ কোরআন বুঝার জন্যে তাফসীরের সরণাপন্ন হননি। এতে এই কথাটা প্রমাণিত হয় যে, কোরআনের প্রথম অনুসারীরা কোরআনকে কোরআন দিয়েই বুঝতে চেয়েছেন। সে নিষ্ঠাবান মানুষদের মতো আমরাও যদি কোরআনের 'আসল রূহ' এর সন্ধান পেতে চাই তাহলে কোরআনকে কোরআন দিয়েই বুঝতে হবে। কোরআন বুঝার প্রধান উৎস হিসেবে মুল কোরআনের বদলে তাফসীর গ্রন্থের দিকে দৌড়ানোর এই 'ফ্যাশন' পরিহার করতে হবে। একবার কোরআনের ভাষায় ব্যুৎপত্তি জমাতে পারলে পাঠক নিজেই টের পাবেন যে, কোরআন দিয়ে কোরআন বুঝা কতো সহজ। হাঁ যেখানে আপনি হোঁচট খাবেন, যেখানে আপনার ভাষা জ্ঞান আপনাকে আর সাহায্য করতে পারবে না সেখানে অবশ্যই আপনি তাফসীরের সাহায্য নেবেন, কিন্তু সে চেষ্টা কোনো অবস্থায়ই সরাসরি কোরআন বুঝার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার আগে নয়।

শুধু তাফসীর নির্ভর না হয়ে কোরআনকে মূল কোরআন দিয়ে বুঝার কথা বলার এ তো গেলো মাত্র একটা কারণ, এর মূলত আরো দুটো কারণ আছে। প্রথমত যে কোনো তাফসীর– তা যতো উন্নতমানেরই হোক না কেন আমাদের মনে রাখতে হবে তা একজন মানুষেরই লেখা। লেখকের যাবতীয় নিষ্ঠা সত্তেও তাকে কোরআনের মতো বিনা যুক্তি-প্রমাণে গ্রহণ করা যাবে না। তিনি যদি বিশেষ কোনো মতাদর্শের প্রতি দুর্বল থাকেন তাহলে তা তার তাফসীরে প্রতিভাত না হয়ে পারবে না। আল্লামা যামাখশারী নিজে যেহেতু মোতাযেলা ফের্কার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাই 'তাফসীরে কাশশাফ' আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ প্রক্রিয়ার এতো উন্নত তাফসীর হওয়ার সত্তেও কখনো তা সাধারণ মুসলমানের তাফসীরে পরিণত হতে পারেনি। একইভাবে আমাদের সময়ের গবেষণাধর্মী তাফসীর আল্লামা তাবাতাবায়ীর 'আল মীযান'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। বিজ্ঞ মোফাসসের যেহেতু নিজে শিয়া মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন, তাই মুসলমানদের প্রধান স্রোতধারার (সাওয়াদে আযম) চিন্তাদর্শন ও তাদের ফেকা ইত্যাদির কোনো প্রতিফলনই তাতে তিনি ঘটাতে পারেননি, এমনকি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের 'তরজুমানুল কোরআন' সম্পর্কেও তাফসীর বিশেষজ্ঞদের কিছু বক্তব্য ('কীল ও কাল') আছে। তিনি নিজে যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের অখন্ড ভৌগলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তিনি দু'একটা জায়গায় এই অহেতুক বিষয়টির পক্ষে উকালতি করেছেন। এই একই কারণে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর 'বয়ানুল কোরআন', মুফতী শফি (র.)-এর 'মায়ারেফুল কোরআন'-এ কোরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের বর্ণনায় পীর মুরীদী ও দোয়া তাবিযের প্রভাব এতো বেশী পরিলক্ষিত হয়, কারণ এই বুযর্গদের নিজেদের জীবনেও এই বিষয়গুলোর একটা তীব্র প্রভাব বিদ্যমান ছিলো।



www.nagorikpathagar.org

আমি আমার এ আলোচনায় কোনো তাফসীরেরই ভালো দিক ছাড়া ভিন্ন কিছু আলোচনা করবো না, তেমন কোনো যোগ্যতা ও প্রতিভার কোনোটাই আমার নেই। আমি শুধু কোরআন কর্মীদের তাফসীর নির্ভর না হওয়ার পরামর্শটুকুই দিতে চাই। বলতে দ্বিধা নেই যে, মুল কোরআনের বদলে আমরা যেভাবে দিনে দিনে তাফসীর নির্ভর মুসলমানে পরিণত হয়ে পড়েছি, তাতে আমার নিজের কাছে কোরআন চর্চার এই আলোকোজ্জ্বল দুনিয়াকে ভীষণ অন্ধকার মনে হয়। আল্লাহ তায়ালা কোরআন দিয়ে আমাদের এই অন্ধকার দূরে করে দিন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির কারণে আমি সবাইকে কোরআনকে কোরআন দিয়ে বুঝার কথা বলছি তা হচ্ছে, মানবজাতির সামনে একমাত্র আল্লাহর কেতাবটাই হচ্ছে চির আধুনিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের চাহিদা এই গ্রন্থের আবেদন কোনোদিনই কালের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, এ কারণেই একমাত্র কোরআন ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ বা অন্য কোনো তাফসীরের পাতায় আজ যা কিছু পাওয়া যাবে, তা দেখা যাবে আগামী কাল আর প্রযোজ্য হবে না।

আমাদের সময়ে যে দুটো তাফসীরকে যুগোপযোগী ও একান্ত আধুনিক তাফসীর মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে 'তাফহীমুল কোরআন' ও 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'। তাফহীমুল কোরআন ৪১ সালে শুরু হয়ে ৭১ সালে শেষ হয়েছে। 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' ৫৪ সালের দিকে শুরু হয়ে ৬৪ সালের দিকে এসে শেষ হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান সময়ের হিসেবে 'তাফহীমুল কোরআন' ৩২ বছর ও তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' ৩৯ বছর আগের লেখা। অথচ আমরা সবাই জানি গত ৪০ বছরে আমাদের কালের বিজ্ঞানে অবিশ্বাস্য এমন কিছু জিনিস এসে মিলিত হয়েছে যেগুলো আগে কোনো কালে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বিগত ১ হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের তুলনায় এই ৪০বছরের সাফল্যগুলো অনেক বেশী। মানব সভ্যতায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে এ সময়ে এসে এমন কিছু জিনিস মানবজাতি উদ্ভাবন করেছে যা আমাদের দীর্ঘদিনের ধারণা বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে দারুণভাবে নাড়া দিতে শুরু করেছে।

কথাটা আরেকটু খুলে বলি,

আমাদের শতকের শেষ দিকে এসে বিজ্ঞান সৌরজগত সৃষ্টির মূল সূত্র হিসেবে 'বিগ ব্যাংগ' থিউরী আবিষ্কার করেছে, যার ফলে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় আল্লাহ তায়ালার ভূমিকাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তারা আবিস্কার করেছে মানুষের সৃষ্টি প্রকৃতির মৌলিক তথ্য সূত্র ডিএনএর জেনেটিক কোড। ফিজিক্স, ক্যামেস্ট্রী, বায়োক্যামেস্ট্রী, বায়োলোজী, জুলোজি, বোটানী ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নিত্য নতুন তথ্য মানুষের ঈমান আকিদার বুকে ভীষণ আঘাত হেনেছে। এসব আবিস্কার উদ্ভাবনীতে একজন মানুষ হঠাৎ করে সম্বিত ফিরে পাওয়া রোগীর ন্যায় চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো, এদ্দিন পর্যন্ত যে পৃথিবীটাকে সে জানতো ও চিনতো তা যেন আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সে যেন আজ ভিন্ন একটি গ্রহের মানুষ। সম্বিত ফিরে পাওয়া এ লোকটি আরো দেখতে পেলো, আধুনিক সভ্যতার এ পদচারণা শুধু তাদের আবিস্কার উদ্ভাবনীতেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, তারা এর দ্বারা এসব আবিষ্কার উদ্ভাবনীর মূল মালিক স্বয়ং এর সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারেই বিতর্ক উত্থাপন করলো। (কতো সুন্দর করেই না আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এদের চিত্র এঁকেছেন, 'মানুষ কি দেখে



www.nagorikpathagar.org

না, যে আমি তাকে একটি ক্ষুদ্র শুক্র কীট থেকে পয়দা করেছি, অথচ পয়দা হয়েই সে স্বয়ং মালিকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিতর্ককারী হয়ে গেলো। (সূরা ইয়াসীন ৭৭)

এমতাবস্থায় আপনিই বলুন এ লোকটি যদি প্রচলিত তাফসীরগুলোর পাতায় এ প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে চেষ্টা করে তাহলে সে কি এর সন্তোষজনক কোনো জবাব পাবে? এ যুগের উপযোগী যে দুটো তাফসীর আমাদের সামনে রয়েছে, তার কোথায়ও তো এসব বিষয়ের উল্লেখ নেই, থাকবেই বা কেমন করে, এ তাফসীর দুটো যখন লেখা হয়েছে তখন এর কোনো তথ্যই আবিষ্কৃত হয়নি। এ অবস্থায় সে ব্যক্তিটার সামনে দুটো পথ খোলা থাকবে, একটি হচ্ছে এ যুগের উপযোগী কোরআনের একটি নতুন তাফসীর রচনায় হাত দেয়া, অথবা সরাসরি আল্লাহর কেতাব থেকে এসব বিষয়ের জবাব খুঁজে বের করা। প্রথম কাজ অর্থাৎ যুগের চাহিদার আলোকে নতুন একটি তাফসীর রচনা করা অবশ্যই সময় সাপেক্ষ্য ব্যাপার, নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা করলেও এজন্যে কমপক্ষে দশটি বছর সময়ের প্রয়োজন। সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারাগারে বসে থেকে সাইয়েদ কুতুবকে তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর জন্যে দশ বছর এবং 'তাফহীম' প্রণেতা মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীকে ৩০ বছর সময় ব্যয় করতে হয়েছে। তারপরও দশ বছর পর যখন এই নতুন তাফসীরটি বাজারে আসবে, তখন দেখা যাবে আরো হাজার হাজার নতুন বিষয় ইতিমধ্যে আবিষ্কার হয়ে গেছে, যা তখন আবার নতুন তাফসীরটিতে পাওয়া যাবে না।

এ কারণেই রসূলের যমানার সাথীদের মতো আমরাও মনে করি আল্লাহর কেতাবকে আল্লাহর কেতাবের বক্তব্য দিয়েই বুঝতে হবে, এর জন্যে যমানার তাফসীরসমূহ কিছুটা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তাকে কোরআন বুঝার একমাত্র উৎস হওয়া উচিৎ নয়।

তারপরও একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, গত ৩০-৪০ বছরে কিন্তু আরব আজমে আধুনিক মানের তেমন কোনো তাফসীরই দুনিয়ায় আসেনি। অথচ এ সময়েই সবচেয়ে বেশী তাফসীর লেখা প্রয়োজন ছিলো। যদ্দিন পর্যন্ত এ কাজটি কোনো যোগ্য আল্লাহর বান্দার হাতে না হচ্ছে তদ্দিন পর্যন্ত প্রতিটি কোরআন কর্মীরই নিজেদেরকেই সময়ের এই অভাবটি পূরণ করে যেতে হবে। কোরআন থেকে প্রতিটি মানুষের প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও প্রতিটি জিজ্ঞাসার বিজ্ঞানসম্মত জবাব তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তাই বলে আবার 'তাফসীর বির রায়'-এর ওপর কিছুতেই মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া যাবে না, একে কঠোরভাবে পরিহার করে চলতে হবে। সাহাবায়ে কেরামরা কোরআনের আদেশ নিষেধ সংক্রান্ত বিধান ছাড়া অন্য বিষয়ের ব্যাখ্যার সময় নিজেদের মতামতকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতেন। এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারলে কোরআন কোনোদিনই আধুনিক শিক্ষিত মানুষের কাছে সেকেলে গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে না।

আলোচনার শেষের দিকে এসে আমি কয়েকটি ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি কোরআন কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

১. আমাদের প্রত্যেককেই আজ কোরআন শেখা ও শেখানোর একটা নীতিমালা তৈরী করে নিতে হবে। সেই নীতিমালার ভিত্তিতে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সবাই এক ও



www.nagorikpathagar.org

অভিন্ন দৃষ্টিভংগী নিয়ে কাজ করবে। কোরআনের অভিন্ন কথাগুলোকে অভিন্ন পদ্ধতিতে পেশ করতে হবে, এতে করে সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে এ কথা বলার কোনো অজুহাত থাকবে না যে, 'একেক জন একেক ধরনের কথা বলেন, আমরা কোনটা শুনবো, কোনটা মানবো!'

২. কোরআন কর্মীদের যথাসম্ভব বিতর্কিত বিষয়সমূহকে পরিহার করতে হবে, আমাদের মোফাসসের, মোহাদ্দেস ও ফকীহদের মাঝে হাজার হাজার ঐক্যমতের মাসয়ালাকে বাদ দিয়ে গুটি কতেক বিতর্কিত বিষয়কে যারা বড়ো করে দেখে তারা কোনো অবস্থায়ই ইসলাম ও কোরআনের বন্ধু নয় এটা আমাদের জানতে হবে। প্রিয় নবীর ভাষায় আমার উম্মতের মাঝে পারস্পরিক মত বিরোধীতা হচ্ছে একটি রহমত। মত পার্থক্য না থাকলে জাতির জীবনের একটি মর্মান্তিক স্থবিরতা নেমে আসে, যে স্থবিরতা জাতিকে পতনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিক্ষেপ করে দেয়। (এই গঠনমূলক পার্থক্যের একটা নীতিমালা তৈরী করতে পারলে ভালোই হবে)

৩. দেশে যে কয়টি কোরআন কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান আছে তাদের সবার মাঝে কোরআন কর্মীরা একটা ঐক্যের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে কোরআন যেমন কোনো দলীয় পুস্তক নয় তেমনি কোরআনের কর্মীরাও কোনো দলের মুখপাত্র নন। কোরআনের কর্মীরা হচ্ছে এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাদের কাজ হচ্ছে দলমত নির্বিশেষে সব মানুষের কাছে কোরআনের কথা পৌঁছে দেয়া। আবার এ কাজ করতে গিয়ে তারা যেন নিজেদের সম্পর্ক কখনো ওভার ইষ্টিমেট না করে। তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এ যমীনে আরো অনেকেই তাদের মতো কোরআনের কাজ করেন, তাদের কাজকে অবমূল্যায়ন না করে বরং প্রত্যেক কোরআন কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের কাজকেই যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। এদের সবাইকে নিয়ে একটি সম্মিলিত প্লাটফর্মে কোরআনের কর্মসূচী পালন করাই আজ সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন।

৪. কোরআনের কেন্দ্রীয় বক্তব্যগুলোর জন্যে কিছু অভিন্ন শ্লোগান ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে দেশের একটি বিশেষ ধর্মীয় জামায়াতের ভাইদের কাছে থেকে মনে হয় কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। অষ্ট্রেলিয়া থেকে কানাডা, ইংল্যান্ড থেকে মরিসাস– সারা দুনিয়ার যেখানেই এরা যায় সেখানেই তারা নিজেদের কথা বলার জন্যে একই টেকনিক ও ভাষা অবলম্বন করেন। 'বাকী নামাযের পর ঈমান ও আমলের ওপর কিছু জরুরী বয়ান হবে, আমরা সবাই বসি, বহুত ফায়দা হবে', এ কথাগুলো দুনিয়ার যেখানেই আপনি শুনবেন, আপনি বুঝতে পারবেন যে এরা একটি বিশেষ জামায়াতের লোক।

৫. দেশের কোটি কোটি মানুষের কাঝে কোরআনের কাজটাকে নিছক কোনো ওয়ায নসীহতের বিষয় মনে না করে একে রীতিমতো একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। দেশে যেখানে মশক বিরোধী আন্দোলন আছে, মাদকদ্রব্য বিরোধী আন্দোলন আছে, নকল বিরোধী আন্দোলন আছে সেখানে কোরআনের ফসলের জন্যে ভূমিকে চাষাবাদ করার জন্যে একটি নির্ভেজাল 'কোরআন বুঝার আন্দোলন' থাকবে না কেন? সাধারণ মানুষের কাছে কোরআনের আবেদনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে এ আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।



www.nagorikpathagar.org

৬. কোরআনের কাজ করার সময় অনেক উৎসাহী কর্মীকে আমি দেখেছি তারা কোরআনে পরিবেশিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে খামাখাই জড়িয়ে পড়েন। অনেক সময় অহেতুকভাবে বিজ্ঞানের জটীল বিষয়গুলোর আবিষ্কার উদ্ভাবনীকে কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রমাণ করার জন্যে অর্থহীন প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে তারা গোলমাল পাকিয়ে ফেলেন। কোরআনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে আমাদের এ কথাটা বুঝে নিতে হবে যে সাধারণ কিছু মানবীয় আবিষ্কার উদ্ভাবনীর আলোকে কোরআনকে বিচার করার দরকার নেই। কোরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়, কোরআন বিজ্ঞান আলোচনার জন্যে নাযিল করা হয়নি। কোরআন হচ্ছে মাবনজাতির একটি সামগ্রিক জীবন বিধানের গ্রন্থ, এই গ্রন্থকে তার সত্যতা প্রমাণের জন্যে কোনো মানব সন্তানের সনদের প্রয়োজন নেই। সারা দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞান প্রযুক্তিও যদি কোরআনে পরিবেশিত ক্ষুদ্র একটি তথ্য সূত্রের বিপরীত পাওয়া যায় তারপরও আমার কাছে সেসব কিছুর বিন্দুমাত্র মূল্যও নেই, স্থায়ী কোনো মানদন্ডকে কতিপয় অস্থায়ী বক্তব্য দিয়ে খন্ডন করা যায় না।

৭. আরেকটি প্রবণতাও আমি কিছু কিছু লোকের মাঝে সচরাচর লক্ষ্য করেছি এবং তা হচ্ছে কিছু কিছু উৎসাহী কোরআনের কর্মী প্রায়ই দরকারে বে-দরকারে কোরআন সম্পর্কে অমুসলিম লেখক বুদ্ধিজীবি দার্শনিকদের কথা উদ্ধৃত করেন। বিশ্বের কোন খ্যাতনামা অমুসলিম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কোরআনের পক্ষে কি বলেছেন তা বলে মনে হয় তারা আনন্দিত হন। কিন্তু আল্লাহর কেতাবের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে আসলে কি কোনো বাইরের লোকদের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আছে? আমরা সবাই জানি যে, রসূলের মুখে কোরআনের আয়াত শুনে আখনাস বিন শুরায়কসহ তিনজন কাফের নেতা কোরআনের পক্ষে চমৎকার কিছু মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত ও গুনী ব্যক্তি অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামরা কোরআনের মাহাত্ম প্রমাণের সনদ হিসেবে কখনো এদের কোনো কথাকে উদ্ধৃত করেননি। কেননা তারা জানতেন এক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ও প্রভাব প্রতিপত্তিশীল একজন অমুসলিম ব্যক্তির তুলনায় একজন মুসলমান ক্রীতদাস গোলামের বক্তব্য অনেক বেশী মূল্যবান। যারা নিজেরা কখনো কোরআনের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, কোরআনকে নিজের যথার্থতা প্রমাণের জন্যে তাদের সার্টিফিকেটের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য কোনো গবেষণার বিষয় হলে তা ভিন্ন কথা, কিন্তু দরকারে বে-দরকারে কোরআনের পক্ষে দুনিয়ার তাবৎ অমুসলিমদের মন্তব্য উদ্ধৃত করার এই অহেতুক প্রবণতা আমার মনে হয় পরিহার করা দরকার।

সর্বশেষে আরেকটি বিষয়ের প্রতি আমি কোরআন কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকের মতো বিদায় নেবো।

আপনারা কোরআনের কাজ করছেন– শুধু এই কারণটি দেখিয়ে দেশের সাধারণ মানুষদের কোরআনের তেলাওয়াত থেকে নিরুৎসাহিত করবেন না। ইদানিং কোরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পড়ার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিতে গিয়ে এক শ্রেণীর অতি উৎসাহী লোকেরা সাধারণ মানুষদের তেলাওয়াতের ব্যাপারে দারুনভাবে নিরুৎসাহিত করছেন বলে



www.nagorikpathagar.org

আমি শুনেছি। এটি মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। আমি আশা করি আমরা বিষয়টির স্পর্শকাতরতা অনুধাবন করতে পারবো। কোরআনে কারীম শুধু তেলাওয়াতের জন্যে নাযিল হয়নি একথা ঠিক, তাই বলে কোনো মানুষ যদি সহীহ শুদ্ধ করে কোরআন তেলাওয়াত করে তাহলে কি সে আল্লাহ তায়ালার রহমত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে! প্রিয় নবী বলেছেন, কোরআনের তেলাওয়াত আল্লাহর দস্তরখান, একে কখনো ছিড়ে ফেলো না, তিনি আরো বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে নামায ও কোরআন দিয়ে সাজিয়ে রেখো। মুসলিম মিল্লাতের অগ্নিপুরুষ সপ্তম শতকের মোজাদ্দেদ ইমাম ইবনে তাইমিয়া মৃত্যুর আগে কারাগারে বসে ৮০ বার কোরআন শরীফ খতম করেন। ৮১ বারে যখন তার সূরা আল কামার শেষ হয় তখন তিনি আল্লাহর মেহমান হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হন।

এই ছিলো আমার কতিপয় অসংলগ্ন অভিব্যক্তি যা আমি আপনাদের বলতে চেয়েছিলাম। আলোচনাগুলো কিছু অগোছালো হলেও বিষয়গুলো মনে হয় তেমন অপ্রয়োজনীয় নয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কোরআনের ঘরে আশ্রয় নেয়ার তাওফীক দিন। আমীন!



www.nagorikpathagar.org

কোরআন গবেষনার জন্যে
কোরআন পড়তে হবে
কোরআন বুঝতে হবে

কোরআন বুঝার জন্যে
আমাদের নিবেদন

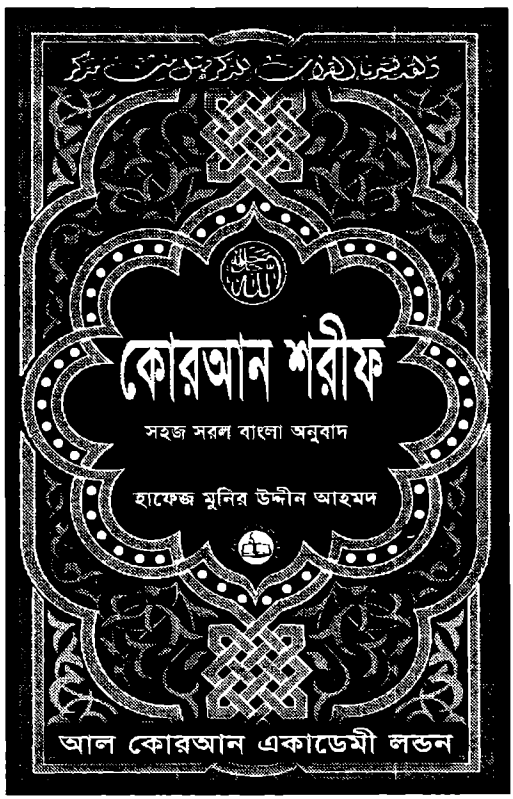


www.nagorikpathagar.org

আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স